নজরুল-রচনাবলী

কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

অষ্টম খণ্ড

বাংলা একাডেমি ঢাকা

নজরুল-রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : ফাল্গুন ১৪২৪/ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাএ ৫৭০২

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে)। বাংলা একাডেমি সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালে)। পুনর্মুদ্রণ (প্রথম-পঞ্চম খণ্ড) : ১৯৭৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা-পরিষদ সম্পাদিত ১২ খণ্ডে নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (২০০৬-২০১১)।

অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ১২ই ভাদ্র ১৪১৫/২৭শে আগস্ট ২০০৮। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/মে ২০১৫। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

NAZRUL RACHANABALI [Works of Kazi Nazrul Islam]. First Published : Kendrio Bangla Unnayan Board Edition (Vol. First, Second and Third in 1966, 1967 and 1970 respectively edited by Abdul Quadir). Bangla Academy Edition (Vol. Fourth and Fifth) in 1977 and 1984. New Edition (Four Vol.) in 1993. Nazrul Birth Centenary Edition (Twelve Vol.) in 2006-2011.

Eighth Volume, First Published : 27th August 2008. First Reprint (Birth Centenary Edition) : Reprint Sub-Division, May 2015. Second Reprint : Reprint Sub-Division, February 2018. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 200.00 Only, US $ 20.00

ISBN 984-07-5711-3

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

অষ্টম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল, তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ অষ্টম খণ্ডে 'অভিভাষণ', 'সঙ্গীত-গবেষণা', 'অগ্রন্থিত গান', 'নাটিকা ও গীতিবিচিত্রা', নাটকের গান, 'চলচ্চিত্রের গান' সংকলিত হলো।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব শেখ সারোয়ার হোসেন, জনাব ফারহানা খানম, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুভ্রা বড়ুয়া, জনাব বাবুল মিয়া এবং প্রেস ব্যবস্থাপক জনাব মোবারক হোসেন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৫ ।। ২৭শে আগস্ট ২০০৮

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ অষ্টম খণ্ডে অভিভাষণ, সঙ্গীত-গবেষণা, অগ্রন্থিত গান, নাটিকা ও গীতিবিচিত্রা, নাটকের গান, চলচ্চিত্রের গান সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অষ্টম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন। সুস্থাবস্থায় নজরুল একই গান একাধিক গ্রন্থে সংযোজন করে থাকলে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ

গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৫ ।। ২৭শে আগস্ট ২০০৮

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ **আবদুল কাদির**

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ... ।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস-কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুল্‌বুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা-গান।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুলবুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল-বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুল্‌বুল'-এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্‌' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেটে কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এঁরাও নজরুল-সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ-খণ্ডেরও 'গ্রন্থ-পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

আবদুল কাদির

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য।]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বয় আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয়; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

> আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়;
> নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।...
> দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয়;
> কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
> কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি;
> কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি!
> সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি?
> চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি?

[সতের]

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি-বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু–ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ–সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত–মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল–সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য–প্রিয়তা ও প্রেম–বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। 'নজরুল–রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএধি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ–ই–ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি–লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'–এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে ?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা **আবদুল কাদির**

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড 'নজরুল-রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান,

(খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস-রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ-পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি-প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ-কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে-সকল কিশোর-পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগ-মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি-বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ-মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃপ্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে-সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি-আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি–আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী–তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে–সকল গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক–মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত-মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি–প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত–আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে–সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ–সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন–গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত–সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী–মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিক্‌শূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার–লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮–বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯–বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল–রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল–গবেষক ও নজরুল–অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

আবদুল কাদির

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ক্রটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজরুল-রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে 'অগ্নি-বীণা'র পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন-চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দু'বার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. 'মক্তব-সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব-সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

অগ্রন্থিত গান [৭৫–১৪৪]

নাটিকা ও গীতিবিচিত্রা [১৪৫–২৭৮]

১৯৬৯ সালে কলকাতা পুরাতন ভিআইপি রোড, এখন নাম নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ের পাশে কেষ্টপুর সংলগ্ন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে নজরুলের আবাসন তৈরির উদ্দেশে ৯ কাঠা জমি বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী সেই জমিতে ভিত্তি স্থাপনের জন্য অর্থও বরাদ্দ করেন। সেই জমিতে কবি ও কবি পরিবারের সদস্যদের এবং কবি অনুরাগী সুধীজনদের নিয়ে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানও হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কবির দুই পুত্র, পুত্রবধূ. নাতি–নাতনি কবির বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও অনেককে। দুর্ভাগ্যবশত ওই জমিতে এখনও কবির স্মৃতি রক্ষার্থে কোনও ভবন নির্মিত হয়নি।

খিলখিল কাজীর সৌজন্যে
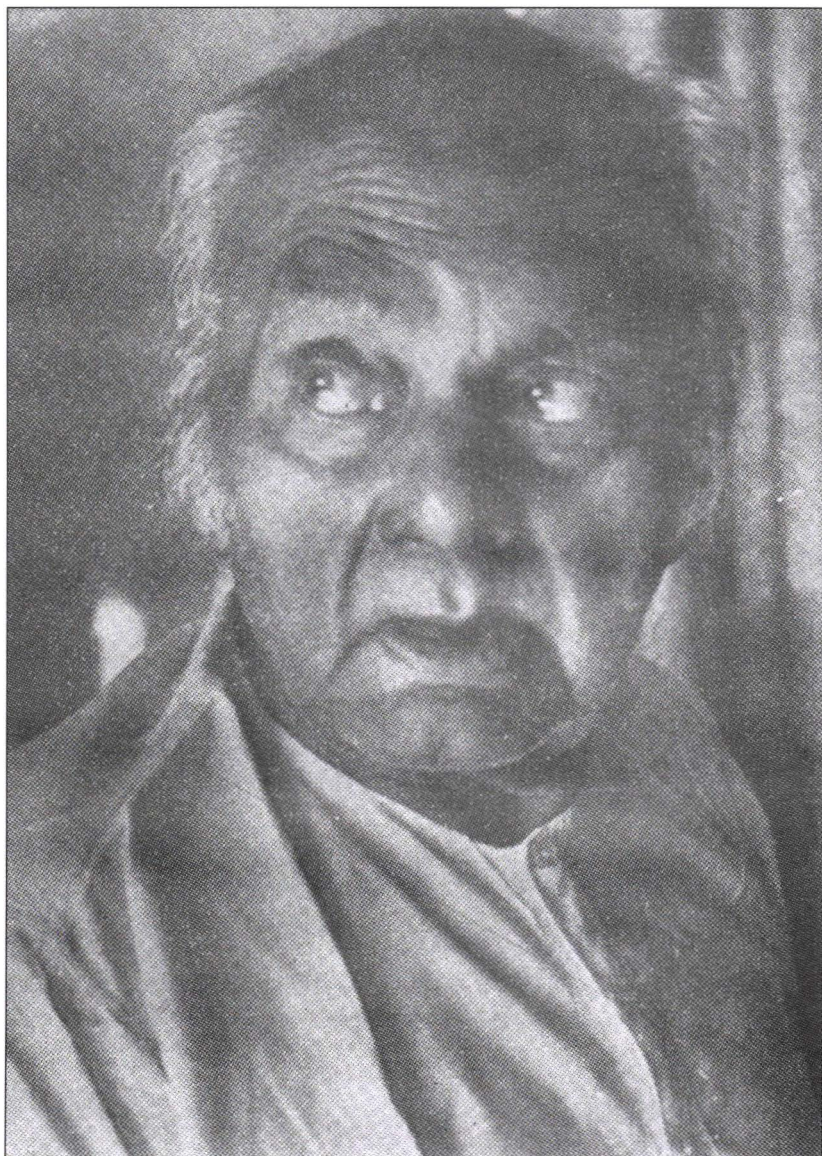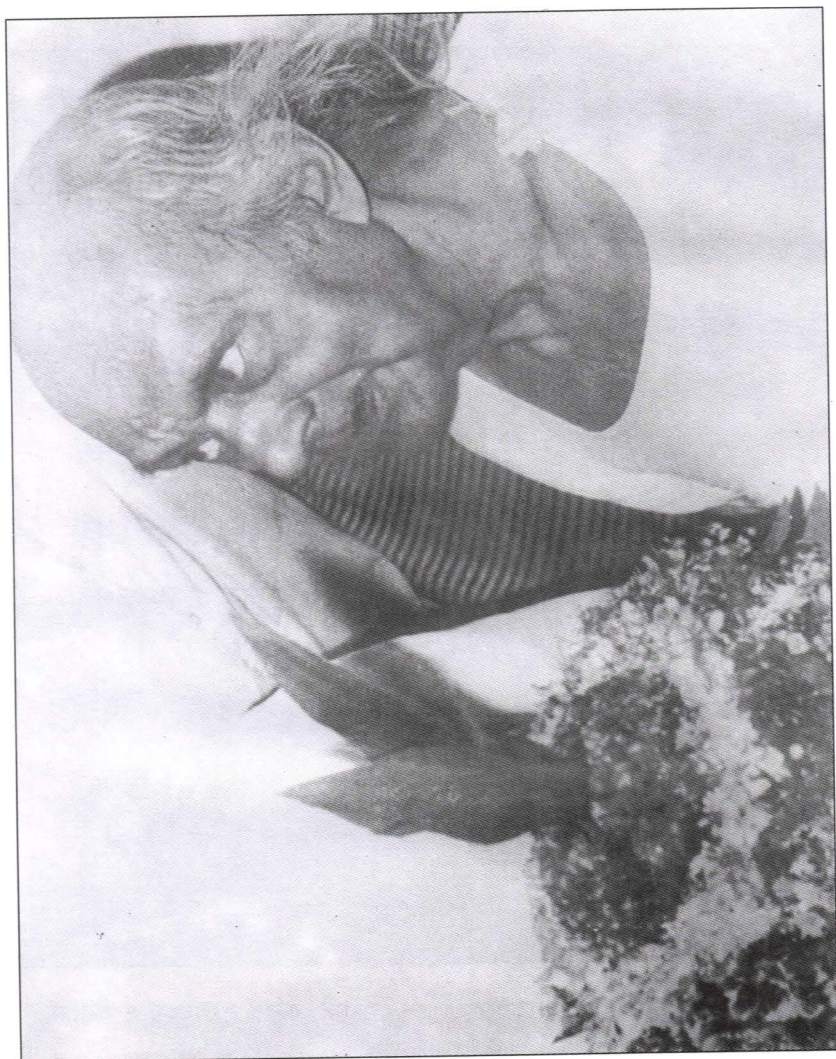
চুরুলিয়ায় কবিপত্নী প্রমীলার কবরের পাশে নজরুল, কবির পুত্রবধূদ্বয় ও অন্যান্য
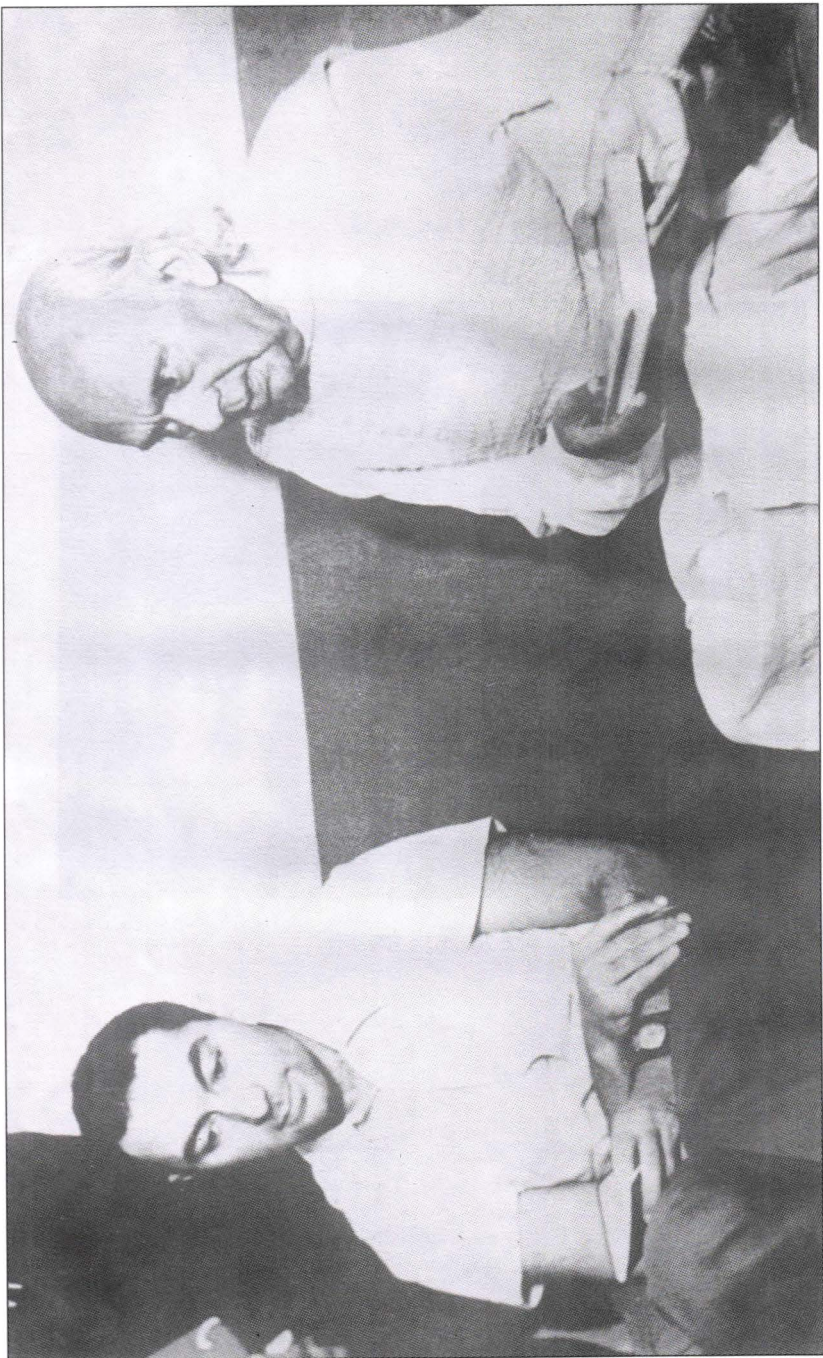
জনৈক সোভিয়েত লেখকের সঙ্গে কবি

ধ্রুব চলচ্চিত্রে নজরুল

জনৈক শিখ সর্দারজির সঙ্গে নজরুল

নজরুলের হস্তলিপি

নজরুলের হস্তলিপি

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ
BANGLADESH POST OFFICE

নজরুলের হস্তলিপি

4'
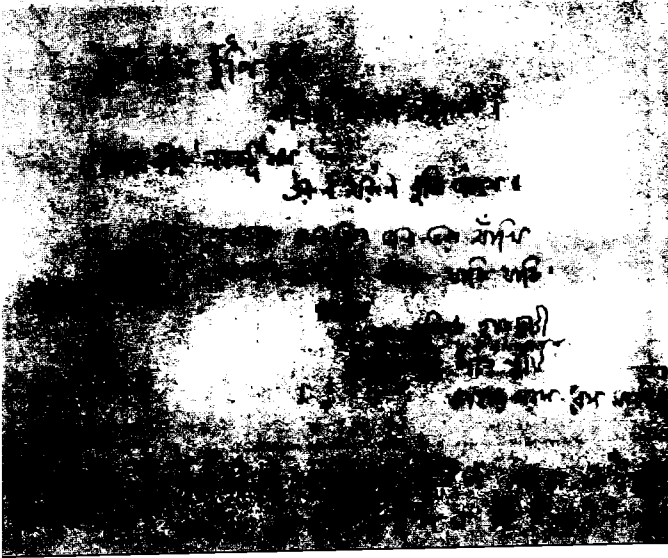
রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমারে আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-আঁধার পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিসহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি' ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানিনা সে-কথা, হয়ত বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি'।

নজরুলের হস্তলিপি

অভিভাষণ

প্রতিভাষণ

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা-সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মি. এস. ওয়াজেদ আলি। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত 'প্রতিভাষণ' দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী-সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দেন।]

বন্ধুগণ !

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মতো হয়তো মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কী দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো !

নদীর জল মঙ্গল অভিষেকের ঘটে বন্দি হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে-নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তাছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্তত আজকের দিনে যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভদৃষ্টির বধূর মতো লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্তত আজকের দিনে তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়তো সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের— যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়তো একটু বেশি করেই স্মরণ করছেন,—ফুল-ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ !

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশি রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি

চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধুলো-বালি-কাদামাটি চড়িয়েছেন, এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে, সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্তত তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। পড়-পড় বাড়িটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার যে ঐ পড়-পড় বাড়িটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কিটসের মতো আমারও মন্ত্র—'Beauty is truth, truth is beauty'.

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে ; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরুপথে পথ না হারাই। এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিলফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি ! এবং তাদের নখর-দশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষারঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশি যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মতো হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। বনের পাখি নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়তো সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে ; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহজাদা খুররমের মতোই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো

যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। ...

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপবর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর মন্থনের হলাহলই হয় তা হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া তো এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—র'সে খান, অমৃত আছে, সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি। আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

তরুণের সাধনা

[১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কবি নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ !

আপনারা কি ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তি-মজ্জা-প্রাণস্বরূপ তরুণদের যাত্রাপথের দিশারি হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনোদিন ছিল না, আজো নাই। আমি দেশকর্মী—দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোনো স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ-স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়তো আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব। তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গলচিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনোদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন—ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র

নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির–ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা–রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে, —যদি তাহাতে কাহারও অলস–তন্দ্রা মোহ–নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজো আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা–ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়তো তাহার শক্তির সম্বন্ধে আজো লা–ওয়াকিফ।—

আমি বক্তাও নহি। আমি কম–বক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী—বখতিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য–সামন্ত অত দ্রুত বেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের––কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ঝর্নাধারার মতো। ছন্দের দু–কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীতগুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা–ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের––তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে—যৌবনকে—আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ–প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবনসূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়—আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্ব প্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা—বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্ব প্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশানবরদার মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাংলার শিরাজ, বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনল-প্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, 'অনল প্রবাহের' সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্যকাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি—ফিঙে বায়স বাজপাখির ভয়ে ভিরু পাখির মতো কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়—এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি-ওর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা : 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশি হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহসুধা-সিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম ; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মতো দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানসনেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিবিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাংলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশপ্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্জ করিতে আসিয়া কাবা-শরিফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ মোবারক হয়তো আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়তো আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা, তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতিনিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাকহীন শ্রদ্ধা-প্রীতি-সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

বার্ধক্য ও যৌবন

আমি সর্বপ্রথমে বলতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয়—বিঘ্ন ; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না ; যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল-সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোকপিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার—বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি—যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াত-লেলিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে—যাহারা বৈমানিক-রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক-রূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবনগতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়নমণি নিভিয়া যায়—যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি—শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রুগীর শয্যাপার্শ্বে যখন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া, ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশার বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের—তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ

আমরা—মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি : ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোকে সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম ; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

গোঁড়ামি ও কুসংস্কার

আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যেসব মওলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষতদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মওলানা মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষু-কর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের, জাতির ধর্মের কী অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মতো জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 'মনে মনে শাহ ফরিদ, বগল-মে ইট।' ইহাদের নীতি 'মুর্দা দোজখ-মে যায় য়্যা বেহেশত-মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সে কাম।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'—নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া ! বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে তো সে তরুণ ! ইহাদের হাতের 'আশা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা

রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া-যুদ্ধ--ভাইয়ের সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই—সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহারা বলেন, 'দিন তো চলিয়া যাইতেছে, পথ তো চলিতেছি,' তাহাদের বলি ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই এবং কুফরি ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামি সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না—সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে—নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের—তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধারসাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখিকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোনো জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মতো হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার ; এইসব লঙ্ঘন করিয়া, অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের—তাহারা তরুণ।

সঙ্ঘ-একনিষ্ঠতা

ইহাদের জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা, বাংলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি—কী অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের ঊর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহুবন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের

জন্য। এই তরুণ বীরসন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজো আমরা দিনের আলোতে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মতো প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্ঠি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুণ ধরিতে দেয় নাই। ... আমাদের মতো ইহাদের স্কন্ধে চাকুরির দৈত্য সিন্দাবাদের মতো চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন—যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই তো মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতি আজো টিকিয়া আছে। দীপশলাকার মতো ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণপ্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টে'র মতো আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মতো হা করিয়া চাহিয়া আছি। বিএ, এমএ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই—অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি—তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহিদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

কোথায় আছে সেই শহিদদের দল? বাহির হইয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সঙ্ঘের—তরুণ সঙ্ঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে—এ সাধনা তাহারই, এ শহিদি দরজা শুধু তাহারই।

সঙ্গীত শিল্প

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কালবৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক ; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র ; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা ; কিন্তু যে ধ্যানী, যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্পপাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে ; উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপনকুমারীকে—রূপকুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে

গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে— আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নবপ্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদকারি আর যাহারা করে করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজো যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী—কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি যন্ত্রসঙ্গীতে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলবি মওলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলবি সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াও জানি। সঙ্গীতশিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া ঝুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কী, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়—শ্রেষ্ঠ।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডী বা প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ধর্মে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব, মহত্ত্ব। নদী

পর্বতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপাশেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমি করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর-অভিযানে যাইবে না? যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল, ডোবা কিম্বা খুব জোর ঝর্না। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়েরা কলহ করে করুক, আমরা যেন এই কুৎসিত কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে-ফসলে, এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট হিন্দু-মুসলমানে যে কদর্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সভ্যজগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র। যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয় কাউন্সিল-এসেম্‌ব্লি প্রভৃতির বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্য মূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি সকাবাব কারণ-সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদের আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়াছেন—যিনি স হ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা মৌলবি পণ্ডিত পুরুত যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানের তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে—তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়—এই কুৎসিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু ঊর্ধ্বে, আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতা-মুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মূল নীতি সহনশীলতা, passive resistance, ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত-সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির

চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদার্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান— হোক সে যে কোনো জাতি, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো সম্প্রদায়ের—দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।

শেষ কথা

আমার অভিভাষণ হয়তো অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা—আমরা যৌবনের পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব-নবীনের মিশানবরদার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মতো আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙিয়া পড়িবেই। দুর্যোগরাতের নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি ! সকল বাধা-নিষেধের শিখরদেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি আমরা অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

প্রতি-নমস্কার

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তার উত্তরে কবি এই প্রতিভাষণ প্রদান করেন।]

ওগো বুলবুলিস্তানের নব বৈতালিক দল !

তোমরা আমার সানুরাগ প্রতি-নমস্কার গ্রহণ কর।

তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে—উদ্ধত হস্ত তুলে, মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চ শির অবনমিত করে—উদ্ধত হস্ত যুক্ত করে ললাটে ঠেকিয়ে।

তোমাদের যুক্ত করের অঞ্জলির বিনিময়ে আমার যুক্ত করের রিক্ত নমস্কার গ্রহণ কর।

তোমাদের এই দানের বিনিময়ে আমি যেন আমার গানের পাত্র পূর্ণ করে তোমাদের ভেট দিতে পারি।

তোমরা নতুন বাগিচার নতুন বুলবুলি, তোমরা চাও শুধু রসের মধু, রূপের কুসুম, প্রাণের গুলবাগিচা। ... তত্ত্বকথার ঢিল ছুঁড়ে আমি তোমাদের গীতলোকে, ধেয়ান-কুঞ্জে উৎপাতের সৃষ্টি করব না। তোমাদের রূপের হাটে রসের বাজারে আমি করে যাব আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্তবগান।

এই ক্ষণিকের অতিথি গানের পাখিকে তোমরা যে ফুলের সওগাত দিলে—ওগো বাহার-গুলিস্তানের উদাসী শিশুর দিল্, তার প্রত্যুত্তরে আমার একমাত্র সম্বল গান ছাড়া তো দেবার কিছুই নেই। আমার গানে তোমাদের বনের কুসুম মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সেই তো আমার শ্রেষ্ঠ অভিবন্দনা।

সেদিন আমার কণ্ঠে হলাহলের তিক্ততা উঠেছিল, সেই সুরাসুরে সাগরমন্থনের প্রখর মধ্যাহ্নেও তোমরা নির্ভীক শিশুর দল আমার নীলকণ্ঠের কণ্ঠহার রচনা করছিলে। আবার আজ যখন মৃতের শ্মশানচারী আমি অমৃতের সুরলোকে যাত্রা করেছি, সেদিনও তোমরা এসেছ তোমাদের অর্ঘ্যের নির্মাল্য নিয়ে।

হে ভয়ে-নির্ভীক আনন্দে-শান্ত দেবশিশুর দল, তোমরা আমার প্রণম্য। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

যে জবাকুসুম-সঙ্কাশ নবারুণের আদি উদয় দেখে বনের তাপস-বালকেরা স্তবগানে শান্ত আকাশকে মুখর করে তুলেছিল, সেই তাপস-কুমারদের আমি তোমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। আমি গানের পাখি, অনাগত অরুণোদয়ের স্পন্দন আমার কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠেছে—সরাইখানার ঘুমন্ত মুসাফির, জাগো। সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই, বন্ধু জাগো, আমার গান শুনে এই তন্দ্রাহত আলোক-বঞ্চিত মুসাফিরদের আগে জেগে ওঠ তোমরা—জীবনশিশুর দল। তোমাদের সেই জাগর-চঞ্চল গানই হবে আমার সুন্দরতম আমন্ত্রণগাথা।

আমায় সাদর সম্ভাষণ করেছে তোমাদেরই আগে তোমাদেরি গিরি-সিন্ধু-নদী-কান্তার পরিশোভিত পরিস্থান। তোমাদেরি গিরিরাজের কোলের কাছটিতে সর্ষেফুলের আঁচল বিছিয়ে যে উদাসিনী বালিকাকে নদীর ঢেউ খেলানো চুল এলিয়ে বসে থাকতে দেখেছি আমায় সর্বপ্রথম মৌন অভিনন্দন জানিয়েছে সে। ... তোমাদের কর্ণফুলির তরঙ্গে যে তরুণী তার ভরা যৌবনের স্বপ্ন বিছিয়ে, কাননের কুন্তল এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে, আমায় সর্বপ্রথম আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছে সে-ই—তার সাম্পান মাঝির হাতে। ... বুকে বাড়বকুণ্ডের হোমাগ্নি জ্বালিয়ে তোমাদের গিরিরাজ সে নবসৃষ্টির ধ্যানে সমাধিমগ্ন আমায় সর্বাগ্রে আশিস জানিয়েছে তাদেরি ঊর্ধ্ববাহু দেওদার শাল পিয়াল শাল্মলী সেগুন। ... তোমাদের বনে বনে ঘুরে ফেরে যে বালিকা বনলক্ষ্মী—তার হলদে-পাখি বৌ কথা কও পিক-পাপিয়ার নূপুর-কাঁকন বাজিয়ে, গুবাক-তরুর হাতছানি দিয়ে আমায় সবার আগে ডেকেছে সেই আলুলায়িতকুন্তলা কপালকুণ্ডলা। তোমাদের উদার আকাশ

মেঘের আল্পনা এঁকে আমার আসন রচনা করেছে, চণ্ড-বৃষ্টি-প্রপাত-ছন্দে তোমাদের আসমানি মেয়েরা আমার শিরে পুষ্পবৃষ্টি করেছে, তোমাদের জলপ্রপাত নির্ঝরিণী আমার গজল-গানে সুর দিয়েছে, তোমাদের সিন্ধু-হিল্লোল আমার রক্তে নতুন দোল দিয়েছে—তার ভাটির টানে আমায় অতলতলে টেনে নিয়ে গেছে ... আমার আর অন্য অভিনন্দনের প্রয়োজন ছিল না।

আমার জন্য যদি আসনই দাও তোমরা, তবে তা যেন বুকের আসন হয় বন্ধু, সভার কোলাহলের নির্বাসন আমি চাই না।

কোনোদিন তোমাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারব—এ ঔদ্ধত্য আমার নেই, সম্বলও নেই। আমি যাযাবর কবি, আমায় ঝুলি ভরে যে পাথেয় দিলে তোমরা, তাই যেন আমার ভাবী পথের সহায় হয়।

বিনিময়ে আমি রেখে গেলাম তোমাদের সিন্ধুতে তোমাদের কর্ণফুলিতে আমার দুই বিন্দু অশ্রু। তোমাদের হাতের দানকে চোখের জলে ভিজিয়ে গেলাম।

জীবনে কোনো সাধই তো পূর্ণ হল না ; ভবিষ্যতে যে হবে, সে আশাও রাখিনে। তবু এই প্রার্থনাই করে যাই আজ তোমাদের সিন্ধু-বেলায় দাঁড়িয়ে যে, মরতেই যদি হয় তবে শেলির মতো তোমাদের এই সিন্ধু-জলেই যেন আমার সে মৃত্যু-দেবতার দর্শন পাই।

বুলবুল
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪১

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন]

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন,—'ঝড় আসে নিমিষের ভুল !' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

'কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে ?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।'

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি-ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের

কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-র শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণতীর্থ জিয়ারত করতে। সেবারে সে বলেছিল—

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্নাধারা
মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়।

দ্বারের মায়া করে তোরা
বন্দি রবি নিজ কারায়?
নাই কো চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়।

সেই ঝড় আবার এসেছে—হয়তো বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া 'পুবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়তো বদলে গেছে। আজ হয়তো সে বলতে চায়—

'ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।'

সেবার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সে-ই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারই হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়তো আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলি বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে—সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের—তথা বাংলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময় !

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ—সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজো করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে—আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে, তাঁকে বলি, হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে, কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাববোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায়—তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না কো, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরই মতো গানের পাখি—আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে—যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু ঊর্ধ্বে, বহু দূরে ; তবু এ ভরসা রাখি যে আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি—তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের 'আজিজ' নাই, কিন্তু বাংলার

আজিজরা—দুলাল ছেলেরা আজো বেঁচে আছে—তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা ! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর 'বাহারে'র মতো বাহার হয়তো বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মতো নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা তো আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দুল-সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

* * *

অপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,—আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখছি,—তা-ই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক, আদাওতি করে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান—আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না—ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব—এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে !

আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের, সভ্যতার, জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামি, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্ম গ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদ্‌কির মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের—(আর, তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি) দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়তো বা এরা যথা পূর্বম্ তথা পরম্। দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না ; মনে করে—ও শুধু কাহিনী। হয়ত একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন—এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভালো করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজি প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে person এর against এ—গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চিন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, penny wise pound foolish!

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না, অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দি। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোনো কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন-উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি! কাজেই ন মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচে তেল।' আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মওলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি—এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে—যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমির যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের next door neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition--sportsman like competition.

'বুলবুল'
ফাল্গুন, ১৩৪৩

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও

[১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

আপনারা আমাকে আপনাদের ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করে যে গৌরব দান করেছেন, তার জন্য আমার প্রাণের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে, দেশের সেবা থেকে, কওমের খিদমতগারি থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর-দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাথীহীন নির্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোল-সঙ্গীত ; আর সেই শব্দায়মান সুর-ঊর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি বন্ধুহীন—একা। এই বিশ্ব জুড়ে যে মহামৌনীর স্তবগান নিঃশব্দ-ঝঙ্কারে রণিত হচ্ছে, যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌন-মহিমার পূজারী, তবু একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জনতার বক্ষ জুড়ে শুনছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায় তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্মন্তুদ। কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপর আমি আমার ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম ; কী অপরিণাম আশা, দুর্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন জাতি নতুন মানুষের কল্পনা করেছিলাম। আমার সেই ভিত্তিকে জানি না কার অভিশাপে ধরণীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বস্তুর জগত অভাবের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি আজো করিনি, কিন্তু ধৈর্যের দুর্গম দুর্গে আর কতদিন আত্মরক্ষা করব ?

বেশি দিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই ছাত্র সমাজকে অগ্রদূত করে নব বিজয়-অভিযানের আমি হব তূর্যবাদক, নকিব, সৃষ্টি করব সুন্দরের জগত—কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণীর পঙ্কিল বক্ষ ভেদ করে আনব পবিত্র আব-জমজম ধারা। সে আশা আমার আজও ফললো না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধূলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি

আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে। তাই যারা কোলাহল করে আমায় নিতে আসে, মনে হয় তারা নিতে এসেছে আমায় গোরস্থানে—প্রাণের বুলবুলির স্থানে নয়। কত দিক থেকে কত আহ্বান আসে আজো ; যত সাদর আহ্বান আসে, তত নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি—ওরে হতভাগ্য, তোর দাফনের আর দেরি কত? কত দিন আর ফাঁকি দিয়ে জয়ের মালা কুড়িয়ে বেড়াবি? কওমের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য কতটুকু আমি করেছি—তবু তার প্রতিদানে অতি কৃতজ্ঞ জাতি যে শিরোপা আনে, তাতে শির আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। তাই আপনাদের দাওয়াত পেয়ে যখন ধন্য হলাম, তখন দ্বিধাভরে অসঙ্কোচে তা কবুল করতে পারিনি। যে ভাগ্যহীন নির্জনতার অন্ধ-কারায় অভাবের শৃঙ্খলে বন্দি, সে কোথায় পাবে মুক্তির বাঁশি? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি আপনাদের কাসেদের কাছে, দূতের কাছে—কিন্তু তাঁরা আমার আর্জি মঞ্জুর করেননি। এক দিন যারা ছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, আত্মার আত্মীয়, তারা যখন তাদের প্রতি আমার ভালোবাসার দোহাই দিল তখন আর থাকতে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন, দুঃখ-শোকের শত জিঞ্জিরে বন্দি হয়েও আসতে হল আমাকে আপনাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে। ফরিদপুরের তরুণ ফরিদ দলের নেতৃত্ব করার অধিকার নেই এই সংসারের চিড়িয়াখানায় বন্দি সিংহের—যে সিংহ আজ হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ট্রেডমার্কের সাথে এক গলাবন্ধে বাঁধা পড়েছে। আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উল্লেখ করে একদিন বলেছিলেন, 'যাকে বিলিতি কুকুরে কামড়েছে তাকে আমাদের মাঝে নিতে ভয় হয়।' সত্যি, ভয় হবারই কথা। তবু কুকুরে কামড়ালে লোকে নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে অন্যকে কামড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই, আমি হয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত নির্জীব !

কিন্তু এ শোনাতে তো আমায় আপনারা আহ্বান করে আনেননি। আপনারা শামাদানে এনে বসিয়েছেন সেই প্রদীপকে যা একদিন হয়তো বা অত্যুগ্র আলোক দান করেছিল। আপনাদের এ আদরের অসম্মান আমি করব না, নিভবার আগে আমি আমার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে যাব। তাতে আপনাদেরে পথের হদিস মিলবে কি না—সকল পথের দিশারি খোদাই জানেন। আমি নিভবার আগে এই সান্ত্বনা নিয়েই নিভব যে, আমি আমার শেষ স্নেহ-বিন্দুটুকু পর্যন্ত জ্বালিয়ে আলো দিয়ে যেতে পেরেছি।

তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কাবা শরিফ জিয়ারত করলাম ; যাদের চোখে দেখেছি তৌহিদের রওশনি, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ-তারেক-মুসার ছবি, যাদের মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র। যাদের বাজুতে দেখেছি আলি হায়দারের বেদেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজানধ্বনি। তোমরা আমার সেই ধ্যানের মহামানবগোষ্ঠী। এ আমার এতটুকু অত্যুক্তি—কল্পনা নয়। তোমাদেরে আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রম করে সহস্রাধিক বৎসর দূরে—ওহোদের যুদ্ধে বদরের ময়দানে, খয়বরের জঙ্গে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকার মুসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিসরের

পিরামিডের পার্শ্বে—পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরানের বিরান-মুলুক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া করে দিতে। দেখেছি জাবলুত তারেকের জিব্রাল্টারের অকূল জলরাশির মধ্যে নাঙ্গা শমশের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভার বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতান সালাউদ্দিনের সেনাদলের মাঝে—দেখেছি কুরূপা ইউরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি—রিফ-সর্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে, পহলভির দক্ষিণে, ইবনে সউদের সম্মুখে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশানবরদার হয়ে। তোমরা যে পথ দিয়ে চলে গেছ, মনে হয়েছে—আমি যদি ঐ পথের ধূলি হতাম। আমি প্রাণ-মন পেতে দিয়েছি তোমাদের অভিযানের ঐ পায়ে চলা পথে। আমি যেন তোমাদেরই সেই পায়ে চলা পথের ধূলিসমষ্টি, মূর্তি ধরে এসেছি তোমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তোমাদের আর একবার তেমনি করে আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে।

কোথায় সে শমশের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি করে। যে কওম যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে—যে পথে চলে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহিদের বাণী শুনিয়েছিল। তোমাদেরই মাঝে থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম—দাঁড়াও তাঁর পতাকাতলে তহরিমা বেঁধে। বলো আল্লাহু আকবর, হাঁকো হায়দারি হাঁক, সপ্ত আসমান চাক হয়ে ঝরে পড়ুক খোদার রহমত, নবির দোওয়া। চাঁদ সেতারা গলে পড়ুক কল্যাণের পাগল-ঝোরা।

আর্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে—কে করবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও? তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসেরাত—সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নূতন জাতি। তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন, যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরির জন্য, দাসখত লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন—তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক পিরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতোই পাক। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয় তবে কাজ কি এই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বাজে খরচ করে?

জরাগ্রস্ত পুরাতন পৃথিবী চেয়ে থাকে যুগে যুগে তোমাদের—এই কিশোরদের—এই তরুণদের মুখের পানে। তোমরা শোনাও তাকে তাজা-ব-তাজার গান, আর তোমাদের সেই প্রাণচঞ্চল সঙ্গীতের জাদুতে সে পাক নব-যৌবনের কান্তিশ্রী! তোমাদের বরণ করে

দুলহিনের সাজে সেজে ষড়ঋতুর ডালা শিরে ধরে আজো সে চেয়ে আছে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমাদের পানে—তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দানে তার প্রতীক্ষার শূন্যতা কি পূর্ণ হবে না? কত কাজ তোমাদের—ধরণীর দশদিক ভরে কত ধূলি, কত আবর্জনা, কত পাপ, কত বেদনা—তোমরা ছাড়া কে তার প্রতিকার করবে? কে তার এলাজ করবে? তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আয়ুর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধি-নিষেধের, অনাচারের জিঞ্জির বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদির আশায় ফরিয়াদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে, তার এ আর্জি কি বিফল হবে? এই বাংলার না কি শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান। কিন্তু গুন্‌তিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে বাঙলার সত্যকার গৌরব করবার কতটুকু আছে, তা হিসাব করতে গেলে মনে হয়—আমরা শতকরা পাঁচজন হলেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দুঃখে তাই বলেছিলাম,

ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।

এ লজ্জা, এই অপমানের গ্লানি থেকে তোমরা তরুণ ছাত্রদল বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও। সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।

ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে, সুবহ্‌-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারীশক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী হয়েছিলেন—যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে—তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে—সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার—তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা—যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দূরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজো তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না।

তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই—হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম—সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মজহাবি, ওহাবি ও আরো কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধাবিচ্ছিন্ন

এই শতদলকে এক সামিল করো, এক জামাত করো—সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।

বুলবুল
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

জন-সাহিত্য

[১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেন দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে, জন সাহিত্য সংসদের শুভ-উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ।]

সাহিত্যে সবারই প্রয়োজন আছে, দুনিয়ায় হাতিও আছে, আরশুলাও আছে। তাদের কে বড় কে ছোট, বলা যায় না। তার কারণ, হাতি খুব বড়, কিন্তু আরশুলা উড়তে পারে।

জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হল জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মতো শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না—জনমতও সৃষ্টি হয় না।

যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বক্তৃতা, প্রবন্ধ তাদের প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মতো করে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তো বুঝতে পারে না। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানা ভাব প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা পালিয়ে যাবে। চাষীরাও আয়না রাখে ; নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখবে।

আমিও একবার ভাবছিলাম ; জারির গান, গাজির গান ওদের ভাষায় লিখে ওদের জন্য চালাব তা হয়ে ওঠে নাই।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আমার আছে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।

আমি আট বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন যৌবন ছিল, আর আমিও তার চঞ্চলতা নিয়ে যুবক। কিছুর ভয় করিনি। খেতাম হোটেলে, শুতাম মসজিদে, ছেলেদের খুব ভালবাসতাম, কিন্তু বহু মেশার পরেও আমি দেখলাম তাদের সাথে যেন আমার মিশ খাচ্ছে না। আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি; আমার নিজের ব্যর্থতায় আমি নিজেকেই দায়ী করেছি। তারপর সে-পথ ছেড়ে যে-পথে আজ চলেছি সে-পথে এসে পড়লাম। আর মনে করলাম, ও-পথের যোগ্য আমি নই। ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাস নেই। আমার নিজের উপর যে-সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস নেই, সে-সম্বন্ধে নেতৃত্ব করা আমার সাজে না।

আজকাল জনসাধারণের জন্য দরদ জেগেছে সবার মধ্যে, কত রকম 'ইজম' মতবাদ এরজন্য সৃষ্টি হয়েছে। যা-ই হোক, তাদের এই দরদ যদি সত্যিকারের প্রাণের দরদ হয়, তবেই মঙ্গলের। বাইর থেকে তাদের দরদ দেখালে তারা বিশ্বাস করে না। তাদেরই একজন হতে হবে। তাদের কাছে টর্চলাইট হাতে নিয়ে গেলে তারা সরে দাঁড়াবে, কেরোসিনের ডিবে হাতে করে গেলে, তার থেকে যত ধোঁয়াই বের হোক না কেন, তাদেরকে আকর্ষণ করবেই। কারণ, টর্চলাইটে তারা অনভ্যস্ত। ওতে তাদের চোখ ঝলসায়। কেরোসিনের ডিবে ওদের নিজেদের জিনিস। অবশ্য যাদের টর্চ-লাইটই সম্বল, তাদের পথ শহরের দিকে; গ্রামের দিকে, জনসাধারণের দিকে গেলে তাদের ঠিক হবে না। যাঁরা ইনটলেকচুয়াল, তাঁদের আমি জনসাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না। কিন্তু এমনও তো সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের সম্বল কেরোসিনের ডিবে। এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দুঃখ করলে কোনো লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিকে গ্রাহ্য করে না।

ওদের জন্য যে সাহিত্য, তা ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাছল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি-ভাব ধরা না পড়ে। সে জন্য তথাকথিত ভদ্র-পোশাক-পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে—ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে সে-চেষ্টা সফল হবে, নইলে না।

আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কী করে চলে?

একমাত্র সন্তান মরে গেছে, পুরুষ বিদ্রোহ করে খোদার বিরুদ্ধে, কিন্তু স্ত্রী তাকে বলে খোদার মহান উদ্দেশের উপর বিশ্বাস রাখতে। এদের খবর, এদের প্রাণের খবর কে রাখে? এদের কাছে যেতে জানতে হবে এদের।

নিজের কওমের যদি মঙ্গল করতে চাই, তবে তার জন্য অপর কাউকে গাল দেয়ার দরকার করে না। যারা অপরকে গাল দিয়ে 'কওম' 'কওম' করে চিৎকার করে, তারা ঐ

এক-পয়সায় মক্কা-মদিনা-দেখানেওয়ালাদেরই মতো। তারা কওমের জন্য চিৎকার করতে করতে হয়ে যান মন্ত্রী, আর ত্যাগ করতে করতে বনে যান জমিদার। কওমের খেদমত করতে করতে কওম যাচ্ছে গরিব হয়ে, আর গড়ে উঠেছে নেতাদের দালান-ইমারত। হজরত ওমর, হজরত আলি এঁরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন ; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই করে, কেতাব লিখে, সেই রোজগারে দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন ; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন?

কওমের সত্যিকার কল্যাণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে হজরত ইব্রাহিমের মতো।

দুদিন বাদে কোরবানির ঈদ আসছে। ঈদের নামাজ আমাদের শিখিয়েছে, সত্যিকার কোরবানি করলেই মিলবে নিত্যানন্দ। আমরা গরু-ছাগল কোরবানি করে খোদাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। তাতে করে আমরা নিজেদেরকেই ফাঁকি দিচ্ছি। আমাদের মনের ভিতর যেসব পাপ, অন্যায়, স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গরু-ছাগল—যা আমাদের সৎবৃত্তির ঘাস খেয়ে আমাদের মনকে মরুভূমি করে ফেলছে—আসলে কোরবানি করতে হবে সেইসব গোরু-ছাগলের। হজরত ইব্রাহিম নিজের প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবানি করেছিলেন বলেই তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। আমরা তা করিনি বলে আমরা কোরবানি শেষ করেই চিড়িয়াখানায় যাই তামাসা দেখতে। আমি বলি ঈদ করে যারা চিড়িয়াখানায় যায় তারা চিড়িয়াখানায় থেকে যায় না কেন?

এমনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে জনগণকে যারা আপনার করে নিতে পারবে তারাই হবে জনগণের নায়ক।

নয়া জামানা
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৪৫

উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ

উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর অকাল-মৃত্যুতে আজকের এই সভা আহূত হয়েছে।** এই সভায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদের তিরোধানে শোক প্রকাশ করা হবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমার আশা ছিল, দেশের একজন খ্যাতনামা জননায়ককে এই সভার সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে এবং তা করলে শোভনও হত। আমি উস্তাদ

** ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ ইন্তিকাল করেন। ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায় সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

জমিরউদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ। আমি নিজে, গোলাম মোস্তফা ও আব্বাসউদ্দীন তাঁর কাছে গান শিখেছি। বাংলার হিন্দু–মুসলমান তরুণ গায়কেরা, যাঁরা সঙ্গীতজগতে নাম কিনেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই উস্তাদ জমিরউদ্দীনের শিষ্য। কেউ হয়তো বলবেন : জমিরউউদ্দীন ছিলেন পাঞ্জাবি, বাংলার তিনি কেউ ছিলেন না। এ উক্তি শুধু উক্তিই এর মধ্যে যুক্তি নেই। আমি বলি, গানের পাখি উড়ে বেড়ায়, নীড় বাঁধে না। কোকিল পাহাড়ে থাকে, সে আসে বসন্তকালে, তার গান আমাদের মুগ্ধ করে। তারপর গান গাওয়া শেষ হলে আবার সে চলে যায়। সুরের আবেদন সমানভাবে সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। জমিরউদ্দীন পাঞ্জাবি ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। বাংলাদেশে ছোটবেলায় তিনি এসেছিলেন, বাংলাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায়ই তিনি কথা বলতেন এবং নিজেকে তিনি বাঙালি বলে পরিচয় দিতেন এবং এজন্য গর্ব অনুভবও করতেন।

আজ সঙ্গীতলোকের একজন গুণীর শোকসভায় আমরা সমবেত হয়েছি, এটা এ দেশের পক্ষে অভিনব। শরিয়তের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ এই সভার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে চাইবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন, যে সারা জীবন গানই গেয়ে গেল, ধর্মের কাজ সে করল কোথায়? তার জন্য মুসলমান শোকসভা কেন করবে? তাদের কথা নিয়ে আমি বিতর্কে যোগ দিতে চাইনে। আমি শুধু বলতে চাই যে বেহেশতের পাখি যখন গান করে তখন পৃথিবীর ধুলো থেকে সে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ফকির দরবেশ যখন সেজদা করে, তখন তার মন মাটি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তিপথ পেয়েছে। হজরত ইসমাইলের পায়ের দাগে মরুভূমির বুক চিরে পানি উঠেছিল। সেই পানি মানুষের জন্য, পবিত্র জমজমের পানি হয়ে আত্মার শান্তিদান করে। সুরের আঘাতেও মনের পানি উথলায়। সুর কখনও খারাপ হয় না। খারাপ মানের পাত্রে পানি রাখলে সে পানি হয়তো দূষিত হয়, কিন্তু তাই বলে পানিকে দোষ দেওয়া যায় না। পানি মানুষের তৃষ্ণা মিটায়, মানুষের জীবন বাঁচায় ; আবার বন্যা হয়ে মানুষের ধ্বংসও আনয়ন করে ; তাই বলে পানিকে তো আমরা খারাপ বলতে পারিনে। সুরের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা যেতে পারে। ফুল দিয়ে কোথাও কোথাও পূজা হয়। সেই ফুল নগরবিলাসিনীদের কণ্ঠেও শোভা পায়। তাই বলে ফুল খারাপ, একথা বলা যায় কি? শরিয়ত হয়তো খারাপ দিকটাকেই খারাপ বলতে পারে। কিন্তু সুর কখনো খারাপ নয়।

একথা অবশ্য–স্বীকার্য যে, মানুষের মারফতে দুনিয়ার বুকে আল্লার রহম নেমে আসে। সুরও আল্লার রহম–রূপে দুনিয়ায় নাজেল হয়েছে। কিন্তু সব মানুষের মুখ দিয়ে তো সুরের রহমত বের হয় না। যাঁদের মুখ দিয়ে সুর বেরোয় তাঁদের উপর আল্লার রহম আছে। শরিয়তের তর্ক আমি তুলতে চাইনে। হাফিজের মৃত্যুর পর কেউ তাঁর জানাজা পড়তে চায়নি। কিন্তু হাফিজ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, আমার বইয়ের পাতা খুলে প্রথম যে চরণ তোমাদের চোখের সামনে পড়বে, তাতেই তোমরা আমার কাম্য খুঁজে পাবে। শিষ্যরা হাফিজের মৃত্যুর পর এক অন্ধকে দিয়ে তাঁর বইয়ের পাতা খুলে দেখাল,

লেখা রয়েছে : 'আল্লাহ, আমার লাশ কেউ দাফন করবে না জানি, কিন্তু এও জানি, তোমার দরবারে আমায় গ্রহণ করবে।'

যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হয় এবং এই প্রয়োজন মেনে নিতে হয়। এই পরিবর্তনের জন্যই যুগে যুগে মোজাদ্দেদ আসেন। মানুষের পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধার ন্যায় মনের ক্ষুধাও আছে ; এ ক্ষুধা মিটাতে হয়। ঈদের দিনে মানুষ কোর্মা-পোলাও-ফিরনি খায় পেটের ক্ষুধা মিটাতে ; কিন্তু আতর খোশবু মাখে, এটা হলো মনের বিলাস । গানও তেমনি মানুষের মনের ক্ষুধা মিটায়। যাঁরা সাহিত্যিক, কবি, গায়ক তাঁরা মানুষের মনের ক্ষুধা মিটান। বাইরের ক্ষুধা যাঁরা মেটান, আমরা তার দাম দিই। কিন্তু মনের ক্ষুধা যাঁরা মেটান তাঁদের দাম আমরা দিই না। তাঁরা মানুষের নিকট থেকে তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা পান না। তাঁরা প্রচ্ছন্নই থেকে যান। স্রষ্টা যিনি, তাঁর সৃষ্টিতেই সুখ। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সৃষ্টির সুখেই তিনি মশগুল থাকেন। ...

দেশের জন্য যারা নির্যাতন ভোগ করে তারা ফুলের মালা পায়। কিন্তু যাঁরা এদেরকে ফুলের মালা পাওয়ার মতো করে গড়ে তুললেন, তাঁরা তো মালা পান না। তাঁরা সব সময়েই থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। আল্লাহ যে এত বড় স্রষ্টা, তিনিও তাই মানুষের দেখার অতীত, কল্পনার অতীত। তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাই তিনি সবচেয়ে বেশি গোপন।

বসন্ত বনে হিল্লোল জাগায়, মনে আনন্দ-শিহরণ তোলে। দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাবেই। তাকে নিন্দা করলেও সে বয়ে যায়, প্রশংসা করলেও বয়ে যায়। কোকিলের গানকে খারাপ বললেও কোকিল গান গাইবেই। গায়কও সৃষ্টির আনন্দে গান গেয়ে যায় ; কারো নিন্দা-প্রশংসার সে অতীত।

জমিরউদ্দীন যে দান বাংলায় রেখে গিয়েছেন, তার দাম বাংলার অনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রুহ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।

জমিরউদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানি গাইয়ে। তিনি ঠুংরী-সম্রাট। উস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর তাঁর মতো ঠুংরী গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না ; এখন তো নাই-ই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপপা, গজল, দাদরা, সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গ্রামোফন কোম্পানির রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোনো সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নতুনতর সুর তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। ইনি লোকের যে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র তা বেঁচে থাকতে জানতে পারেননি। এতদিন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনি, কাজেই আজকের সভায় তার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেলাম। তাঁর নামকে অক্ষয় করে রাখতে হলে ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে একটা classical music চেয়ার সৃষ্টি করা দরকার, কিংবা তাঁর নামে ইউনিভাসিটি থেকে একটা মেডেল ঘোষণা করা দরকার। সেজন্য যে টাকা প্রয়োজন তা একটা কমিটি গঠন করে সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার কৃতী ছাত্র রয়েছে। আমরা যদি এ কাজ করি তবে একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সেদিন জমিরউদ্দীনের কদর হবে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের বংশধররা যেন

সেদিন মনে করবার অবসর না পায় যে, আমরা নির্বোধ ছিলাম, গুণীর আদর করতে জানতুম না। কেবল রাজনৈতিক নেতাদেরকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না ; যাঁরা তিলে তিলে আপনাদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিলেন সেইসব কবি, গায়ক ও সাহিত্যিকদেরকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আপনাদের আনন্দ দানের জন্য যিনি তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই জমিরউদ্দীন খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আপনাদের একান্ত ফরজ। আপনারা তাঁর শোকসভা করে তাঁর প্রতি আপনাদের কর্তব্যই করলেন।

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ

[১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

আজকের ঈদ-সম্মেলনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচিত করে গৌরব দান করেছেন, এজন্য আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদিগকে 'ঈদমোবারক হো' বলে প্রথমেই অভিনন্দিত করছি। ঈদের উৎসব আনন্দের উৎসব, ত্যাগের উৎসব। আল্লার রাহে সব কিছু কোরবানি করার ইঙ্গিতই এই উৎসব বয়ে এনেছে। কোরআনের ছুরে বকরায় এই কোরবানির কথা রয়েছে এবং ছুরে নূরের ভিতর উল্লেখিত জয়তুন ও রওগণের যেসব কথা রয়েছে, তার অর্থ সকলকে আমি অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লার নামে সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ কোরবানি করতে হবে। একটা গরু কোরবানি করেই সবকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এই নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে—এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোনো ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। ঈদের শিক্ষার ইহাই সত্যিকার অর্থ।

আজ মুশায়েরার সম্মেলন। কবি ও সাহিত্যিকদের আজ সমাবেশ হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিক, সুরশিল্পী মানুষের আনন্দলোকের, সৌন্দর্যলোকের বাণী বয়ে আনে। এজন্য সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীরা মানব-সভ্যতার গৌরব। আনন্দ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। মানুষ অন্নের জন্য ক্ষুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্য-পিপাসাকে

অনুভব। মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম। মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিবেশন করার জন্যই কবিরা এসে থাকেন। জল কমল ফোটায় ; জল না থাকলে কমল ফুটত কি ? অকবির সৌন্দর্যক্ষুধা মিটাবার জন্যই কবির আগমন। সকল মানুষের আটপৌরে জীবনের সাথে চলে এই সৌন্দর্য-জীবনের দাবি। আমি একদিন একজন লোককে বাজার থেকে ফিরে আসবার সময় লক্ষ করলাম তার এক হাতে মুরগি ও আর এক হাতে রজনীগন্ধা ফুল। আমি তাকে আদর জানিয়ে বললাম, এমন fair and foulএর সমাবেশ একত্রে কোথাও দেখিনি ?

এই সৌন্দর্যের, অমৃত পরিবেশনের ভার কবি ও সাহিত্যিকদের হাতে। এ পথে সাহিত্যিকদের হয়তো দুঃখ-কষ্ট আছে অনেক, কিন্তু তাদের ভীতু হলে চলবে না। মানুষ ক্ষুধার অন্ন মিটিয়েই অবকাশ পায় না। ধান গাছ জন্মিয়ে মানুষ মাঠের পর মাঠকে অরণ্য করে তোলে, কিন্তু গোলাপের চাষের আয়োজন এদেশে করে কজন ? আরও দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগকে ভোগ করতে হয় জীবনে। এজন্য বিচলিত হলে চলবে না। দুঃখের আঘাতকে আনন্দের আহ্বানের মতোই বরণ করে নিতে হবে। কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি যেন শতদল। তার এক একটি দল জন্ম নিয়েছে এই দুঃখ-বেদনার আঘাত পেয়ে।

আমার আজ বেশ মনে পড়ছে—একদিন আমার জীবনে এই মহানুভূতির কথা। আমার ছেলে মরেছে, আমার মন তীব্র পুত্রশোকে যখন ভেঙে পড়ছে, ঠিক সেদিন সে সময়ে আমার বাড়িতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে—এই-ই হল পূর্ণ জীবন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি—এসব তারই প্রকাশ। আমার কাব্য ও গান বড় হয়েছে কি ছোট হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই—আমি জীবনকে উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে। দুঃখকে বিপদকে আমি দেখে ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাস্টারের বড় আশা ছিল—আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে। চাঁটগায়ে গিয়েছি—সমুদ্র দেখেছি—তাতে ঝাঁপ দিয়ে জীবনকে করেছি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ। একদিন একজন পুলিশ আমার মাথার সম্মুখে পিস্তল উঠিয়ে বললে, 'তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারি।' আমি বল্লাম, 'বন্ধো ! মৃত্যুকেই তো আমি চিরদিন খুঁজে বেড়াই।'

তরুণদের কাছে আমি চাই—তারা যেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। আজ আমার সম্মুখে যে তরুণ সমাজকে দেখছি, তাতে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। তারা যেন জরায় আবৃত। জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য আজ তাদের

মধ্যে দেখতে পাই না। দুকূলপ্লাবী জীবন ও যৌবনের জোয়ার তাদের জীবনে আসুক এটাই আজ তাদের নিকট আমি চাই। সকল প্রকারের ভীরুতা হতে জীবনকে মুক্তি দিতে হবে। এই সৃষ্টির সকল কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে হবে। এই জন্যই শ্রদ্ধা হয় এ-যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি। তাঁরা চেয়েছেন সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করতে। কি দুর্জয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। সকল বিশ্বকে, সকল সৃষ্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব—এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রূপায়িত হোক। এই-ই আমরা চাই। জীবনের পাত্র আমরা আবর্জনা দিয়ে বোঝাই করে রেখেছি, এই আবর্জনা হতে আমাদের জীবনকে মহতের উপযুক্ত আধার করতে হবে। নদীতে নুড়ি থাকে, এক ফোঁটা জল সে পায় না। কারণ, অন্তর তার শূন্য নয়। এমন করে আমাদের অন্তর মুক্ত করে বৃহৎকে জীবনে বরণ করে আনতে হবে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ-জন্যই চাই সেই মুক্ত ও বিরাট জীবন।

সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না। এই স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ বাংলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই। এইই ইসলামের শিক্ষা ; এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। আমি আমার জীবনে এ-শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দেইনি। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির'—এ গান আমি আমার এ-শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি। এই আজাদ-চিত্তের জন্ম আমি দেখতে চাই। ইসলামের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী—ইসলামের ইহাই মর্মকথা।

শিরাজী

শিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভাবিতেন জ্যেষ্ঠপুত্র-তুল্য। তাঁহার নিকট যে স্নেহ আমি জীবনে পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। ফরিদপুর কনফারেন্সে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল অনলপ্রবাহ। আমার রচনায় সেই অগ্নিফুলিঙ্গের প্রকাশ আছে। সাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছাড়াও আমার চোখে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন এক শক্তিমান দরবেশ-রূপে। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন নাই, তুরস্কের রণক্ষেত্রে তিনি সেই মৃত্যুর সঙ্গে

করিয়াছিলেন মুখোমুখি। তাই অন্তিমে মৃত্যু তাঁহার জন্য আনিয়া দিয়াছিল মহাজীবনের আস্বাদ।**

দৈনিক 'কৃষক'
৯ই চৈত্র, ১৩৪৭

আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ

[১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর (১৩৪৭ সালের ৭ই পৌষ) রবিবার কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলিকাতা মুসলিম-ছাত্র সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষণ।]

আস্‌সালাম আলায়কুম !

আমার সোদর-প্রতিম তরুণ-দল ও ছাত্রবৃন্দ। আপনাদের অনেকে বহুদিন থেকে এই দীন ফকিরের কাছে আসা-যাওয়া করছেন—যারা আসেন না তাঁরাও নাকি আশা করে বসে আছেন শিরনির আশায়। যে ফকিরের ঝুলি রইল আজও শূন্য, আল্লাহর পরম রহমতের আশায় যে ভিক্ষু আজও ঊর্ধ্বের পানে হাত পেতে বসে আছে, তারই কাছে যখন আপনারা হাত পাতেন, তখন আমার আঁখি অশ্রুতে ভরে ওঠে। পরম করুণাময়ের পরম রহমত পাওয়ার শুভক্ষণ যখন এল ঘনিয়ে—যে ভাণ্ডার হতে তাঁর অনন্ত শক্তি অসীম করুণা নিয়ত বিতরিত হচ্ছে সেই অতি গোপন ভাণ্ডারের দ্বারে পৌঁছে যদি আমি আপনাদের আহ্বানে পিছু ফিরে চাই, তাহলে বঞ্চিত শুধু আমিই হব না, হবেন আপনারা—যাদের জন্য আমার এই তপস্যা, এই হজ্জ্বযাত্রা। আরাফাতের ময়দানের তকবির যখন শুনতে পাচ্ছি—পবিত্র কাবাঘরের ছায়া যখন আকাশের নীল শিসায় ফুটে উঠেছে—তখন আমার আত্মীয় যারা তারাই যদি পিছু ডেকে ফিরাতে চায়, তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত দুই হবে বরবাদ। আমার এই ঘোর দুর্দিনের, দুর্যোগের মরুভূমি দিয়ে তীর্থযাত্রা হবে নিষ্ফল। 'সলুক' (journey) ও তরিকতেই (path) হবে আমার মৃত্যু।

বন্ধুগণ ! আল্লাহ জানেন, আমার অমৃতের সাধনা—আমার মুক্তির, আজাদির সাধনা আমার একার জন্য নয়। অমৃত যদি পাই, মুক্তি যদি পাই—সে অমৃতে মুক্তিতে আপনাদের সকলের হিসসা আছে। শুধু পরম গোপনকে জানাই আমার সাধনা নয়—তাঁকে জেনে তাঁকে পেয়ে প্রকাশ-জগতে আনার জন্যই আমার এ তপস্যা। আজ যখন আমার বন্ধুদের ভাইদের কাছ থেকে যশ-খ্যাতি-অভিনন্দনের ডালি আসে তা গ্রহণ

** ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ২২ শে মার্চ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা ২/১ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

করতে ভয়ে আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে আসে। আমি জানি, এ অভিনন্দন গ্রহণ করার আমার কোনো অধিকার নাই।

যে-দেশে লোক ভাড়া করে যশ-খ্যাতি-অভিনন্দনের থালা ও মালার প্রোপাগাণ্ডা চলে, সে দেশে আমি কেন যে বহু বৎসর ধরে আপনাদের আমন্ত্রণ ও অভিনন্দনকে অস্বীকার করে আসছি—তার একমাত্র কারণ, আমার একদা এক শুভ প্রভাতে কেন যেন মনে হয়েছিল, বাইরের মালায় যার হাত পড়ল বাঁধা, অন্তর্লোকের—ঊর্ধ্বের পরম দান থেকে সে হাত হল চির-বঞ্চিত। বাইরের ক্ষুদ্র প্রশংসায় যার পাত্র উঠল পুরে—অমৃত পরিবেশনের শুভক্ষণে সে হল অপাত্র।

কে করবে দেশকে স্বাধীন, কে আনবে মুক্তি? কোথায় সেই স্বাধীন মুক্ত আত্মা? যে নিজে নিত্য কামনা বাসনা লোভ অহঙ্কার ঈর্ষার কাছে নিত্য-পরাজিত—সেই বদ্ধজীবে কে আনবে জয়ের শুভ্র নির্মাল্য? যার অন্তর বাহির সমস্তটা রইল আত্মতৃপ্তির ক্ষুধায় পূর্ণ—সেই ক্ষুধিত মূর্তি আজ বাইরে ত্যাগের গেরুয়া ও খেলকা পরে কৌমের দেশের জনগণকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর পথে, জাহান্নামের পথে। 'ডেমন' ও 'ডার্ক ফোর্সের' শক্তি বিপুল—কিন্তু এ শক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না—এদের পথ 'সেরাতুল মুস্তাকিম' নয়—এ পথ 'গজবের', অভিশাপের পথ, এ পথে আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া নাই—এ পথের পথিকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে যে মুসলমানের—কোরআন মজিদের এক হরফও যারা হৃদয়ঙ্গম করে তারা জাত-ভাইকে জাতিকে এমন মিথ্যার পথ দিয়ে নিয়ে যায় না। এদের খেলকার ভিতরে, এদের চোগা-চাপকানের অন্দরে—যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি যায়, তাঁরা দেখবেন—এরা সুদখোর কাবুলির চেয়েও ভীষণ-দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কাবুলি সুদ পেলে রেহাই দেয়, এরা সুদে-মূলে সাবাড় করতে চায়। অন্তরে আল্লাহর করুণার এক কণাও যে পেয়েছে, তার কখনো এই বীভৎস লোভী মূর্তি দেখা যায় না। সে কখনো বাইরের যশ-খ্যাতি-ঐশ্বর্যের মোহে জোঁকের মত কওমকে জাতিকে রক্ত শুষে মেরে ফেলে না। অন্তরে যে আল-ফাজালিল আজিম—পরম প্রসাদদাতা আল্লাহ্‌র প্রসাদ পেল না—সে-ই বাইরের এই দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায়। তথাকথিত স্বাধীন দেশেও এই শক্তি-মাতাল দানবের উৎপাত চলেছে—ভারতেও চলেছে এই শক্তিলোভীর সাম্যহীন ভেদলীলা। যে দৃষ্টির দর্শনশক্তি এই দেওয়ালের ওপারে পৌঁছায় না, সেই খর্বদৃষ্টি অন্ধের ইঙ্গিতে চলেছে অগণন জনগণ। এই নেতাদের শক্তি নাই, কিন্তু অতি কূটবুদ্ধি আছে; যৌবন নাই, কিন্তু যৌবনের কাঁধে ভর করে জয়যাত্রার মিছিল বের করার প্রখর বুদ্ধি আছে। এই জয়যাত্রার মিছিলকে আমি দেখেছি—জানাজার মিছিলের মতো। জরাগ্রস্ত জইফ যারা তাঁদের উপর আমার ব্যক্তিগত কোনো অশ্রদ্ধা নেই—আমার বর্তমান ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তারা জানেন আমার চেয়ে তাঁদের কেউ বেশি শ্রদ্ধা করেন না। আল্লাহ জানেন তাঁদের বুজর্গ বলে পদধূলি নিতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। কিন্তু তাঁরা যখন জাতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হয়ে অগ্রে চলতে চান—তখনই আমার পায় হাসি। আমি এই জায়গায় তাঁদের সালাম বা নমস্কার করতে পারিনি।

জরার প্রধান ধর্ম হলো—অতি সাবধানে পা টিপে টিপে বিচার করতে করতে চলা। এই অতি সাবধানীরা (ভিরু নাই বললাম) অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার না করে পশ্চাতে 'রিট্রিট' করার পথ উন্মুক্ত রাখতে চান। 'আগে-চলো-মারো-জোয়ান-হেঁইয়ো' বলে এগুতে এগুতে যেই এসে পড়লো চৌরিচোরার দুটো খুনোখুনি, অমনি সেনাপতির কণ্ঠে ক্রন্দন ধ্বনিত হল—'পিছু হটো, পিছু হটো।' গণ-ঐরাবতের পায়ে কাপাস-তুলো চরকাকাটা সুতোর পুঁটুলি বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তার বিপুল আয়তনের জন্য দুটো চারটে লোক মারা গেল এইটাই সেনাপতির চোখে পড়ল—আর (ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম) এই বাংলাদেশে যে কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ায় বছরে বছরে এগার লক্ষ করে লোক cold blooded murdered হচ্ছে সেদিকে একচক্ষু সেনাপতির দৃষ্টি পড়ল না। কানা হরিণের মতো তাঁর মৃত্যুবাণও এল তাই ঐ ভয়ের পথ দিয়েই। মৃত্যুর ভয় যার হয়তো নিজের গেছে—কিন্তু অন্যের মৃত্যু দেখলে যার মৃত্যু-যন্ত্রণা হয় ভয়ে কূর্ম-অবতার হয়ে যান—তিনি আর যাই করুন অমৃতসাগরের তীরে নিয়ে যাওয়ার সাধনা তাঁর নিষ্ফল হয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মধ্যে যিনি পরম নিত্যম, নিত্য পূর্ণম—তাঁকে যিনি উপলব্ধি করলেন না, তাঁর সংহার রূপকে যিনি অস্বীকার করলেন, ভয়ের পশ্চাতে অভয়কে দেখলেন না তিনি আর যাই পান—পূর্ণকে পাননি। তবু কাঠ পুড়ছে বলে, যে শুধু কাঠের ধ্বংসই দেখল, আগুনের সৃষ্টি দেখল না, তার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়। এর এক চোখে দৃষ্টি আছে আর বাকি যারা তারা একেবারে দৃষ্টিহীন অন্ধ। এরা হাতে বড় বড় মশাল জ্বেলে চলেছেন—কিন্তু অন্ধের হাতে মশাল যত না আলো দেয় তার চেয়ে ঘর পোড়ায় বেশি।

এই জরাগ্রস্ত সেনাপতিদের বাহন আজ দেশের যুবক-শক্তি। এই যুবকদের কাঁধে চড়ে এঁরা যশ খ্যাতি ঐশ্বর্যের ফল পেড়ে খাচ্ছেন। বাহক যুবকবৃন্দ তার অংশ চাইলে বলেন—আমরা ফল খেয়ে আঁটি ফেললে সেই আঁটিতে যে গাছ গজাবে তারই ফল তোমরা খেয়ো। এই আঁটির আটির আশায় যুবকদের কণ্ঠে জরার জয়গান করে চেঁচাতে চেঁচাতে আজ বাঁশের চাঁচাড়িতে পরিণত হয়েছে, চাকরির দরখাস্তের পাতা পেলে দলে দলে যুবক, দেখতে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে আছে—ভোট ভিক্ষা করে তাদের ঠোঁট গেছে ছিঁড়ে, মোট বয়ে কোট হয়েছে নিমস্তিন, পথে ঘুরে ঘুরে পায়জামা পরিণত হয়েছে জাঙ্গিয়ায়—কিন্তু দরখাস্তের পাতায় পোলাও আর পড়ল না। দুচার জনের পাতায় যা পড়ল—তার চেহারা দেখে বাবুর্চির 'বাবুর' 'চি' শব্দ—দুয়ের উপর আসে ধিককার। যুবকেরা নিজেরাই জানেন, 'ইয়ে দুঙ্গা উয়ো দুঙ্গা' বলে যারা চোগা-চাপকানের পকেট দেখান—তাঁদের চাকরি বা অন্য যে কোনো কল্যাণ-দানের শক্তি অতি সামান্য। তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও দেওয়ার শক্তি নেই। তবু শিক্ষিত তরুণেরা স-তল্পি তাঁদের বয়ে বেড়াচ্ছে—এই আশায় যে, কোন্ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে? যারা অন্যের ক্ষুধা দূর করার জন্য নিজের ক্ষুধা আগে মেটান—তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরতের বা তাঁর আসহাবদের শিক্ষা কখনো গ্রহণ করেননি। নিজেরা সাততলা দালানের আশ্রয়ে থেকে নিরাশ্রয় জনগণের জন্য কাঁদলে—তা কখনো তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে না।

অন্ধকূপে যে গেছে পড়ে—সাত মহলার উপর থেকে 'আরে কম-জোর ওঠ—আরে কম-বখত ওঠ' বলে চেঁচালে সে কুয়া থেকে উঠতে পারবে না। উপরওয়ালার নেতার হুকুমে কুয়া থেকে উঠতে গিয়ে তার বুক যাবে ছিঁড়ে—পা যাবে ভেঙে। যিনি সত্যিকার তাকে অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে চান—তিনি তাঁর সভ্য পোশাক, কালচারের কালচে-পড়া মুখোশ খুলে কুয়ায় নেমে কাঁধ দিয়ে ঊর্ধ্বে তোলেন। এই কোটি কোটি নিরন্ন নিরাশ্রয়ের বেদনায় যার ক্ষুধার অন্ন মুখে উঠবে না ঐ ভিক্ষুকদের সাথে পথে পথে করবেন ভিক্ষা—ঐ নিরাশ্রয়দের সাথে গাছতলা হবে যার আশ্রয়—ইট-পাথর হবে যার উপাধান—ছিন্ন কন্থা হবে যার এক মাত্র আবরণ সেই পরম বৈরাগীই এই বাংলার-ভারতের-মহাভারত বিশ্বের অনাগত সেনাপতি-নেতা-লিডার-ইমাম। যিনি অন্তরে আল্লাহর আনন্দরূপকে প্রাপ্ত হননি—পরম শান্তের শান্তির প্রাসাদ যিনি পাননি তিনি এই পথের দুঃখকে অগনিত জনগণের জন্য এই দারিদ্র্য-অনাহার-উৎপীড়ন-আঘাতকে সহ্য করতেই পারবেন না। অন্তরে পরম ঐশ্বর্য পেয়েও যিনি পরম ভিক্ষু—অনন্ত আসক্তির ভোগের মাঝে যিনি নিরাসক্ত নির্লোভ নিরভিমান নিরহঙ্কার সেই পরম অভেদজ্ঞানী পরম সাম্য সুন্দরের প্রতীক্ষায় আমি দিন গুনছি। তাঁর আনন্দ-সুন্দর জ্যোতি মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে হে আমার প্রিয়তম তরুণবৃন্দ—তোমাদের চোখে মুখে। তাঁর অজর অমর অক্ষয় তনুর বজ্র শক্তির ঝিলিক দেখি তোমাদের শক্তিতে তাঁর অভয়-সুন্দর দক্ষিণ হাতের আভাষ পাই তোমাদের বাহুতে। তোমরা ডাকো, ডাকো, তাঁকে তোমাদেরই মাঝে, জরাজীর্ণ দেহে নয়, লোভ অহঙ্কার ঈর্ষার অপবিত্র দেহে নয়—তোমাদেরই শুদ্ধদেহে সেই সর্বভয়মুক্ত সর্বভেদ-জ্ঞান-মুক্ত শক্তি-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধ মহাপুরুষকে ডাকো তোমাদেরই মাঝে।

আমি আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে এই আশার বাণী শোনাচ্ছি—তিনি প্রকাশিত হবেন তোমাদেরই মাঝে। জরাজীর্ণ দেহে নয়। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের প্রার্থনা আমার মতো মহামূর্খকে লিখালেন কবিতা, গাওয়ালেন গান—তাঁর শক্তি এই নাম-গোত্রহীনের হাতে দিলেন আশার বাঁশি, আহ্বানের তূর্য, রুদ্রের ডমরু বিষাণ। তোমরা চাও—আরো চাও—দেখবে তোমাদেরই মাঝে চির-চাওয়া রুদ্র-সুন্দর আসবেন নেমে।

আল্লাহ তাঁর এই দাসের—বান্দার জীবনকে ভেঙে চুরে মিসমার করে নতুন করে গড়েছেন। আমার আজও ভয় হয় যশখ্যাতির প্রলোভনকে ; 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'।

সেদিন আল্লাহ তাঁর এই বান্দার অন্তরে-বাহিরের সর্বসত্তাকে তার বলে গ্রহণ করবেন—আমার বলে কিছুই থাকবে না—যেদিন আমার পরম স্বামী পরম প্রভুর দরবার থেকে পাব ফরমান—সেই দিন আমি তাঁরই ইঙ্গিতে কর্মে নামব ; তার আগে নয়। আল্লাহ আমায় সর্ব-প্রলোভন হতে রক্ষা করুন। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেমের মিলনে তখন সে কর্ম হবে তাঁর কর্ম। এ বান্দার নয়—শুদ্ধ কর্ম। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই আল্লাহর রহমত আমি পেয়েছি—আমার পরম প্রিয় 'আল গফুরুল ওদুদ' (পরম ক্ষমা-সুন্দর ও প্রেমময়) আমায় নাজাত দিয়েছেন—কিন্তু অন্যকে মুক্ত করার শক্তি তিনি দেননি।

তার জন্য আমার কোনো ব্যস্ততা নেই। শান্ত হয়ে অটল ধৈর্য নিয়ে সেই শুভক্ষণের জন্য বসে আছি। যখন তার শক্তি নেমে আসবে আমাদেরই কারুর মাঝে—তুষার গলে স্রোতস্বিনীর মতো অনন্ত প্রবাহে, আপনাদের যারই মাঝে সেই শক্তি আসবে—সেই সেনানির আদেশ এই বান্দা হাসিমুখে পালন করে ধন্য হবে। আল্লাহর সেই শক্তিকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। অটল শান্ত ধ্যানী হতে হয়। ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল মেঘদলকে সমতলভূমি গ্রহণ করতে পারে না—তাকে গ্রহণ করে সমতলের ঊর্ধ্বে যে অটল গিরিচূড়া উঠেছে, সে। সেই ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় সঞ্চিত হয় সেই মেঘদল তুষাররূপে। সেই তুষার বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হলে অনুর্বর উপত্যকার অধিবাসীরা তার প্রসাদ পায়, তার দুই কূলে বাসা বাঁধে, তাদের অনুর্বর ক্ষেত্র উর্বর হয়, ফলে-ফুলে ভরে ওঠে। আল্লাহর ঊর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যারা দেশকে জনগণকে পরিচালিত করতে চান। বদ্ধ পুকুরের পানি দিয়ে দেশকে শস্য-শ্যামল করা যায় না। আপনাদের তরুণেরা প্রত্যেকেই অনাগত লিডার—তাই আপনাদের এই ঊর্ধ্বের কথা বললাম। যদিও আমি সেই নিরক্ষরদের একজন।

আপনারা জেনে রাখুন—আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই—'লিডার' হওয়ার লোভ ও দুর্মতি থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। আজ মোল্লা-মৌলবি সাহেবদের মুসলমানির ফখরের কাছে টেকা দায়। কিন্তু তাঁদের আজ যদি বলি যে ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ—আল্লাতায়ালায় সেই পরম আত্মসমর্পণ কার হয়েছে? আল্লায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ যার হয়েছে তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন। আমরা কথায় কথায় অন্য ধর্মাবলম্বী ও নিজ ধর্মের জ্ঞানবাদীদের কাফের বলে থাকি। এই কাফেরের অর্থ আবরণ, বা যা আবৃত করে রাখে। কাফের ও ইংরাজি 'কভার' এক ধাতু থেকে উৎপন্ন কি না ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলবেন। আল্লাহ ও আমার মাঝে যতক্ষণ আবরণ রইল, ততক্ষণ আমি কাফের, অর্থাৎ আমার পরম তত্ত্ব, আমার শক্তি ও সত্য ততক্ষণ আবৃত। এমন একজন মুসলমানেরও যদি বাংলায় কেন, সারা দুনিয়ায় সন্ধান পান—আমি তাঁর কাছে মুরিদ হতে রাজি আছি। আমার মধ্যে যতক্ষণ আবরণ অর্থাৎ ভেদাভেদজ্ঞান, সংস্কার, কোনো প্রকার বাধা-বন্ধন আছে ততক্ষণ আমার মাঝে 'কুফর'ও আছে। আমি সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বভেদাভেদজ্ঞানমুক্ত না হলে—সেই পরম নিবারণ পরম মুক্ত আল্লাহকে পাব না আমার শক্তিতে। শক্তিমান পুরুষই কওমের, জাতির, দেশের, বিশ্বের ইমাম হন—অধিনায়ক হন। অন্য দিক যাঁকে ধরতে পারেনি, সেই পরম দিগম্বরের করুণা পাবে এই সব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য লোভীর দল? যে জাতির পবিত্র কোরানের প্রথম শিক্ষা—'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন'—সমস্ত প্রশংসা মহিমা যশখ্যাতি আল্লাহর প্রাপ্য, আমার নয়—সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ করেও যারা ভোগের পাঁকে পড়ে রইলেন কর্দমবিলাসী মহিষের মতো তাঁরা আর যাই হোন আল্লাহর ও তাঁর রসুলের কৃপা পাননি। আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্ত একজন মুসলমানই যথেষ্ট, sixty percent তিনি গণনা

করেন না। নিত্য-আজাদ মুসলমানকে তিনি গোলামখানায় নিয়ে যান না। যারা অনাগত 'বদর' 'ওহোদের' যুদ্ধে বীর শহিদান হতে পারত—জাতির দেশের সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান সন্তানদের তিনি কশাইখানায় পাঠান না। যে দৃষ্টি আপাতমধুর লভ্যের লোভে তলোয়ারকে করে ঝিঙে চাঁচার বটি, মাটি খোঁড়ার খোন্তা—সে দূরদর্শী দ্রষ্টা নয়। অন্যের মাল পয়মাল করে নিজে ধনী হওয়ার গুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধর ফণী। তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। যে তরুণের বাজুতে শোভা পেত এসম্ আজমের তাবিজ, সেই হাতে বাঁধা আজ ভোট ভিক্ষার ঝুলি। যে কণ্ঠের তকবির-ধ্বনি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে তুলতে পারে, সেই কণ্ঠে আজ নেতার জয়ধ্বনিতে হল কলঙ্কিত। হে তরুণ ! তোমরা কি যাবে ঐ লোভের পথে ঐ গোলামির কশাইখানায় ? আজ চাকুরিলোভী বাঙালি হিন্দুজাতির দুর্দশা দেখ। চাকুরি যদি এরা গ্রহণ না করত, তা হলে এই বাঙালি অসাধ্য সাধন করতে পারত। যে লোকগুলো এক-পেটপিলে আর এক-পিঠ অপমান নিয়ে মরল—(মরতে তাদেরে হলই কিংবা যারা বাঁচল তারা হয়ে রইল মরারও বাড়া) তারা না হয় দুদিন আগেই মরত। মরে স্বাধীনতা আনলে তাদের বাপ-মা ছেলে-মেয়ে আরও ঐশ্বর্য পেত, যশ পেত, সম্মান পেত। তাদের ভালো খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা স্বাধীন ভারত করত। যে কয়টা মৃত্যু-বিলাসী—হাঁ, মৃত্যু ওদের আনন্দ-বিলাস ছিল বৈ কি—বাঙালি ছেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা কষল সেই নাম-না-জানা শহিদদের প্রসাদে দেশে যতটুকু এল স্বায়ত্তশাসন—তারই ছিবড়ে নিয়ে আজ আমরা কামড়া-কামড়ি করছি ! আজ মুসলমান ছেলেরা সেই আত্মত্যাগীদের আত্মার কাছে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে ? জেহাদের পথে শহিদানদের মৃত্যুসঙ্কুল পথে এগিয়ে যেতে পারে ? আমি গেয়েছি এই শহিদদেরই জয়গাথা ! তাদেরই জন্য আজও আমি লুকিয়ে কাঁদি। আল্লাহর রহমত পেয়েইও তাদের কথা—তাদের ত্যাগ মনে পড়লে আমি শিশুর মত চিৎকার করে কাঁদি ! যে নিত্য-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি, সেই শান্তির অটল আসন আমার টলতে থাকে।

আমি জানি, তোমাদের মাঝে বহু তরুণ আছে যাদের রুহ, আত্মা জাগ্রত। যারা বাইরের সম্মান, লোভ, খ্যাতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে রাহে-লিল্লাহ আপনাকে সদকা দিতে রাজি আছেন—আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—তাঁরা কি গ্রহণ করবেন দুনিয়ার এই ক্ষণিক ভোগের পথ ? তাঁরা কি গ্রহণ করবেন না এই মহামন্ত্র—'ইন্না সালাতি ও নুসকি ওয়া মাহয়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন'—'আমার সব প্রার্থনা, নামাজ রোজা তপস্যা জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত !' যে সংসারের সুখের জন্য তুমি আজ এত লালায়িত, তুমি কি বলতে পার, এই সভা হতে বাড়ি যাওয়ার আগেই তোমার সে লালসা চিরকালের জন্য ফুরিয়ে যাবে না ? তোমার বাপ-মা ছেলে-মেয়ে ভাই-বোনের জন্য তুমি চিন্তা করে তাদের কি দুঃখ-দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছ বা পার ? তুমি কি জান, তোমার জন্মেও যেমন তোমার হাত নেই—তোমার বা তোমার আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তেমনি তোমার কোন হাত নেই ? যে

কোন মুহূর্তে তোমার পিতামাতার সাধ-আশাকে মৃত্যু তার স্থূল হাত দিয়ে মুছে ফেলতে পারে। তুমি কি জান, তোমরা বা তোমার পিতামাতার ভার তোমার হাতে নেই—এই ভার একমাত্র যাঁর হাতে সেই আল্লাহর শক্তিতে নির্ভর কর তাঁর পরমাশ্রয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করে রাহে-লিল্লাহে আত্মনিবেদন কর। আমি আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে বলছি—এই আত্মনিবেদনেই তুমি তোমার আত্মীয়দের অভাবগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারবে। বিশ্বাস কর—আল্লাহ আল-গনি, তাঁর কোনো অভাব নেই—নিত্য পূর্ণ যে তাঁকে ডাকে তিনি তার সমস্ত অভাব দূর করেন, তাকে পরম কল্যাণের পথে হাত ধরে নিয়ে যান। বিশ্বাস কর—তাঁতে আত্মনিবেদন করলে তুমি বাদশাহর বাদশাহ যিনি তাঁর পরম করুণা প্রাপ্ত হবে। যে অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল আমরা—সেই অনন্ত অপরিমাণ শক্তি যে উৎস হতে নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে—সেইখানে খোঁজ পরম ঐশ্বর্যের সন্ধান। গোলামখানায়—কতলগাহে সে ঐশ্বর্যের এক কণাও নাই।

লিডারের কাছে শক্তি ভিক্ষা করো না—আল্লাহ এতে নারাজ হন—শক্তি ভিক্ষা করো একমাত্র আল্লাহর কাছে। জয়ধ্বনি মহিমা কীর্তন করো একমাত্র আল্লাহর।

বন্ধু ! আমি জানি, তোমাদের অনেকে আমারই পানে চেয়ে আছ সেই অগ্রপথিকের নিশান তুলে জয়যাত্রার পথে চলতে। আল্লাহ জানেন, আমি আত্মপ্রতারণা করি নাই, আমি তাঁর বিষাণ বাজানোর আদেশ পেয়েছি, নিশান ধরার হুকুম পাইনি। তবে পঙ্গু যাঁর কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করে—যাঁর করুণায় জন্মঅন্ধের চক্ষে সাত আসমানের দ্বার খুলে যায়—তাঁর কৃপা যদি পাই, তাঁর আদেশ যদি আসে—আমি আপনাদের বিনা আহ্বানে এসে ডাকব ...

ভেঙেছে দুয়ার জেগেছে জোয়ার রেঙেছে পূর্বাচল,
খুলে গেছে দেখ দুর্গতি-ভরা দুর্গের অর্গল।
মৃত্যুর মাঝে অমৃত যিনি—এনেছে তাঁহার বাণী,
পেয়েছি তাঁহার পরমাশ্রয়, আর ভয় নাহি মানি।
সকল ভয়ের মাঝে রাজে যাঁর পরম অভয় কোল,
সেই কোলে যেতে আয় রে, কে দিবি মরণ-দোলাতে দোল !

দৈনিক 'কৃষাণ'
৮ই পৌষ, ১৩৪৭

মধুরম্

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্যসভায় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি মনোনীত করে আপনারা যে গৌরব দান করেছেন, তজ্জন্য বনগ্রামবাসী সকলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আজ

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আপনাদের দেওয়া এই অমূল্য শিরোপা আমি অকুণ্ঠিত শিরে ধারণ করতে পারিনি। আমার কাছে গৌরবের চেয়ে লজ্জার অনুভূতিই হয়ে উঠেছে অধিকতর।

সাহিত্যের কোনো কুঞ্জে আজ আর আমার কোন গতিবিধি নেই, আজ আমি যেন নীড়ভ্রষ্ট। রসকুঞ্জের পুষ্পিত পল্লবিত তরুলতার স্নেহচ্ছায়া-বিচ্যুত আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্মরণাতীত। সঙ্গীতমুখর মহফিল থেকে কোন মহামৌনী যেন আমারও অজ্ঞাতসারে চুরি করে নিয়ে যেতেন কোন এক না জানা শূন্যে ; যেখানে বাণী নেই, সুর নেই—শুধু অনুভূতি, শুধু ইঙ্গিত।

বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বারে বারে কেড়ে এনেছে সেই মৌনীর কোল থেকে, নিগড়ের পর নিগড় দিয়ে আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে। আমিও বারে বারে ছিন্ন করেছি সেই বন্ধন, বারে বারে পালিয়ে যেতে চেয়েছি সেই পরম একাকীর শান্ত সমাধি-তলে। এই দোটানার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আমি আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আমার প্রিয় সখা আত্মীয়াধিক বন্ধুদের দেওয়া নির্মাল্য নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করেছি। যারা দেখছিল আমার হাতে আশার আলো, তাদের সে দেখা ব্যর্থ করেছি আমার হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে—এই আলোকে অনুসরণ করেই তারা আমার সমাধির শান্তিতে বাধা সৃজন করত।

অই সমাধির মাঝে শুনতাম অনন্ত প্রকাশ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে—'ফিরে আয় ফিরে আয়'। কেন যেন মনে হত এই নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন আমার সাথিহীন একাকিত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহকুলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম-সুন্দরের—সেইখানে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, অমৃত, রস ও বিরহের যে লীলা দেখলাম, তা প্রকাশের শক্তি যদি পরম-সুন্দর আমায় দেন তাহলে পৃথিবী এই রস-ঘন প্রিয়-ঘন পরমানন্দলোকের রূপে রূপায়িত ছন্দে গানে সুরে রসায়িত হয়ে উঠবে। আমার বাঁশিতে যে সুর বাজত—যে বাঁশি আমি অভিমানে দিয়েছিলাম ফেলে, সেই হারানো বেণু আবার ফিরে পেলাম সেই চির-সুন্দর লোকের অশ্রুমতী নদীর তীরে।

যে অপরূপ শ্রীমাখা মুখখানি আমার কল্পনায় উঠত ভেসে, যে শ্রীমুখের আভাস ফুটে উঠত আমার গানে কবিতায় ছন্দে সুরে যার বিরহ, যার আকর্ষণ আমায় ধূলির পথ থেকে চন্দনিত নন্দনের পথে নিত্য আকর্ষণ করেছে যার অশ্রু-ছলছল রস—ঢলঢল বিরহ সুন্দর মুখখানি না দেখে পরম শূন্যের লয়েও শান্তি পাইনি সেই পরমা শ্রীমতি প্রেমময়ীকে সেইখানে দেখলাম। যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য হব—পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।

আমায় সাহিত্য-সম্মেলনে ডেকেছেন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোনার জন্য-mystic তত্ত্ব শোনার জন্য নয়। কিন্তু আপনাদের দেরি হয়ে গেছে—দুদিন আগে যেমন

করে যে ভাষায় বলতে পারতাম সে-ভাষা আজ আমি ভুলে গেছি। এই 'মিস্টিসিজম' বা মিস্ট্রির মাঝে যে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম মধুরম মধুরম'। এই মধুরমকে প্রকাশের ভাব-ভঙ্গি-ভাষা এখন আমার চির-মধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আজ দেখি, অনন্ত আকাশ বেয়ে যেন আমার সেই পরম-সুন্দরের পরমাশ্রু ঝরে পড়ছে—অনন্ত ভুবন ধরতে পারছেন না সে পরমা শ্রীকে—অনন্ত নীহারিকালোক থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছুটে আসছে উন্মাদ বেগে সেই পরমা শ্রীপ্রসাদ লোভে।

আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা শ্রীই আমার অস্তিত্ব—আমার শক্তি। নিরাকার নির্গুণ অবাঙমানসগোচর ব্রহ্মা যেমন তাঁর শক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করেন সৃষ্টির রূপে, গুণে প্রতিভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেম-শক্তির আশ্রয় পেয়ে আমিও তেমনি আবার আমার সৃষ্টিতে যেন ফিরে আসছি। এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংহারের পথে চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম—আমার eternal existence-কে পেলাম।

এ-কথা বললাম এই জন্য যে, আমার সাহিত্যসাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে, existence-কে খুঁজে ফিরেছি। যখন আমি বালক, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কান্না আসত—বুকের মধ্যে বায়ু যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম--'ঐ আকাশটা যেন ঝুড়ি, আমি যেন পাখির বাচ্চা, আমি অই ঝুড়ি চাপা থাকব না—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তাই ইউনিভার্সিটির দ্বার থেকে ফিরে ইউনিভার্সের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়ালাম। জীবনে কোনো দিন কোনো বন্ধনকে স্বীকার করতে পারলাম না। কোনো স্নেহ-ভালোবাসা আমায় বুকে টেনে রাখতে পারল না। এই পরম তৃষ্ণা যে কোনো পরম-সুন্দরের তা বুঝাতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলেই অবুঝের মত-পথ থেকে পথান্তরে ঘুরেছি। অনন্ত শূন্যে অনন্ত শ্বেত শতদলের মাঝে একখানি অপরূপ সুন্দর মুখ দেখেছি—সেই মুখ যেন নিত্য আমাকে অসুন্দরের পথ থেকে ফিরিয়েছে—কেবল ঊর্ধ্বের পানে আকর্ষণ করেছে। আজ সেই মুখখানি খুঁজে পেয়েছি—আজ তাঁর দেখা পেয়ে প্রথম উপলব্ধি করেছি 'রসো বৈ সরঃ' অর্থ, অনন্ত আকাশ বেয়ে মধুক্ষরণ কি করে হয়, সে মধু পান করেছি। আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বে প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।

একে খোঁজার পথেই যে কদিন কেঁদেছি, যে গান গেয়েছি, যে সুর সৃষ্টি করেছি, যে কবিতা লিখেছি, তা যদি কবিতা হয়ে থাকে, তবে তা সেই সুন্দর মুখখানির কৃপা—সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যদি তা কবিতা না হয়ে থাকে, আমার কোনো দুঃখ নেই। কেননা আমি আমার প্রকাশের ব্যাকুলতার উন্মাদনায় কি প্রলাপ বকেছি, তা যদি গোলাপ বকুল হয়ে রূপ পরিগ্রহ না করে থাকে সে আমার অক্ষমতা, অপরাধ নয়। আমি কবি

যশঃপ্রার্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে তাঁর দেখা পেয়েছি—তাঁর পরম-সুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি—এই কথাই যেন আমার ফিরে-পাওয়া বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি। আমার জীবনের চির-একাদশীর উপবাস-তিথি শেষ হয়ে এল, পূর্ণচাঁদের উদয়ে আমার জীবন অমৃতে মধুরে আনন্দে প্রেমে রসে পূর্ণ হয়ে উঠল—শুধু এই কথাই যদি আমার বিরহ-যমুনা তীরে বসে, আমার বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি, আমি ধন্য হব। তাতে পৃথিবীর মঙ্গল হবে, নিত্য মঙ্গলময় জানেন—সে ভার আমার উপর তিনি দেননি।

নদী যেমন নিত্য সাগরকে পেয়েও নিত্য কাঁদে—নিত্য মিলন নিত্য বিরহের রস উপলব্ধি করে আমি তেমনি করে তাতে যুক্ত থেকেও তাঁর জন্য কাঁদব—সেই ক্রন্দন যদি সাহিত্য না হয়, কবিতা না হয়, আপনাদের ক্ষমা-সুন্দর মন যেন এই প্রেম-ভিক্ষুককে ক্ষমা করে। সে কান্না শুধু আমাদের দু'জনের পরম রুদ্রকে সৃষ্টিতে ধরে রাখার জন্য পরম শক্তির।

যদি আর বাঁশি না বাজে

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আপনারা এই ভিখারিকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরমগতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী—পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায় মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার Divine নয় Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্মজগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমাসুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার নাকি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্যরস-পিপাসু মনকে—শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মতো আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণাদানের দক্ষিণ হস্তকে ঊর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন ; তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকিত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন-মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম ঘন ঘন বিদ্যুৎছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘন-ঘটায়, মুক্তজটায় দিক-দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের তৃষা মিটিয়েছিলাম ; আমার রুদ্র-সুন্দর নৃত্য দেখে যাঁরা দেখতে পাননি যে, এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল, শতদল, বৃন্ত ; বনলতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কন্টকিত ; এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুর-ধ্বনি, সুরের সুরধুনী গানের প্রবাহ,—সেই মেঘ একদিন দেখতে পেল সে তুষারীভূত হয়ে শ্বেত শুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি—তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতা রূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার—সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন এক পরম শূন্যে। তাই বন্ধুদের বলছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়—এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না। বলছেন আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে, টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে—অবুঝ হাত তবু টানাহেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্যসভায় রসের জলসায় আপনারা আমার অসহায় জীবনী শুনতে আসেননি। আমি আমার এ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টনসিল বা বেঁধেছে কুলের আঁটি, সে সঙ্গীতশিল্পীকে জোর করে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান তার চেয়ে অনেক বেশি করে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠের অসহায় অবস্থা ; সুরের চেয়ে আঁটি আর টনসিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে। আপনারা ইচ্ছা করে শাস্তি গ্রহণ করছেন, আমি নিরপরাধ। যে সিংহ আছে খাঁচায় আটকে—তার ন্যাজ ধরে টেনে ন্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পারেন, কিন্তু তাকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন, তিনি দয়া করে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোনো উপায় নেই।

আনন্দ-রস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমায় রস সরবরাহ করতেন—আগেই বলেছি, তিনি মহাশ্বেতা-রূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমার বাঁশি আর বাজে না, রসস্রোত হয়ে

যায় তুষারভূত, আমার আনন্দময় তনু হয়ে যায় পাষাণ-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দ। আজ আপনাদের কাছে বলে যাব—আবার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর-সমাধির বিহ্বলতা কাটেনি। আমার সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন, তা'হলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের যে সাম্যের যে আনন্দের গান গেয়ে যাব—সে গান পৃথিবী বহু কাল শোনেনি। আমার চির-জনমের প্রিয়া এই প্রেমময়ীর প্রেম যদি না পাই—তাহলে বুঝব আমার এ বারের মত খেলা ফুরালো। আমার বাঁশি বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে-যাওয়া বাঁশি ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি তিনি যদি আমার সর্বঅস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত-রস ধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে—তাহলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব ; এই তৃষিত পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ প্রেম সে আবার ফিরে পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, আধার মাত্র ; সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সেই প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নিরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি—তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের এই প্রেমের ভিক্ষা-পাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি ; যদি আমি না পাই আপনাদের কেউ পান—সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি—তা'হলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব—সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করব—সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তা'হলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্ধ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহকূলে আবার যেন জ্ঞানে, শক্তিতে আনন্দে নিত্য-পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশি না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের

ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু—আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দররূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকিত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমানের বলে দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলি উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাত বর্ষাসজল রাতের মতো অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন—মনে করবেন—পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোনো বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায়নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই, এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মি. মুজাফফর আহমদ, মি. আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাট বা 'আড়ষ্ট-কাক' ছিলাম না। বোমারু বারীন-দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আড্ডা বটে? আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করিনি ; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম ; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কি না, আমার জানা নেই।

সাহিত্য সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, একে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে—বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্য পুষ্ট করে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য সমিতি বিত্তশালী হলে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ।

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নবজাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব, ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার মত শক্তি আমার একেবারেই নাই। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন। এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহার বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে সেইসব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। এই আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশব-চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার হৃদয় ময়মনসিংহ-জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহপ্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব ; কিন্তু তাহা হইল না, দূরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যত। মাটির মায়ায় আপনাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া—দিন নাই রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই তো এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মতো লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির নেন কিংবা তাকে শির দেন—এত ভালোবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্যশ্যামল মাঠ,—আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহধারার মতোই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদর সোহাগে মাঠ-ঘাট ফুলে-ফলে-ফসলে শ্যাম সবুজ হইয়া ওঠে—আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া উঠে,—এই মাঠকে

জিজ্ঞাসা কর, মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে, এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক-বধূর।

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাদের অস্থি মজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্যমুদ্রা তৈরি হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা মাণিক ফলাইতেছে, তাহারা আজ অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না ; পরণে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ ! হায় রে লোভী দানবপ্রকৃতির মানব। আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরানিতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই,—এইবার তাহার প্রতিকারের ফেরেশতা দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটির তাঁহার গৃহ। তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা। তোমরাই তাঁহার পিতামাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নবজাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, ঐ বুঝি নব দিনমণির উদয় হইল। ইতি।

লাঙল
প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা
৭ই মাঘ, ১৩৩২

রসলোকের তৃষ্ণা

এখানে অনেক কবি এসেছেন যাঁদের আছে রসলোকের তৃষ্ণা। যিনি চিত্রকর, যিনি কবি তিনি এই রসে রসায়িত। এই রসলোকে কোন জাতিভেদ নাই—অভেদ, পরমলোক। কোরান শরিফে বলে : রওশন। এই রসালোকে একমাত্র যেতে পারেন শিল্পী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ—যাঁরা সুকুমার শিল্পের চর্চা করেন, যাঁদের সৃষ্টি সবার ঘরে ঘরে।

এই রসলোকে যাবার কেন এ তৃষ্ণা হল আমার? আমি যখন কবিতা লিখতাম, মাঝে মাঝে আমার লেখা দেখে মুগ্ধ হতাম, মনে হতো কেন মুগ্ধ আমি আমারই সৃষ্টি দেখে ! মনে হতো বুঝি বা brain-এর কোন function-এর জন্য। যখন কোনো চিন্তাধারা আসত মনের মধ্যে, চেষ্টা করতাম তার মুখ দেখতে, পারতাম না। মাথা ধরতো।

আপনারা হয়তো অনেক শিল্পীর কথা শুনেছেন, তাঁদের কেউবা উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন—হয়তো তাঁরা জ্ঞানের উচ্চ অবস্থার উর্ধে চলে গিয়েছিলেন। এরূপ চিন্তাধারা

প্রথম আমার মনে এলো যখন কোরান শরিফে পড়ছিলাম সুরাহ নূর—তার অন্তর্নিহিত বাণী থেকে ; আমার মনের আবরণ যেন খুলে গেল, আল্লাহ্-র মহিমায়।

যে সমুদ্র দেখেনি, সে কেমন করে বুঝবে তার বিশালতা, না দেখা পর্যন্ত ? রসবোধে যার গভীরতম অনুভূতি নাই, সে কীকরে রসলোকের কথা বুঝবে ? বুঝতে চেষ্টা করুন, একটি কুলুঙ্গির মধ্যে একটি বাতি জ্বলছে, আর সেই বাতিকে আবৃত করে রেখেছে একটি সূর্যময় জ্যোতি, আর জ্যোতির্ময় হয়েছে 'রওশন' থেকে।

তেমনি দেহ-রূপ কুলুঙ্গিতে প্রাণ-রূপ বাতি—তারপর রুহ, এরপর রুহুল-আজম। কিন্তু এখানে সবাই যেতে পারে না, তাঁর কৃপা ছাড়া, তাঁর রহ্‌মা ছাড়া।

কেউ বা এ রসলোকের সান্নিধ্য পান—কি করে ? আশ্চর্য হতে হয় ; এটাই হচ্ছে তাঁর রহ্‌মা, তাঁর কৃপা !

এই রসলোকে গেলে তখন তাঁরা হন তাঁর সখা—খলিলুল্লাহ্। তাঁর কাছে কোনো ভয় ডর থাকে না ; বলেন : আমার রসে রসায়িত হয়ে যাও। তাই রসায়িত হন তাঁরাই যাঁরা প্রেম ও কল্যাণ আনেন জগতে—যাঁরা পয়গম্বর। জাতিভেদ, বর্ণভেদ থাকে না তাঁদের ভেতর ; কবি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ তেমনি ভালোবাসে সবাইকে প্রেম দিয়ে। তাঁদের রসবোধ সর্বভয়মুক্ত, সর্ব অভাবমুক্ত ; কোরানে সুরা ইয়াসিন পড়ে বহু আনন্দ তাঁরা উপভোগ করেন।

সত্যিই এ রসধারা আসে উর্ধলোক থেকে। প্রশ্ন হয়তো হতে পারে, এঁরা escapist—escape করে যাচ্ছেন। আমি বলি, তাঁরা escapist আছে, একটু আছে, একটু ঊর্ধে উঠে তা বারিধারা বর্ষণ করে, এই বারিধারা বর্ষিত হয়ে প্রবাহিত হয় নদ-নদী-বিলে, আনে শুষ্ক মাটিতে প্রাণের স্পন্দন, তাই এই বৃষ্টিধারা পাবার জন্য বিশ্ব থাকে তৃষিত।

এই রসলোকের সৃষ্টি অনেক ঊর্ধে ; তাঁর সান্নিধ্য যে লাভ করে সে আর ফিরে আসে না। এ আত্মসমর্পণ সব সময় হয় না।

একটি কবিতা নিয়ে চুলচেরা বিচার করলে—লেবু কচলে তেতো করানোই হয় ; চুপে চুপে রসপান করে যেতে থাকেন। এই যে পান-করা শক্তি, এই যে রসলোকের তৃষ্ণা এ আসে না খ্যাতিতে। অনেক কোটিপতি আছেন, বাজারে তাঁদের অনেক সম্মান কিন্তু আনন্দ প্রেম অমৃত রসের অভাবে তাঁরা আনন্দ পান না। কিন্তু একজন কবি দরিদ্রতায় থাকে বটে, তবে সে যেন রসে ডগমগ—এই রসেই আসে প্রাণ। একজন সঙ্গীতজ্ঞকে লোকে কেন ভালোবাসে ? কারণ, সে রস পরিবেশন করে।

প্রেম রসায়িত জ্ঞানকে আমি স্বীকার করি ; আনন্দ রসায়িত জ্ঞানকে স্বীকার করি। নদীর মাঝ থেকে একটি নুড়ি তুলে দেখুন তার মাঝে কোন রস নাই—একেই বলি রসলোকে স্থিতি—সেখানে যাওয়া যায়, যার তৃষ্ণা আছে সেই যেতে পারে ; এখানেই তৃষ্ণার শেষ। এই তো রসায়িত জ্ঞান, রসায়িত প্রেম—একাধারে পরম অভেদম।

এই রসলোকের জন্য ছোটবেলা থেকেই আমার তৃষ্ণা ছিলো। এই রসলোকে আর জ্যোতি নাই, তেজ নাই—কেবল শুধু রস। যখন আমি রস পাবো তখন আমার তৃষ্ণার

শেষ। যেমন কানামাছি খেলা—চোখ বেঁধে দিই, চাঁটি মারি, খেলছি কিন্তু ভয় আছে যদি সে ধরে ফেলে তাহলে আবার কানামাছি হতে হবে। এই যে চোখের বাঁধন এটাকে খুলতে হবে।

আধুনিক কবিদের বলেছি, তোমাদের সুন্দরের তৃষ্ণা নাই, পাঁক ঘাঁটছ মোষের মতন। পাঁক-কে ঘৃণা করি না আমি, কিন্তু তোমরা পাঁক ঘাঁটো, পাঁক থেকে ঊর্ধে উঠতে চাও না ; জাগ্রত চেতনা আনতে হবে তোমাদের, তার অনুভূতি-বেদনা আসবে পরম আনন্দলোক থেকে। এই আনন্দলোকে স্থিত হতে চেষ্টা করো, দেখবে কাদার মধ্যে মুক্তোর সন্ধান পাবে।

এই intuition যখন আমার সমস্ত দেহকে দ্রবীভূত করে, তখন আমার কলম রসায়িত, কাগজ রসায়িত, আমার কালি রসায়িত।

দেখেছি, তোমরা কাদার বিবরণ লিখছ, শুধু মোষের মতন কাদাকে দেখে লিখেছ।

বন্ধু-প্রীতি একটা অদ্ভুত জিনিস ; বন্ধু বিরহ সইতে পারি না। এই প্রেম দিয়ে পাওয়া যায়—এটা আসে সেই অনন্ত রসলোক থেকে। সেখানে যাবার চেষ্টা করুন, মানুষকে ভালোবাসবার শক্তি সেখান থেকে আসবে।

একজন রসবিদ লোকের সান্নিধ্য লোকে চায়—একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখে মন রসায়িত হয়, সুন্দর ফুল থেকে মন রসায়িত হয়—তাই রসের তৃষ্ণাই অমৃত। সেজন্য পাথর পূজা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ পাথরে রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু একজন ভাস্করের ভাস্ক দেখুন—দেখবেন যে কত রসের সন্ধান রয়েছে তার মাঝে।

রসময় ব্যক্তি অত্যন্ত চঞ্চল ; জ্ঞান চুপ করে surrender করতে পারে না। রসলোক থেকে জ্ঞান তুলে দেয় ঊর্দ্ধে—উচিত চুপ করে রসপান করা। যত বিচার করতে যাবে, ততো বঞ্চিত হবে রস থেকে। বিচার করলেই অরূপের রূপ, সুন্দরের আবেশ আমার চোখ থেকে পালিয়ে যায়।

Culture-কে রসায়িত করতে চেষ্টা করুন, নতুবা culture-এ কালচে পড়ে যাবে। মন-কে সমস্ত দিক থেকে রসায়িত করতে চেষ্টা করলেই দেখবেন নিরানন্দ জগৎ আর নাই—সর্বত্র শুধু আনন্দ।

কবিদের দেখুন, তাদের প্রকাশের একটা ব্যগ্রতা আছে, সেটাই কত সুন্দর, স্বচ্ছ। মানুষ সুন্দর হয় আবরণ পরে ; সৃষ্টিকর্তা চিরসুন্দর সৃষ্টির আবরণ পরে। এজন্য, আধুনিক কবিতায় অতি-প্রকাশ একটা রুগ্ন নগ্নতা মাত্র, চোখে ভালো ঠেকে না।

এখন নগ্নতারও একটা রস আছে। আমাদের বৈচিত্র্যপিয়াসী মন নগ্নতাকে আবরণ দিয়ে সাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করে—এই যে আবরণের মধ্যে অনন্ত নিরাবরণ দেখতে পাই, এই হচ্ছে পরম সুন্দর।

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দিব না ভুলিতে,
আমি বাতাস হইয়া জড়াইবো কেশে
বেণী যাবে যবে খুলিতে ;

তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ, কাঁদিবে পবন,
রোদন হইয়া আসিবো তখন
তোমার বক্ষে দুলিতে॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা

১৯৪১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর
হাওড়ায় রবীন্দ্র স্মরণসভায় নজরুলের ভাষণ।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১৫ দিন পরে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

"আমি যেদিন জন্মেছিলাম সেদিন নাকি ভীষণ ঝড়ে আমাদের ঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই আমি শক্তির উপাসক। রাজনৈতিক মঞ্চে প্রথম জীবনে যখন বক্তৃতা করে বেড়াতাম তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ আমার শক্তি সম্বন্ধে আমায় সচেতন করিয়ে দিয়ে জানতে চান—আমি কেন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছি? গুরুদেব জানান, "তোমার মধ্যে যে ভাব আছে তা সার্থক হয়ে ফুটবে। দেখো মাতালের নেশার মতো জয়মাল্যের নেশা করো না, ক্ষতি হবে। মাতাল যেমন একদিন মদ না খেলে বোধ করে তার গা হাত ম্যাজ ম্যাজ করছে—সেই রকম যেদিন জয়মাল্য পাবে না সেদিন তুমি মনমরা হবে। যে পরম করুণাময় চোখ দিয়েছেন প্রাণভরে দেখ তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য; নাক দিয়েছেন ফুলের গন্ধ গ্রহণ কর।"

লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি ধর্মরসের প্রাবল্য! শিল্পীমনের নিখুঁত পরিচয় পেয়েছি তাঁর মধ্যে, রসলোকে যাঁর বাস তাঁর মধ্যে ভেদের স্থান নেই। শিল্পী যে দেশেরই অধিবাসী হোন না কেন শিল্পী শিল্পীই। তাঁর শিল্প জগতের আপামর জনসাধারণকে আনন্দ দান করবে। সদানন্দময় অন্তঃকরণে যে পূর্ণ সচ্চিদানন্দের বিকাশ তাতেই রসলোকের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরভিমান, নিরহঙ্কার। তাঁকে দেখেছি উপনিষদের গুরুরূপে, প্রাচীনকালের পবিত্র আর্য ঋষিরূপে। তাঁর জীবন ছিল জীবন্ত উপনিষদ। তাই তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসীর মতো উপনিষদ পাঠ করেননি। প্রকৃত উপনিষদ তাঁর মধ্যেই সুপ্ত ছিল। তিনি অবতার অন্তত আমি তাকে সত্যধামের মানুষ বলতে রাজি নই। অনেকে হাস্যকরভাবে তাঁর মৃত্যুতে অশৌচ পালনের ব্যবস্থা করেছেন কারণ তাঁরাই নাকি রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার উত্তরাধিকারী। আমার শক্তির প্রাণই নদীর মতো শুধু সামনেই চলে পিছন ফিরে তাকায় না। এই চলবার পথে যদি বিশেষ ভাবাবেগে দুই একটা কবিতা লিখে থাকি, তাতে যাঁরা আমায় কবি বলেন, আমি তাঁদের ধন্যবাদ দেই, নিন্দা করিনে। কিন্তু এতে আমার প্রাণের ঠাকুর সাড়া দেন না। শ্রী অরবিন্দ এবং হিমালয়ের গহ্বরে বসে যাঁরা যুগ যুগ ধরে ধ্যান করেছেন, এই বিচিত্র রসময়

জগতে তাঁদের দান কতটুকু। ভগবানের দেওয়া এই মহামায়ার মায়ায় ঘেরা ফলফুল তরুলতা শোভিত চাঁদহাস্য বজ্রনীল স্তব্ধতায় পূর্ণ এই বিরাট ধরণীকে অস্বীকার করা উচিত নয়। কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে escapist অর্থাৎ পলাতকের মনোবৃত্তি নিলে চলবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—চাই বড় হবার জন্য অগাধ তৃষ্ণা, চাই শক্তি লাভের তৃষ্ণা। আজো আমার মধ্যে সে তৃষ্ণা তেমনি দুর্বার হয়ে রয়েছে কোথাও কোনো বাধাকে স্বীকার করেনি। আজ আমাদের জাতির মধ্যে সেই চিত্ত কই, যাতে আমরা বড় হতে পারি। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন। সেই মহাভারতের মধ্যে জগৎকে এনে ফেলেছিলেন প্রায় ঘরের কাছে। কিন্তু স্রোতহীন জলাশয়ে, যেমন রোগের জীবাণু স্পর্শে প্রাণ ধ্বংস হতে পারে সেই রকম বৃহৎ সীমাবদ্ধ গতিহীন জীবনের পঙ্কিলতা কি ঘৃণ্য ঐ বদ্ধ জলের মতোই নাড়াতে গেলে পাঁক উঠবে। যদি সত্যিকারের সুস্থ সবল জাতি গঠন করতে হয় তবে চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জল যা মানুষকে প্রতিনিয়তই চঞ্চল করে। সে জীবনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন উচ্চ চিন্তার, এক কথায় বৃহতের তৃষ্ণা চাই। রবীন্দ্রনাথের যুক্তির বাণীকে শ্রদ্ধা করা হবে যদি তাকে বুঝতে পারি। জন্মাবধি বিরাট এক অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে মাঝে মনে হয় মাথার উপর কেন আকাশ থাকবে? চেষ্টা করলে অসংখ্য জলকণা সমন্বয়ে যে বিরাট সমুদ্র হয় সেই বিরাট সমুদ্র হয়ে আমরাও কেন মুক্তা তৈরি করি না। যিনি দেখেছিলেন X-ray-র স্বপ্ন radium-এর স্বপ্ন অগাধ সাধনার বলে অসাধ্য সাধন কি তাঁরা করেননি? তাই সাধনা-শক্তি তখনই সাহায্য করবে। শক্তি ও সাধনার সমন্বয়ে মানুষ চলেছে কল্পনাতীত সাফল্যের গৌরবময় পথে। আদর্শকে সর্বদা খুব বড় বৃত্ত করতে হবে, তার মধ্যে বাস্তব জগতের অনেক সঙ্কীর্ণ বৃত্তে স্থান হবে। তার মধ্যে বাস্তব জগতের অনেক সঙ্কীর্ণ বৃত্তে স্থান হবে। আদর্শ যেখানে নিচু সে স্থানে বড় হবার কোনো আশাই নেই। জীবনে পাশ করব, কেরানী হবো যার আশা সে জীবনে কতটুকু পূর্ণতার চিন্তা করতে পারে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমাদের উচ্চাশা হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করুক ভালো, কিন্তু একটা মুরগির মতো জবাই হবার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে কতটুকু সার্থকতা আছে। নদী বয়ে যায় তার মধ্যে যে নুড়ি থাকে তা ভাঙলেও কিছু রস মিলবে না, সেই রকম এই বিচিত্র, সুন্দর ধরণীর মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করে যিনি পরম পিতার দর্শন পেতে চান তিনি মোক্ষের কামনাই করতে পারেন, কিন্তু পূর্ণতা লাভ তার হবে না।

আমাদের জীবনের অবকাশকে আমরা যখন সঠিক বলে মনে করি তখন কবি জানান জীবনটা ঠিক যেন চিনামাটির পেয়ালা তার ফাঁকটাই আসল রসে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক কবি জীবনের অবকাশে মৌন প্রকৃতির কমনীর কান্তি দর্শন করে যে মধু সঞ্চিত হয়, কবে গোপনে গোপনে তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার সেই মধুতেই পূর্ণ করেন। আর এক কথা ভগবান সম্বন্ধে বলতে চাই যে আমার ভগবান সকলের। মুহম্মদ শুষ্ক রুটি খাবার সময় জানতে পারলেন যে একজন অন্নের অভাবে মারা যাচ্ছে, তিনি তখনই তাঁর নিজের গ্রাস দিয়ে তাকে বাঁচালেন। এই যে সমাজ এই যে সংসার তরুলতা কীটপতঙ্গ নিয়ে যার সৃষ্টি এটাই তো আমার ভগবান।

এই গরিব দেশে নেতা হবার উপদেশ কাউকে দেবেন না, বরং বলেন চল নচিকেতার মতো একবার যমকে দেখে আসি। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সুন্দর জগৎ আমাদের অস্তিত্বকে সপ্নময়ই করেছে এরা কেন আমাদের বিনাশের কারণ হবে। কোরানে আছে এই পঞ্চভূতই আমাদের ধর্মরক্ষার ...। তাদের যিনি অধিপতি তিনিই তো ধর্মরাজ। সত্যই মৃত্যুর ধর্মরাজ নাম কি সুন্দর। এ বিষয়ে কোরান ও গীতায় কতো যে সমন্বয় দেখেছি ! যাকে শান্তি দেওয়া হয় সে জিজ্ঞাসা করে কেন আমি শান্তি পাই। প্রশ্ন হয়—তোমার বাড়ির পাশের নিরন্নের খবর কি রাখ। তার কি সেবা করেছিলে? সমগ্র সম্মান যেন আমার দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের মতো কেমন করে স্থানের ক্ষত যেমন সারা দেহকে গ্লানিময় করে সেই রকম আমার সমাজে একজনও অশান্তিতে থাকবে না। কথা এই যে যাঁর সম্বন্ধে কিছু জানি না তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করে লাভ কি? কিন্তু এতে তো সত্য দুই আর দুই এ চার জানা সত্ত্বেও আমরা ছেলেবেলায় ratio proportion–এর অঙ্কে ধরেছি k এরপর k–র value বের হবার পর k–কে সরিয়েছি। এই k আমাদের জীবনেরও সমস্যা, মেটাতে ধরতে হবে, 'কৃষ্ণ', 'কালী' কোরান এর আর কিছু হচ্ছে ভগবান। আকর্ষণ বিকর্ষণময় জগতে কৃষ্ণ করেন আকর্ষণ। বলবান করেন বিকর্ষণ।

প্রথম যৌবনে চণ্ডী পূজা করেছি, শক্তির উপাসনা করেছি কি? কই বর্তমান যুগের তরুণ দলের মধ্যে সে ধর্মসত্তা কই? চন্ডীর স্থান গ্রহণ করেছেন অভিনেত্রীরা। আমাদের ছেলেরা আজ তাঁদেরই উপাসক। শক্তি চাই, তবেই রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যাবে। শক্তির প্রার্থনা করুন জীবনে হয়তো সাময়িক স্খলন আসতে পারে তাতে কি? চাষা পাঁক ঘেঁটে ফসল ফলায়। ডুবুরি পাঁক ঘেঁটে মুক্তা তোলে। জীবনের প্রথম প্রভাত হতে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে কোথা হতে তা জানি না, কোথা যাব তাও জানি না তবে এটুকু জানি অনাদি অনন্ত আত্মজগতে রয়েছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে আমার জন্য কিন্তু যাত্রা আমার পূর্ণতার দিকেই। ছেলেদের মধ্যে যেদিন আমি সত্যকার শক্তির পরিচয় পাব সেদিন আমিও হব তাদের সঙ্গের একজন পদাতিক সৈনিক। হে ভগবান, যেন সৈন্যাধ্যক্ষ হবার বাসনা না জাগে। শক্তির পূজারী রবীন্দ্রনাথকে এই দিক দিয়ে জানতে হবে তবেই তাঁকে ঠিক ঠিকভাবে শ্রদ্ধা করা যাবে।

সঙ্গীত-গবেষণা

সংস্কৃত ছন্দের গান

এক একটি সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য নির্মিত হয় লঘু ও গুরু অক্ষরের পরম্পরা বিন্যাসে। এই বিন্যাস অতি সংক্ষেপে বাঝানো হয় তিন অক্ষরের এক একটি সমষ্টি 'গণ' (পর্ব) দিয়ে। ধ্বনিবৈচিত্র অনুসারে গণগুলির এক অক্ষরের নাম আছে, যথা :

S S S ..	তিনটি অক্ষর গুরু	... ম গণ
I I I ..	তিনটি অক্ষর লঘু	... ন গণ
S I I ..	আদি অক্ষর গুরু পরের দুটি লঘু	... ভ গণ
I S S ..	আদি লঘু পরের দুটি গুরু	... য গণ
I S I ..	মধ্য গুরু পার্শ্ববর্তী লঘু	... জ গণ
S I S ..	মধ্য লঘু পার্শ্ববর্তী গুরু	... র গণ
I I S ..	অন্ত গুরু প্রথম দুটি লঘু	... স গণ
S S S ..	অন্ত লঘু প্রথম দুটি গুরু	... ত গণ

এছাড়া গ গণ–শুধু একটি গুরু অক্ষর এবং ল গণ—শুধু একটি লঘু অক্ষর।
এবার আমরা কবির সংস্কৃত ছন্দে বাঁধা গানগুলির ছন্দবৈশিষ্ট্য, মাত্রাসংখ্যার পর্ববিভাগ এবং কোন কান মাত্রায় গানে ঝোঁক পড়ছে সবই পরিষ্কার বুঝতে পারব ;

১। ছন্দের নাম প্রিয়া। অক্ষর সংখ্যা ৫। ছন্দের সংখ্যা স ল গ অর্থাৎ

I	I	S	I	S
না	না	তা–	না	–তা

এতে লঘুবর্ণ–৩, গুরুবর্ণ–২, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৩ × ১ + ২ × ২ = ৭
প্রস্বন তীব্র ৩ ও ৬ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে ;

		×			×	
১	২	৩	৪।	৫।	৬	৭
ম	হু	য়া	০।	বা।	নে	০

২। ছন্দের নাম মধুমতী। অক্ষর সংখ্যা ৭। ছন্দের লক্ষণ ন ন গ অর্থাৎ

I	I	I	I	I	I	S
না	না	না–	না	না	না–	তা

এতে লঘুবর্ণ–৬, গুরুবর্ণ,–১, মাত্রাবৃত্তে মাট মাত্রা সংখ্যা = ৬ × ১ + ১ × ২ = ৮।
প্রস্বন তীব্র শুধু ৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে ;

×

১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ব ন কু । সু ম ত নু ০

৩। ছন্দের নাম দীপকমালা। অক্ষর সংখ্যা ১০। ছন্দের লক্ষণ ত ম জ গ অর্থাৎ

S । । S S S । S । S

তা না না –তা তা তা –না তা না –তা

এতে লঘুবর্ণ=৪, গুরুবর্ণ = ৬ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৪×১ + ৬×২ = ১৬।
প্রস্বন তীব্র ১, ৫, ৭, ৯, ১২ ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে :

× × × × ×

১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ । ১৫ ১৬

দী ০ প ক । মা ০ লা ০ গাঁ ০ । থ গাঁ ০ থ । সই ০

৪। ছন্দের নাম স্বাগতা। অক্ষর সংখ্যা ১১। ছন্দের লক্ষণ র ন ভ গ গ অর্থাৎ

S । S । । । S । । S S

তা না তা– না না না– তা না না– তা– তা

এতে লঘুবর্ণ=৬, গুরুবর্ণ–৫; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা=৬ × ১ + ৫ × ২ = ১৬।
প্রস্বন তীব্র ১, ৪, ৯, ১৩ ও ১৫ মাত্রায়। মাত্রার পর্বে কবির গান ;

× × × × ×

১ ২ ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ । ১৫ ১৬

স্বা০ গ তা ০ । ক ন ক । চ ম্০ প ক । বর্ ০ । না ০

৫। ছন্দের নাম মন্দাকিনী। অক্ষর সংখ্যা ১২। ছন্দের লক্ষণ ন ন র র অর্থাৎ

। । । । । । S । S S । S

না না না –না না না তা না তা –তা না তা

এতে লঘুবর্ণ=৮, গুরুবর্ণ=৪; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা =৮ × ১ + ৪ × ২ = ১৬।
প্রস্বন তীব্র ৭, ১০, ১২ ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে :

× × × ×

১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

জ ল ছ । ল ছ ল । এ ০ স ম ন্ ০ । দা ০ কি নী ০

৬। ছন্দের নাম মণিমালা। অক্ষর সংখ্যা ১১। ছন্দের লক্ষণ ত য ত য

S S । । S S S S । । S S

তা তা না –না তা তা– তা তা না– না তা তা

এতে লঘুবর্ণ=৪, গুরুবর্ণ–৮ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা=৪ × ১ + ৮ × ২ = ২০।
প্রস্বন তীব্র ১, ৩, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৭ ও ১৯ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

× × × × × × × ×
১ ২ ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ । ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
মন্ ০ জু ০ ম । ধু ছন্ ০ দা ০ । নিত্ ০ তা ০ ত । ব সঙ্ ০ গী ০

৭। ছন্দের নাম রুচিরা। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ জ ভ স জ গ অর্থাৎ

। S । S । । । । S । S । S
না তা না– তা না না– না না তা– না তা না– তা

এতে লঘুবর্ণ = ৮, গুরুবর্ণ–৫ ; মাত্রাবৃত্তে মোট সংখ্যা = ৮ × ১ + ৫ × ২ = ১৮। প্রস্বন তীব্র ২, ৫, ১১, ১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে ;

× × × × ×
১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ .১৮
ভ্র মর ০ নূ । পর ০ প রি । হি তা কৃষ্ ০ । ণ কুন্ ০ ত । লা ০

৮। ছন্দের নাম মঞ্জুভাষিণী। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ স জ স জ গ অর্থাৎ

। । S । S । । । S । S । S
না না তা– না তা না– না না তা– না তা না– তা

এতে লঘুবর্ণ=৮, গুরুবর্ণ–৫ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা=৮ × ১ + ৫ × ২ = ১৮। প্রস্বন তীব্র ৩, ৬, ১১, ১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে ;

× × × × ×
১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ ১৮
আ জো ফাল্ ০ । গু নে ০ ব । কু ল কিঙ ০ । শু কে র ব । নে ০

৯। ছন্দের নাম মত্তময়ূর। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ ম ত য স গ অর্থাৎ

S S S S S । । S S । । S S
তা তা তা– তা তা না না– না তা –না না তা– তা

এতে লঘুবর্ণ=৪, গুরুবর্ণ–৯ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা =ম × ১ + ৯ × ২ = ২২। প্রস্বন তীব্র ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৯ ও ২১ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে;

× × × × × × ×
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ।
মত্ ০ তা ম য়ু র । ছন্ ০ দে ০ না । চে কৃষ্ ০ ণো ০

× ×
১৭ ১৮ ১৯ ২০ । ২১ ২২
প্রে মা নন্ ০ । দে ০

১০। ছন্দের নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। অক্ষর সংখ্যা ২৭। ছন্দের লক্ষণ প্রথমে দুটি ন গণ তৎপরে ৭টি র গণ অর্থাৎ

। । । । । S । । S S । S S । S S । S S
। S S । S S । S

এতে লঘুবর্ণ=১৩, গুরুবর্ণ-১৪; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ১৩×১+১৪×২= ৪১।
প্রস্বন তীব্র ৭, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ২০, ২২, ২৫, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৭ ও ৪০ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে ;

× × × ×
১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ।
তা র কা । নূ পু রে । নীল্ ০ ন তে ০ । ছন্ ০ দ শো ন্ ।

× × × × × ×
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ । ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ । ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ।
ছন্ ০ দি তা র । সৃব ০ টি ময় ০ । বৃষ্ ০ টি হয় ০ ।

× × × ×
৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ । ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১
নৃত্ ০ ত সেই ০ । নন্ ০ দি তা র

'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৮) ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে নজরুলের 'ছন্দিতা' শীর্ষক রচনায় 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'মত্তময়ূর', 'রুচিরা', 'দীপকমালা', 'মন্দাকিনী', 'মঞ্জুভাষিণী', 'মণিমালা', 'ছন্দবৃষ্টি প্রপাত', 'সৌরাষ্ট্র ভৈরব', ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দে রচিত গান রয়েছে। উল্লেখ্য, সেখানে স্বরলিপি নেই। এখানে স্বরলিপিযুক্ত হলো। এখানে সংস্কৃতছন্দের যে স্বরূপ এবং যতি ও মাত্রাবিন্যাস করা হয়েছে, তাতে হয়তো মুদ্রণ-বিভ্রাট ঘটে থাকতে পারে।

মেল-মেলন

আশাবরী ঠাট	:	স র জ্ঞ ম প দ ণ র্স
কাফী ঠাট	:	আশাবরীর অনুরূপ কেবল 'ধা' শুদ্ধ
খাম্বাজ ঠাট	:	কাফীর অনুরূপ কেবল 'গা' শুদ্ধ
বেলাওল ঠাট	:	খাম্বাজের অনুরূপ বেলল 'নি' শুদ্ধ
কল্যাণ ঠাট	:	বেলাওলের অনুরূপ কেবল 'মা' তীব্র
মারোয়াঁ ঠাট	:	কল্যাণের অনুরূপ কেবল 'রে' কোমল

আশাবরী ঠাট	১.	আশাবরী—তেতালা 'হে নট ভৈরবী আশাবরী'
কাফী ঠাট	২.	প্রদীপকী—তেতালা 'প্রদীপ কি জ্বলিল আবার'
খাম্বাজ ঠাট	৩.	রাগেশ্রী—তেতালা 'কার অনুরাগে শ্রীমুখ উজ্জ্বল'
বেলাওল ঠাট	৪.	শঙ্করা—তেতালা 'শঙ্কর রূপে শ্যামল আওল'
কল্যাণ ঠাট	৫.	শুদ্ধ কল্যাণ—একতাল 'নিত্য শুদ্ধ কল্যাণ রূপে আছো তুমি'
মারোয়াঁ ঠাট	৬.	বিভাস—সাদ্রা 'মরালী গমনশ্রী মদ অলস চরণে'

মন্তব্য : অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরগুলিতে রাগের স্বর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যথা : গান= গ ও নি। ধা= ধা ও রে। সুধা মাগি রস নিধি—সধ মগ রেস নিধা। এইসব গানে কথার ভিতর দিয়ে কৌশলে রাগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—প্রথম গানে 'উঠ –গো করুণ গান বিসরি' এই লাইনে আশাবরী রাগের আরোহণে গ ও নি বর্জনের কথা আছে। বর্জিত হলেও এরা করুণ অর্থাৎ কোমল স্বর। নট–ভৈরবী আশাবরীর কর্ণাটি নাম। দ্বিতীয় গানে প্রদীপ্‌কী = প্রদীপকী। প্রদীপকী রাগে আরোহণে

রে ও ধা নাই। সুতরাং, রাধারে ত্যজিয়া ইত্যাদি কথা সার্থক। তৃতীয় গানে— 'অনুরাগে শ্রীমুখ;' এই দু'টি সম্মিলিত শব্দের মধ্যে রাগেশ্রী রাগিণীর নামটি কৌশলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই রাগে পা দুর্বল, এইজন্য বলা হয়েছে 'চঞ্চল সে পা কেন নাহি চলে'। চতুর্থ গানের রাগ শঙ্করা—প্রথম শব্দেই ব্যক্ত। শঙ্করা অনেকের কাছে শুনতে বেহাগের মতো মনে হয়, এইজন্য বলা হয়েছে, 'গাহে বিহগ বুঝি'। বিহগ বেহাগের নামান্তর। পঞ্চম গানে রাগ নামও গানের গোড়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে। 'মান ত্যজিয়া' এবং 'পূর্ণরূপে' লাইন দুটিতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এই রাগ আরোহণে ঔড়ব অর্থাৎ মা ও নি বর্জিত এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ। 'অবতার হও' ইত্যাদির অর্থ দু'রকম ভূপালিতে অর্থাৎ পৃথিবী পালন করতে এবং ভূপালী রাগে। ভূপালী অনেক বিষয়ে শুদ্ধ কল্যাণের অনুরূপ। ষষ্ঠ গানে মরালী শব্দে মারোয়াঁ রাগে ধ্বনির আভাস আছে। 'গমনশ্রী' মারোয়াঁ রাগের কর্ণাটি নাম। 'দেশকার ভোলাতে' ইত্যাদি লাইনে ব্যক্ত হয়েছে যে, যেখানে যেখানে মা ও নি বর্জন করা হয় সেই সেইখানে এই রাগকে দেশকার বলে ভুল হতে পারে।

নবরাগ মালিকা

নিবিড় অরণ্য মাঝে বয়ে যায় ঝর্নাধারা
অবিচ্ছিন্ন ঝরঝর সুরের প্রবাহ
পাখির পালক বাঁধা তীর ধনু হাতে
গেয়ে ওঠে ঝর্না তীরে বনের কিশোর—

রাগিণী নির্ঝরিণী— তেতালা

রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ কে বাজায় জল ঝুম্‌ঝুমি

[নির্ঝরিণী রাগিণী পরিচয় :

আরোহ	:	সাপা, গামাপা, সা
অবরোহ	:	র্সা (না) দা পা, মা, গা মা ঋা সা
বাদী	:	পঞ্চম
সম্বাদী	:	ষড়জ

এই রাগিণীর উত্তরাঙ্গ প্রবল। অবরোহণের সময় তীব্র নিখাদ গুপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্জিত নয়, বিবাদী। অবরোহণে ধৈবতে আন্দোলনকালে কতকটা ভেঁরো ঠাটের জিলেফের আভাস আসে, ইহার গতি 'শোখ' অর্থাৎ চঞ্চল। ঝর্নাধারার মতো অবরোহণকালে ইহার চঞ্চলগতি ফুটিয়া উঠে। জলধারার মেঘরূপে পর্বতারোহণের মত ইহার গতি গম্ভীর ও শ্লথ এবং অবতরণে গতি চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম নির্ঝরিণী।]

শুনিতে শুনিতে সেই ঝরনার সুর
আনমনা হয়ে যায় বনের কিশোর।

ফেলে দিয়ে তীর ধনু শীর্ণা ঝর্নাজলে
সরল বাঁশিতে তুলে তরলিত তান।
সজল ঝর্নার বুকে ছিল যে বেদনা
তাই যেন ফুটে ওঠে পাহাড়ি বাঁশিতে।
ছিল সেই বনে এক অরণ্যকুমারী
চন্দ্রা নাম তার ; শুনি সেই বেণুরব
ভুলে যায় চঞ্চলতা আঁখি সকরুণ
কহে তার প্রিয় সখী রূপমঞ্জরীরে

রাগিণী বেণুকা—তেতালা

বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে

[বেণুকা রাগিণীর পরিচয় :

আরোহী	:	সা রা মা, পা ণা ধা মা পধর্সা
অবরোহী	:	র্সনা, পধমা, গা, রগা, সা
বাদী	:	মধ্যম
সম্বাদী	:	সা

এই রাগিণী শুনিতে কতকটা পাহাড়ি ও তিলককামোদের মতো শোনায়। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব অবরোহণে তীব্র নিখাদে তারার 'সা' ধরিয়া আন্দোলন ও স্থিতি, ঐরূপে ধৈবতে ও গান্ধারে স্থিতি। বুনো বাঁশির আভাস ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম বেণুকা।]

শুনি সেই গান—যেন বনের মর্মর।
বনের কিশোর আসে বাঁশরী বিসরি।
হেরিয়া কিশোর চন্দ্রা আনত নয়ানে
অনামিকা অঙ্গুলিতে জড়ায় আঁচল।
যত লাজ বাধে, তত সাধে মনে মনে
হে সুন্দর থাকো হেথা আরো কিছুক্ষণ।
মুঠি মুঠি বনফুল চন্দ্রা পানে হানি
মৃদু হাসি গেয়ে ওঠে বনের কিশোর।

রাগিণী মীনাক্ষী—তেতালা

চপল আঁখির ভাষায় মীনাক্ষী

[মীনাক্ষী রাগিণীর পরিচয় :

আরোহী	:	ন্া ধ্া সা ণ্া রা, গা মা পা, গা মা পা ধা র্সা
অবরোহী	:	র্সা ণা ধা মা, পদপা, মজ্ঞরা, গসা

বাদী : রেখাব
সম্বাদী : পঞ্চম

এই রাগিণীতে নীলাম্বরী ও কাফি রাগিণীর কতটা এবং অনেকটা হংস কিঙ্কিনীর আভাস পাওয়া যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব অবরোহণে বক্রগতিতে কোমল ধৈবত ও তীব্র গান্ধারে পূর্ববর্তী সুরকে ধরিয়া আন্দোলন অর্থাৎ ধৈবতের সময় নিখাদ ও গান্ধারের সময় মধ্যম ধরিয়া সুরকে দোলানো। ইহার গতি মীনের মত বক্র ও চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম মীনাক্ষী।]

শরমে মরমে মরি পালাইয়া যায়
প্রথম-প্রণয় ভীরু চন্দ্রা দূর বনে
সন্ধ্যামালতীর কুঞ্জে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
কী যেন অসহ দুখে, অজানা পীড়ায়।
দেখিলে চাহিতে নারে মুখপানে তার
না দেখিলে প্রাণ আরো করে হাহাকার।
আবার বাজিয়া ওঠে বাঁশি যেন বুকে
কাছে এসে সাধে তারে তার প্রিয় সখি।

(চন্দ্রার রূপমঞ্জরীর গান)

রাগিণী সন্ধ্যামালতী—আদ্ধা কাওয়ালী

শোনো ও সন্ধ্যামালতী—বালিকা তপতী

[‘সন্ধ্যামালতী’ রাগিণীর পরিচয় :
আরোহী : ন্ স জ্ঞ র, স গ ম প, জ্ঞ হ্ম প, ণ ধ ম, প নর্স
অবরোহী : র্স ন দ প, হ্ম জ্ঞ র স
বাদী : পঞ্চম
সম্বাদী : জ্ঞা

ইহার বিশেষত্ব, আরোহণকালে একাধারে বারোয়াঁ, ধানী ও মুলতানের রূপ অপূর্ব শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে। অবরোহণে মুলতানী ও পিলুর রূপ পরিস্ফুট হয়। সন্ধ্যামালতীর মতোই করুণ স্নিগ্ধ ও মধুর রসের সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যামালতী।]

বক্ষে দোলে নব অনুরাগের মালিকা
চক্ষে বহে অকরুণ অশ্রুনির্ঝরিণী
তবু চাহিল না বৃন্দাবনের কিশোরী
চন্দ্রা আঁখি তুলি অকারণ অভিমানে
ফিরে গেল ম্লানমুখে বনের কিশোর
চলি গেল আন্ পথে মুখ ফিরাইয়া।

গহন অরণ্য পথে ফেলে রেখে বাঁশি
ফিরে এসে সেই সন্ধ্যামালতী বিতানে
লুটাইয়া কাঁদে চন্দ্রা। বলে, 'হে নিষ্ঠুর
কেন তুমি জোর করে ভাঙিলে না লাজ?'
হে অন্তর্যামী, কেন অন্তরের ব্যথা
বুঝিলে না? কেন তুমি ভুল বুঝে গেলে?

রাগিণী—বনকুন্তলা—তেতালা

বনকুন্তল এলায়ে বন-শবরী ঝুরে

[বনকুন্তলা রাগিণীর পরিচয় :

আরোহী	:	স র গ প, ধ প, প ধ র্স
অবরোহী	:	র্স ন ধ প গ র, গ স র
বাদী	:	রেখাব
সম্বাদী	:	পঞ্চম
গ্রহ ও ন্যাস	:	রেখাব

এই রাগিণীতে এলায়িত কুন্তলা বিরহিনী বনশবরীর রূপ আরণ্যশ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম বনকুন্তলা। আরোহীতে পঞ্চমে ধৈবত অবলম্বন করিয়া স্থিতি বলিয়া ভূপালী হইতে ইহা স্বতন্ত্র শোনায়। অবরোহীতে র্স ন ধ প, গ র স র—ইহার প্রধান রূপ, ইহাতেই ইহার আরণ্যশ্রী করুণ রূপে ফুটিয়া উঠে।]

ফিরে আসিল না আর বনের কিশোর
ঘরে ফিরিল না আর বনের কিশোরী।
মাধবী চাঁদের বুকে কৃষ্ণ লেখা হয়ে
দেখা দেয় আজো সেই কিশোরের ছায়া।
কাঁদে চাঁদ সেই বিরহীরে বুকে ধরি
আনন্দে কলঙ্কী নাম করিল বরণ।
বনের কিশোরী চন্দ্রা সেই চাঁদ পানে
চাহিয়া বনের বুকে বিসরিয়া তনু
ধরিল দোলনচম্পা রূপ এ ধরায়
জনম লভিয়া পুন হেরিতে কিশোরে!
আজো দোলপূর্ণিমার রাতে বিকশিয়া
ঝরে যায় বিরহের প্রখর বৈশাখে
বারেবারে জন্ম লভে মরে বারেবারে
তবু তার প্রেমের সে-অনন্ত পিপাসা
মিটিল না, মিটিবে না বুঝি কোনো কালে।

অনন্ত এ বিরহের রাস-মঞ্চে তার
অচ্ছেদ্য মিলন-লীলা চলে অনিবার॥

রাগিণী–দোলনচম্পা—তেতালা

দোলনচাঁপা বনে দোলে দোল্ পূর্ণিমা রাতে

[দোলনচম্পা রাগিণীর পরিচয় :

আরোহী	:	স গ হ্মপ, গ ম ন ধ, প ন ধ র্স
অবরোহী	:	র্সন ধণ ধণধপ হ্মপ, গ ম গম, রস
বাদী	:	ধৈবত
সম্বাদী	:	ষড়জ

ইহাতে হাম্বীর, কামোদ ও নটের রূপ মাঝে মাঝে উঁকি দেয় কিন্তু ইহার গতি অত্যন্ত দোলনশীল বলিয়া ঐ সব রাগের আভাস দিয়াই ছুটিয়া পালাইয়া যায়।

আরোহণে পূর্ববর্তী সুরকে ধরিয়া 'ঝুলনা' বা দোলাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব ; দক্ষিণ সমীরণে দোলনচম্পার দোলনের সঙ্গে ইহার গতির সামঞ্জস্য হইতে ইহার নাম দোলনচম্পা হইয়াছে। তীব্র মধ্যম ও গা মা নি ধা—য় চাঁপা ফুলের সুরভির তীব্রতা ও মাধুর্য ফুটিয়া উঠে।]

'নজরুলের সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ 'মেল-মেলন' ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'অগ্রন্থিত নজরুল : রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। প্রকাশনায় : নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০১।

যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম

১

এক অহোরাত্র আট প্রহরে বা যামে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রতি তিন ঘণ্টায় এক প্রহর বা যাম। সঙ্গীতের স্বর সপ্তকের মধ্যে কড়ি 'মা' বা তীব্র মধ্যম স্বর এই যাম বা প্রহর যোজনায় সেতু স্বরূপ। প্রতি প্রহরকে এই তীব্র মধ্যম যেন আহ্বান করে আনে আগত প্রহরের সাথে বিদায় প্রহরের পরিচয় করে দেয় ! নিশির শেষ প্রহরে যে রাগ গীত হয়, তার মধ্যে ললিত রাগ অন্যতম। ললিত রাগের শুদ্ধ ও তীব্র দুই 'মা'। 'পা' নেই বলেই বোধ হয় দুই 'মা'র কোলে ললিত রাগ লালিত হয়েছে। এই রাগের খেয়াল শুনুন। 'মা' এ রাগের প্রাণ।

ললিত তেতালা (চিত্তরায়)

পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে।
কৃষ্ণচূড়ার বনে ফাগুন-সমীরণে
ঝুরে ফুল বন-পথ তলে ॥
নিশি পোহায়ে যায় কাহার লাগি
নয়নে নাহি ঘুম বসিয়া জাগি
আমারই মতো হায় চাহিয়া আশা-পথ
নিশীথের চাঁদ পড়ে গগনে ঢলে ॥

২

টোড়ি রাগিণী দ্বিতীয় প্রহরে গীত হয়। ভৈরবী আশাবরি গান্ধারী প্রভৃতি রাগিণীর পর এই রাগের তীব্র মধ্যম তীব্র সুরে জানিয়ে দেয় যে, দিনের দ্বিতীয় প্রহর এল। দু-একটি টোড়িতে দুই মধ্যম লাগে। শুদ্ধ টোড়ির এক 'মা'। আরোহণের সময় এর পা পড়ে বক্র গতিতে। আরোহণের সময় ঋষভ বা রেখাবে চড়তে এ একটু ইতস্তত করে। অবরোহণের বেলায় কিন্তু ঋষভের গা ঘেঁষে খেলা করে।
টোড়ির খেয়াল শুনুন :

টোড়ি—তেতালা

উদার প্রাতে কে উদাসী এলে
প্রশান্ত দীঘল নয়ন মেলে ॥

স্নিগ্ধ সকরুণ তোমার হাসি
আঘাত করে যেন আমারে আসি ?
পাষাণ সম তব মৌন মুরতি
মোর বুকে বিষাদের ছায়া কেন ফেলে ॥
উন্মন ভিখারি গো, বল মোর কাছে
শূন্য হৃদয় তব কোন মন যাচে।
অশ্রু-তুষার-ঘন বিগ্রহ তব
গলিয়া পড়িবে প্রেমে কার মালা পেলে ॥

৩

টোড়ির পর যেসব সারং গীত হয় তার মধ্যে শুদ্ধ সারং ও গৌড় সারং ছাড়া অন্য রাগে তীব্র মধ্যম নেই। গৌড় সারংকে দিনের বেহাগও বলা হয়। দুপুর বেলায় এই রাগ গাওয়া হয়। এরও দুই 'মা'। এর দুই 'মা'-র উপরে সমান টান। এর চলন অত্যন্ত বাঁকা। এর খেয়াল গান গাওয়া হচ্ছে শুনলেই এর বাঁকা স্বভাবের পরিচয় পাবে না।

গৌড় সারং—তেতালা

ভবনে আসিল অতিথি সুদূর।
সহসা উঠিল বাজি রুমু রুমু ঝুমু
নীরব অঙ্গনে চঞ্চল নূপুর ॥
মুহু মুহু বন-কুহু বোলে
দোয়েল তমাল-ডালে দোলে,
মেঘের ধ্যান ভুলি চমকি আঁখি খোলে
'কে গো কে' বলে বন-ময়ূর ॥
'দগ্ধ হিয়ার জ্বালা ভুলায়ে
সজল মেঘের শীতল চন্দন কে দিল কে দিল বুলায়ে।
বকুল-কেয়া-বীথি হতে
ছুটে এল সমীরণ চঞ্চল স্রোতে,
চাঁদিনি নিশীথের আবেশ আনে
মিলন-তন্দ্রাতুর অলস দুপুর ॥

৪

গৌড় সারং-এর পরে অন্য প্রহরকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আসেন মুলতান রাগের তীব্র মধ্যম। মুলতান রাগের এক 'মা'—অর্থাৎ এতে কেবল কড়ি 'মা' লাগে। সকালের টোড়ি আর বিকালের মুলতান একই ঘরের ছেলে মেয়ে। শুধু চাল চলনের তফাতের

জন্য দুই জনের স্বভাব দু-রকমের হয়ে গেছে। টোড়ি শুনেছেন, এখন মুলতানের খেয়াল শুনুন, তা-হলেই এদের চালের তফাত বুঝতে পারবেন। টোড়ির রাধা অর্থাৎ 'রে' আর 'ধা' প্রীতি প্রবল, পা দুর্বল। মুলতানির 'পা' বেশ প্রবল। রাধা-প্রীতি খুব কম।

মুলতানি—তেতালা

মুকুর লয়ে কে গো বসি
হেরিছে আপন ম্লান মুখ-শশী॥
সখীরা ডাকে, বেলা বয়ে যায়
দোপাটির ফুল ঝুরে আঙিনায়,
ধুলাতে লুটায় কাঁখের কলসী॥
হেরিয়া তারি আলস ছবি
ডুবিতে নারে সাঁঝের রবি।
কমল-কলি লয়ে আঁচলে
ডাকিছে তারে গাঁয়ের সরসী॥

৫

বিকালের মুলতানির পর পিলু ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগিণীতে আর কড়ি 'মা' নেই। সান্ধ্য প্রহর যেই এল, অমনি কড়ি 'মা' আনলেন 'পুরবি'কে ধরে। পুরবি এল কাঁদতে কাঁদতে। দুই 'মা'-র গলা জড়িয়ে এর কান্না অতি সকরুণ।

পুরবি—তেতালা

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত আকাশে॥
দিন শেষে শুভদিন এল বুঝি মম
মরণের রূপে এলে মোর প্রিয়তম
গোধূলির রঙে তাই দশ দিশি হাসে
দিনগুণে নিরাশার পথ চাওয়া ফুরালো
শ্রান্ত এ জীবনের জ্বালা আজি জুড়ালো।
ওপার হতে কে আসে তরী বাহি
হেরিলাম সুন্দরে, আর ভয় নাহি,
আঁধারের পারে তার চাঁদ-মুখ ভাসে॥

৬

পুরবি পুরিয়া প্রভৃতি রাগের কান্নার পর, রাত্রি যেমন ঘনিয়ে এল অমনি চাঁদের চাঁদ-মুখ দেখে রাতের চোখে ফুটে উঠল হাসি। তীব্র মধ্যম নিয়ে এল চঞ্চল ছায়ানটকে ধরে।

নটের মতো এর আঁকাবাঁকা গতি, মধুর অঙ্গভঙ্গি কী অপরূপ, তার আভাস পাবেন এই সুরের গানে।—

ছায়ানট—তেতালা

বিরহী বেণুকা যেন বাজে সখী ছায়ানটে।
উথলি উঠিল বারি শীর্ণা যমুনা তটে॥
নীরব কুঞ্জে কুহু
গেয়ে ওঠে মুহু মুহু
আঁধার মধু বনে বকুল চম্পা ফোটে॥
সহসা সরস হল বিরস বৃন্দাবন
চন্দ্রা-যামিনী হাসে খুলি মেঘ-গুণ্ঠন।
সে এলো তারে নিরখি
পরান কি রবে সখী?
আবেশে অঙ্গ মম থরথর কেঁপে ওঠে॥

৭

ছায়ানটের পর আসে নিঝুম নিশি। বিহগ যখন ঘুমায় বেহাগ তখন জাগে। শুদ্ধ মধ্যমই এর আসল মা। কড়ি 'মা' এর সৎমা। দুই মাধ্যমে এর যে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠে তার বুঝি তুলনা নেই।

বেহাগ—তেতালা

নিশি নিঝুম, ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে
ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে॥
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি
শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি!
কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি,
বিষাদ-মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি,
দিন যায় দিন গুণে, নিশি যায় নিরাশে॥

৮

বেহাগের পর নিশীথের তৃতীয় প্রহরে কড়ি মধ্যম ধরে আনে চঞ্চল 'পরজ'কে। এর মান অত্যন্ত প্রবল—অর্থাৎ কড়ি মধ্যম ও নিখাদে এর অত্যন্ত প্রীতি। এর তীব্র নিখাদ ও

মধ্যম ঘুমন্তের ঘুম ভেঙে দেয়। এর বিরহ যেন বিলাস। বসন্তের সাথে এর অত্যন্ত প্রীতি।

পরজ—তেতালা

পর জনমে যদি আসি এ ধরায়
ক্ষণিক বসন্ত যেন না ফুরায়॥
মিলনে যেন নাহি আসে অবসাদ
ক্ষয় নাহি হয় যেন চৈতালি চাঁদ
কণ্ঠ লগ্না মোর প্রিয়ার বাহু
খুলিয়া না পড়ে যেন, নিশি না পোহায়॥
বাসি নাহি হয় যেন রাতের মালা
ভরা থাকে যৌবন-রস-পিয়ালা।
জীবনে রবে না মরণ-স্মৃতি
পুরাতন হবে না প্রেম-প্রীতি।
রবে অভিমান, রহিবে না বিরহ
ফিরে যেন আসে প্রিয়া মাগিয়া বিদায়॥

নজরুলের সঙ্গীতালেখ্য 'যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম' ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুন সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিনিটে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়।
[তথ্যসূত্র : 'নজরুল যখন বেতারে', আসাদুল হক, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।]

অগ্রন্থিত গান

১

এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ।
যেদিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ॥

চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এদেশে নিরন্তর
জ্যোৎস্নাসম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর,
জীবন হেথায় স্নেহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ॥

নিত্য হেথা ঝরছে মেঘে স্বর্গ হতে শান্তি–জল,
মাঠে ঘাটে লক্ষ্মী হেথায় ছড়িয়ে রাখে ফুল কমল।

হাঙর কুমির শার্দুল সাপ খেলার সাথী এই জাতির
দিল্লীর যশ করল হরণ এই দেশেরই প্রতাপ বীর,
একদা এই দেশের ছেলে জয় করেছে দেশবিদেশ॥

[‘প্রতাপাদিত্য’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭২৭৬, শিল্পী : ধীরেন দাস, সুর : নজরুল]

২

জয় হে জনগণ অধিপতি জয়
হে দেবপূজ্য—নিঃশঙ্ক নির্ভয়॥

প্রতাপে ভাস্বর তুমি আদিত্য হে
মৃত্যু তোমার চরণে ভৃত্য হে
সিংহাসন তব ব্যথিত চিত্ত হে
হে রাজসন্ন্যাসী চির অসংশয়॥

সিংহবিক্রম শত্রুজিত সুর
চক্রপথে তব ঊষর বন্ধুর

দুর্দিনে এই দুর্গশিরে তুমি
আশার কেতন মন্ত্র অভয় জয় হে॥

[‘প্রতাপাদিত্য’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭২৭৭, শিল্পী : গোপাল সেন, সুর : নজরুল]

৩

জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো ভাগ্যহত
তব গৌরব–কেতন সমুন্নত
ঐ হলো আনত॥

লক্ষ্মীর চরণের আলপনা হায়
ওরে গৃহঅঙ্গনে তোর যায় মুছে যায়।
মন্দির বিগ্রহ ধূলায় লুটায়
মাহেন্দ্রক্ষণ ঐ হলোরে গত॥

[‘প্রতাপাদিত্য’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭২৮১, সুর : নজরুল]

৪

ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী !
জাগো উর্ধ্বে মোদের দেবী শক্তিময়ী॥

অবনত এ জাতির প্রার্থনা ওই
তব ললাটে জ্বলে জয়টীকা ভাস্বর
তব বিজয় যাত্রাপথে শঙ্খ বাজে হে বীরবর॥

[‘প্রতাপাদিত্য’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭২৮৩, সুর : নজরুল]

৬

লীলারসিক শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অন্ত কে পায়।
কোটিরূপে অনন্ত–অরূপ সে খেলিয়া বেড়ায়॥

কভু বিষ্ণু স্বয়ং গোলকবিহারী,
কভু গোপী, সখা কাননচারী,
কভু মুরলীধারী, কভু মুরারি,
কভু রাধা মাধব, কভু কুব্জারে চায়॥
নিপট কপট কভু শঠ ননীচোর
কভু কংস অরি, কভু নওল কিশোর
কভু বনের রাখাল, কভু ভয়াল করাল,
কভু গীতা উদ্‌গাতা, কভু রাজা দ্বারকার।
তার আদি অন্ত কে পায়॥

['কৃষ্ণ–সখা সুদামা' রেকর্ড–নাটিকা, এন ৩৬৬৫, সুর : নজরুল]

৭

অন্ধকারে দেখাও আলো কৃষ্ণ নয়ন–তারা।
কালো মেঘে অন্ধ আকাশ পথিক পথ–হারা॥
ভক্ত কাঁদে অকূল ভবে
গোকুলে তায় ডাকবে কবে,
অশান্ত এ চিত্তে হরি বহাও শান্তি–ধারা॥

['কৃষ্ণ–সখা সুদামা' রেকর্ড–নাটিকা, এন ৩৬৬৯, সুর : নজরুল]

৮
(চণ্ডীদাস ও রামীর গান)

চণ্ডীদাস : প্রেমের গোকুলে কুটির বাঁধিব গো
প্রেমের যমুনা তীরে।
রামী : নীর ভরণে যাব প্রেম যমুনাতে
প্রেমের গাগরি শিরে॥
দাস : প্রেম জাগরণে শয়নে স্বপনে
প্রেম থাক্ পরান ঘিরে (মোর)

রামী : প্রেম গলার হার, প্রেম নয়নধার
প্রেম দীপ ঘন তিমিরে॥
চণ্ডীদাস : প্রেম পরান প্রিয়, প্রেম সুধা অমিয়
চাহি প্রেমের প্রেমীরে
প্রেমের লাগিয়া লাখো জনম গো
আসিব ফিরে ফিরে।
রামী : প্রেমের যমুনাতীরে॥

[‘চণ্ডীদাস’ রেকর্ড–নাটিকা, এফ.টি ৪০৩৭, শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী, সুর ; নজরুল]

৯
(রামীর গীত)

সখি, শ্রবণে শোনা শ্যাম নাম
নাম শোনা লো শোনা লো॥
যে–নাম শুনে কুলনারী হয় আনমনা লো॥
সখি ধেয়ায় যে–নাম
প্রতি ঘরে প্রতিজনা লো॥

[‘চণ্ডীদাস’ রেকর্ড–নাটিকা, এফ.টি. ৪০৪৫, শিল্পী : হরিমতী, সুর : নজরুল]

১০

চণ্ডীদাস : প্রেম আমার জাতি লাজ কুল মান সাথী
প্রেম–রাজ–মুকুট শিরে।
রামী : প্রেম–যোগিনী হয়ে ছাড়িব সংসার
লয়ে প্রেম বিরহীরে॥
চণ্ডীদাস : প্রেমের কলঙ্ক চন্দন সব গো
থাকুক ললাটে ঘিরে।
উভয়ে : প্রেম–বাউল হয়ে ছেড়ে যাই গৃহ গো
প্রেম ডাকে বাহিরে॥

[‘চণ্ডীদাস’ রেকর্ড–নাটিকা, এফ.টি. ৪০৪৬, শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী, সুর : নজরুল]

১১

(কৃষ্ণকুমারীগণের গীত)

তুমি রাজা নহ শুধু দ্বারকার
ত্রিলোকের রাজা তুমি সম্রাট—
গ্রহ–রবি–শশী তারকার ॥

ছিলে রাজা মথুরায়, রাজা ব্রজধামে
শ্যাম রাজা ছিলে তুমি কিশোরী বামে,
তুমি বনে রাজা, তুমি মনে রাজা
শিশু নটরাজ তুমি কোলে যশোদার ॥

[‘সুভদ্রা’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭৪৪৯, সুর : নজরুল]

১২

(উর্বশীর গীত)

আমি ভুলিতে পারি না সেই দূর অমরার স্মৃতি।
যার আকাশে বিরাজে চির–পূর্ণিমার তিথি ॥

আজও যেন শুনি ইন্দ্র সভায়
দেবকুমারীরা ডাকে ‘আয় আয়’
কেঁদে যেন ডাকে অলকানন্দা নন্দন–বন বীথি ॥

[‘সুভদ্রা’ রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭৪৪৯, শিল্পী : আঙ্গুরবালা, সুর : নজরুল]

১৩

(নারদের গীত)

নামো নারায়ণ অনন্ত লীলা সিন্ধু বিশাল
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করা ॥

বিরাট বিপুল তবু মহা বিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদাপদ্মধারী কভু গোলকবিহারী
কভু গোপাল ব্রজদুলাল কিশোর রাখাল ॥

['সুভদ্রা' রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭৪৫০, শিল্পী : গোপাল সেন, সুর : নজরুল]

১৪

জয় জয় মা গঙ্গা পতিতপাবনী ভাগিরথী।
হর শির বিহারিণী সুরেশ্বরী অগতির গতি ॥

মৃত সাগরের দেশে প্রাণদাত্রী তুমি
তোমার পুণ্যে হলো তীর্থ ভারতভূমি
পাপনিবারণী কলুষহারিণী
ত্রিলোকতারিণী মাগো লহ প্রণতি ॥

['সুভদ্রা' রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭৪৫১, সুর : নজরুল]

১৫
(বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আমার লীলা বোঝা ভার
নদীতে বান আনি আমি—
আমিই করি পার ॥

আমার যারা করে আশ
করি তাদের সর্বনাশ
তবু আশা ছাড়ে না যে
মিটাই আশা তার ॥

['সুভদ্রা' রেকর্ড–নাটিকা, এন ৭৪৫৪, শিল্পী : পদ্মাবতী, সুর : নজরুল]

১৬

(উর্বশীর গীত)

তোমারি চরণে শরণ যাচি, হে নারায়ণ !
জানি নাথ তব করুণায় হবে সব শাপ বিমোচন॥

রূপ-শিখা মোর ধূলির ধরায়
দিনে দিনে নাথ ম্লান হয়ে যায়,
শুনিয়াছি তব নামে হয় সব পাপ-তাপ নিবারণ
নারায়ণ, নারায়ণ॥

[‘সুভদ্রা’ রেকর্ড-নাটিকা, এন ৭৪৫৬, শিল্পী আঙ্গুরবালা, সুর : নজরুল]

১৭

(বৈরাগীর গীত)

পর হবে তোর আপনজনে
(তুই) ভাবনা তবু করিস্ নে।
হয়তো তরী ডুববে জলে
(তবু) তুফান দেখে ডরিস্ নে॥

তোর বেদনায় গলবে সবে
তোর আপনজনেই অটল রবে,
তুই আপন পথে চল্ নীরবে
কারুর চরণ ধরিস্‌নে॥

[‘সরলা’ রেকর্ড-নাটিকা, এফ.টি. ৪৫৭৮, শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুর : নজরুল]

১৮

(ভক্ত ও ডাকহরকরার গান)

ভবানী শিবানী কালী করালী মুণ্ডমালী॥

অম্বিকে তম্বিকে আদ্যাশক্তি তারা শ্যামা,
ত্রিভুবন ঈশ্বরী গো দনুজদলনী বামা ;
প্রসীদ বরদা মাগো চরণে আহুতি ঢালি ॥

['সরলা' রেকর্ড–নাটিকা, এফ.টি. ৪৫৮৩, শিল্পী : কে. মল্লিক ও ইন্দু সেন, সুর : নজরুল]

১৯
(বাউলের গীত)

ওরে অবোধ !
গরম জলে ঘর কি কভু পোড়ে ?
আপন জনের আঘাত কি কেউ
রাখে মনে করে রে ॥

তুই বিদায় নিলি অভিমানে
শেষে ফিরতে হলো প্রাণের টানে রে
(ওরে) এ স্নেহ–ডোর ছিন্ন করে
কোথায় যাবি সরে ॥

['সরলা' রেকর্ড–নাটিকা, এফ.টি. ৪৫৭৮, শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুর : নজরুল]

২০
(রুক্মিণীর গীত)

হে কৃষ্ণ চাঁদ দাসীর
হৃদয়ে কখন উদয় হবে ?
তুমি চিরদিন কৃষ্ণা তিথির আঁধারে কি ঢাকা রবে ?
বিফল পূজার কুসুমের প্রায়
হেরো দেহলতা ম্লান হলো হায়,
পথ চেয়ে আর থাকিতে পারি না
হে নাথ আসিবে করে ॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড–নাটিকা, এন. ১৭২৩৯, সুর : নজরুল]

২১

(রুক্মিণীর গীত)

আরো কত দূর ?
কখন শুনিব তবক বাঁশরীর সুর ?

দেবে কখন ধরা
হব স্বয়ম্বরা,
কাঁদাতে জানো শুধু তুমি নিঠুর ॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড–নাটিকা, এন ১৭২৩৯, সুর : নজরুল]

২২

(রুক্মিণরি সহচরীগণের গীত)

দ্বারকার সাগরতীর হতে সই
মধুর মুরলিধ্বনি ভেসে ভেসে ঐ ॥

রহি রহি সেই সুর নিশিদিন বাজে,
মোদের সখির অন্তর মাঝে ;
(সখি) সকলে আসিল সেই বাঁশুরিয়া কই ॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড–নাটিকা, এন ১৭২৪১, সুর : নজরুল]

২৩

(রুক্মিণীর সহচরীগণের গীত)

নমো যাদব নমো মাধব নমো দ্বারকাপতি।
নমো শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ শ্রীহরি অগতির গতি ॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড–নাটিকা, এন ১৭২৪১, সুর : নজরুল]

২৪

(রুক্মিণীর গীত)

তুমি কি পাষাণ বিগ্রহ শুধু কহ গিরিধারী কহ
জাগিবে না তুমি ? তুমি কি আমার অন্তর্যামী নহ ?
তুমি কি আমার পরানের ব্যথা
বুঝিবে না তুমি কহিবে না কথা ?
কথা কও বধূ সহিতে পারি না অসীম এই বিরহ॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড-নাটিকা, এন ১৭২৪১, সুর : নজরুল]

২৫

(মন্দির মধ্যে রুক্মিণীর গীত)

জয় দুর্গতি-নাশিনী শিবে
জয় মঙ্গল চণ্ডিকা, জয় মা ভবানী অম্বিকা॥
বেদনা-সিন্ধু-তারিণী তারা
ত্রিনয়নে ঝরে করুণাধারা,
দুর্গে সর্বসাধিকা জয় মা ভবানী অম্বিকা॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড-নাটিকা, এন ১৭২৪২, সুর : নজরুল]

২৬

(সখিগণের গীত)

যুগল মূরতি দেখে জুড়াল আঁখি।
(যেন) তমাল শাখায় বাঁধা মাধবী রাখী॥

কৃষ্ণ মেঘের পাশে রুক্মিনী বিজলী
রহিয়া রহিয়া হাসে দিগন্ত উজলি,
নীল আকাশ রঙিন হলো গোধুলি মাখি—
(সোনার) গোধূলি মাখি॥

['রুক্মিণী মিলন' রেকর্ড-নাটিকা, এন ১৭২৪২, সুর : নজরুল]

২৭

ভাটিয়ালি

ওরে ভাটির নদী লয়ে যাও মোরে
সেই সাগরজলে।
যে সাগর ছুঁলে মরা গাঙে
আবার জোয়ার উথলে॥

মোর আঁখি শুকায়ে,
বিরহে বালুচরে গেছে লুকায়ে,
মোর নীরস বুকে আর জোয়ার আসে না।
ওপারে তরণী আর নাহি চলে॥

সাগরে গিয়ে মোর নাগরে কহিব বঁধু হে,
তব করুণা মেঘের জলে খালি বুক ভরে না
না পেলে পরশ মধু হে।

দিয়ে কেন কেড়ে নিলে স্রোতের বারি
আর বিরহ যাতনা সহিতে নারি।
দুয়ার ভাঙিয়া প্রেমের জোয়ারে—
আসিয়া লয়ে যাও চরণতলে॥

[‘পদ্মার ঢেউ’ গীতিচিত্রের গান, সুর : নজরুল]

২৮

ভাটিয়ালি

ও বন্ধু (আমার) অকালে ঘুম ভাঙাইয়া গো
করলে কেন দোষী।
তুমি নীল আকাশের পারা
কেন পড়লে বুকে খসি॥

আমার মনের খিড়কি দুয়ার ঠেলে
চুপে চুপে রূপের কুমার কখন তুমি এলে।
অন্ধ যেন দেখল প্রথম পূর্ণিমারই শশী॥

আমি কূলের বধূ জলে যেতাম
কেন তুমি বধূ
কলসি কেড়ে জল ফেলে গো
দিলে ফুলের মধু।

আর নদীর ঘাটে দেয় না যেতে কেউ গো
শুধু বুকে ওঠে কেন কীর্তিনাশার ঢেউ গো।
আজ তুমি কোথায়, কাঁদি
আঁধার কদমতলায় বসি॥

['পদ্মার ঢেউ' গীতিচিত্রের গান, সুর : নজরুল]

২৯
টোড়ী—আদ্ধা কাওয়ালী

উদার প্রাতে কে উদাসী এলে।
প্রশান্ত দীঘল নয়ন মেলে॥

স্নিগ্ধ সকরুণ তোমার হাসি
আঘাত করে যেন আমারে আসি।
পাষাণ সম তব মৌন মূরতি
মোর বুকে বিষাদের ছায়া কেন ফেলে॥

উন্মন ভিখারী গো বল মোর কাছে;
শূন্য হৃদয় তব কোন মন যাচে।
অশ্রু তুষার ঘন বিগ্রহ তব
গলিয়া পড়িবে প্রেমে কারো মালা পেলে॥

['যাম যোজনায় কড়ি মধ্যম' গীতি-আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩০
ছায়ানট—ত্রিতাল

বিরহী বেণুকা যেন বাজে সখি ছায়ানটে
উথলি উঠিল বারি শীর্ণা যমুনা তটে॥

নীরব কুঞ্জে কুহু কুহু
গেয়ে ওঠে মুহু মুহু,
আঁধার মধু বনে বকুল চম্পা ফোটে॥

সহসা সরস হলো বিরস বৃন্দাবন
চন্দ্রা যামিনী হাসে খুলি মেঘগুণ্ঠন।

সে এল তারে নিরখি
পরান কি রবে সখি,
আবেশে অঙ্গ মম থরথর কেঁপে ওঠে॥

[‘যাম যোজনায় কড়ি মধ্যম’ গীতি–আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩১
তাল : কাহার্‌বা

দুর্গম দূর পথে চল্‌ যাত্রী
ভয় নাহি, নাহি ভয় বলো যাত্রী॥

মহাতীর্থের মরুপথ সঙ্গী
দুস্তর গিরি পর্বত লঙ্ঘি,
ধরি বন ঘন কুন্তল রাত্রির—
চল্‌ দুর্জয় চঞ্চল যাত্রী।

[‘কাফেলা’ সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩২
তাল : কাহার্‌বা

গোলাপ নেবো না নেবো না হেনা লালা।
যে মালিকা দোলে
তোমার আঁখির কোলে,
দাও সেই আঁখি–জল মালা॥

চাহি না চৈতী-চাঁদিনী রাতি,
শূন্য ভবনে যদি—
নাহি জ্বলে প্রেমের বাতি।
চাহি না রূপহীন উপহার ডালা॥

['কাফেলা' সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৩

তাল : তেওড়া

সেই দেশে কি যাও গো মরুর কাফেলা
যে দেশে মোর বন্ধু কাঁদে একেলা॥

ঘর বাঁধি না বেদুইনের মেয়ে গো
আজ তাঁবু বেঁধে রাত জাগি পথ চেয়ে গো,
মরুর তৃষ্ণা তরুর ছায়ায় যায় না গো
কেঁদে যায় বেলা॥

মরুর যাত্রী বাণিজ্যে যাও
আমারে এনে দিও,
ফিরতি পথে, হারানো মোর
বুকের মানিক মোর প্রিয়।

বোলো তারে যে-গিরি ঝর্না
এনেছিল মরুতে
ছেয়েছে সে-ঝর্না আজি
কাঁটালতা তরুতে।
আর ফোটে না আমার বনে
গোলাপ হেনা চামেলা॥

['কাফেলা' সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৪

রাজার দুলারী জুলেখা আজিও কাঁদে
কাঁদে ইউসুফ তরে।

অশ্রু তাহার দূর নভ হতে
রাতের শিশিরে ঝরে॥

আসে বসন্ত ফোটে কুসুম
কিংশুকের আজিও ভাঙে না তো ঘুম,
যার এত রূপ সে কিগো পাষাণ
প্রিয়ারে না মনে পড়ে॥

যুগ–যুগান্ত কাঁদে জুলেখা
বিরহ–সিন্ধুকূলে
চোখে লয়ে জল আসে ইউসুফ
বুঝি আজ পথ ভুলে।

মাধবী নিশীথে ডাকে বুলবুল
ফাগুন সমীরণ হয়েছে আকুল,
মিলন পরশে দু'জনার মন
ক্ষণে ক্ষণে শিহরে॥

['পঞ্চাঙ্গনা' সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৫

লুকায়ে রহিলে চিরদিন শীশমহলের শার্সিতে।
তব রূপ শুধু রূপায়িত হলো হেরেমের আর্শিতে॥

অমৃত অশ্রু মেশা—
পিঞ্জরে চিরবন্দিনী চিরযোগিনী জেবুন্নিসা।
তোমার দিওয়ানে ওগো শাহাজাদী কবি
আঁকিলে যে তব বিরহ–বিষাদ ছবি,
লাজ পায় তাজমহলও তাহার সকরুণ সংগীতে॥

কোন্ সে তরুণ কবি তোমারে
তোমার কবিতার চেয়ে সুন্দর দেখেছিল।
গোলাপ ফুলের পাপড়িতে তব ছবি—
প্রেম চন্দনে এঁকেছিল।

প্রিয়ার আদেশে আগুনের দাহ সহি
পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি,
সেই মন প্রেমের মহিমা আজিও জাগে
ঝরা গোলাপের সুরভিতে ॥

['পঞ্চাঙ্গনা' সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৬

বঁধু আঁখি–জলে কস্তুরী–চন্দন ঘষিনু
শয্যা বিছাইনু সোনার পালঙ্কে।
পথ চেয়ে নিশি মোর
ভোর হতে ওগো চোর
কেন এলে শ্রী অঙ্গ মাখিয়া কলঙ্কে ॥

মুখ দর্পণে দেখো হে, ওহে দর্পহারী
শ্রীমুখ একবার দর্পণে দেখো হে।
শ্যামল তনু কেন ঝামর ভেল
চাঁচর কুন্তল কেন এলোমেলো।
ললাটে মাখা কেন সিন্দুর রেখা
কপোলে লেগেছে কার কাজল লেখা।
তব হিয়ার কলঙ্ক কালি লেগেছে কপোলে হে
কেন আঁচলে মুখ মোছো।
নিলাজের লাজ কভু মোছা কি যায় হে।
ও–লাজ যাবে না ধুলে শত যমুনার জলে
নিলাজের লাজ কভু মোছা কি যায় হে।
হিয়ার মাঝারে কেন আলতার শোভা
শ্যামা ভেবে কে পূজেছে দিয়ে রাঙা জবা।
অলকা–তিলক কে মুছে নিল
বনমালা কেন ছিন্ন।
দশ নখ ক্ষত অরুণাধর ভুজে কঙ্কণচিহ্ন।
সিঁদেল চোরের মতো নিদে ঢুলঢুলু আঁখি ;
নীলাম্বর পরে এলে জলধর নাকি।
ছি ছি একি হেরি ! হরি হরি হরি !

পীতধড়া পরিহরি এলে নীল শাড়ি পরি
এ কি হেরি ! ছি ছি এ কি হেরি !
হলে নব পরিণয় মালা বদল হয়
দেখিয়াছি ঘনশ্যাম
প্রীতিতে রসময়–বসন বদল হয়
নূতন রীতি আজি হেরিলাম মাধব।
শুনেছিনু পরমুখে পরপুরুষের মতো
তোমার রীতি (হে)।
তব পরাপর জ্ঞান নাই হে পরম পুরুষ !
তব পরাপর জ্ঞান নাই শুনেছিনু পরমুখে
হে নিলাজ দেখে আজ হইল প্রতীতি (হে)
হইল প্রতীতি॥

['মান' গীতি–আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৭

মান যদি করি প্রিয়, তুমি এসে ভাঙায়ো
ক্ষমা সুন্দর পায়ে দিয়ো দিয়ো স্থান।
স্থান দিয়ো হে
আমায় ক্ষমাসুন্দর পায়ে স্থান দিয়ো হে॥

রেখো রেখো দাসীর সে–মান।
রাখো চরণে তব লাখ চন্দ্রাবলী
শত শত গোপিকা।
তোমার হৃদয় যেন হে প্রিয় মাধব
একাকিনী এ দাসী হয় মাধবিকা মাধব,
(আমি আর কিছু চাই না
যেন রাই হয়ে মনের এ মান হারাই না
আর কিছু চাই না।)
তোমার হৃদয়ে যেন হে প্রিয় মাধব
একাকিনী এ দাসী হয় মাধবিকা মাধব॥

['মান' গীতি–আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৮

শোনো ঘনশ্যাম বনবাসী।
অভিমানে তব মান না রাখিয়া—
কি দুঃখ পাইল দাসী॥

বাহিরে তোমায় ফিরায়েছি হরি
নিদারুণ মান-ভরে।
'ফিরে এস বঁধু ফিরে এস' বলে
কাঁদিয়াছি অন্তরে।
সবই তো জানো অন্তরে তুমি অন্তরযামী
সবই তো জানো।
অভিমান দিয়া মান বাড়ালে
দাসীর সবই তো জানো
ব্রজবাসিনীর কাছে মান দিয়া মান বাড়ালে
দাসীর সবই তো জানো।
তব আরাধিকা রাধিকার তুমি
কেন হে পরান বঁধু
এত মান দিলে গরব করার দিল-এ
এত প্রেম মধু—কেন বঁধু।
মোরে শ্যাম-সোহাগিনী বলে সখিগণ সবে
তাই যে সাহস পাই
অভিমান করে রাই
গরবিনী সে যে বঁধু তোমারই গরবে।
তার আর যে কেহ নাই
গরব করার তার আর যে কিছু নাই।
এত গরব করার যদি গরব দিলে বঁধু
রেখো রেখো দাসীর সে-মান বঁধু হে॥

['মান' গীতি-আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৩৯

কেন ঝুলনাতে একেলা দোলে রাই কিশোরী।
বুঝি মেঘের মাঝে হারিয়ে গেল মেঘ-বরণ হরি॥

সই দধির মাঝে ননী থাকে
মোরা মথন করে আনি তাকে,
মোরা নিঙড়ে মেঘের সাগর
শ্যামে আনব বাহির করি॥

ঐ কালাকে সই ভালো জানি
জানি তাহার ঢং
তার কৃষ্ণ রূপের আঁধার ভরা
শুধু রাধার রং।

যে না থাকিলে রাধার মাঝে
দোলনাতে রাই দুলত না যে
সই মেঘ যদি না থাকে
সই কেন চমকায় বিজরি॥

[‘হিন্দোলা’ গীতি–আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৪০

হে প্রিয়তম অন্তরে মম
বোদনের এ কি ঢেউ নিশিদিন দুলে।
নদী-স্রোতের মতো মোরে টানিয়া আনিলে
এ কোন্ বিরহের সাগরকূলে॥

আঁধার বনে ছিনু বনলতা একা,
কেন ফুল ফোটালে, কেন দিলে দেখা।
অসহ বেদনার এত মধু দিলে যদি
বুকে কেন নিলে না তুলে॥

বাহির ভুবনে রহ যেন তুমি উদাসী,
অন্তরে বসি চোর বাজাও বাঁশি।
এই মন হয়ে ওঠে বিরহ বৃন্দাবন
লোক–লাজ গৃহকাজ সব যাই ভুলে॥

[‘ঠুংরির জলসা’ সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৪১

ধারাজলের ঝালর ঢাকা শ্যাম চাঁদের মুখে।
দোলার ছলে অমন করে পড়িসনে রাই ঝুঁকে॥

যে বনমালার ছোঁয়ার আশে
দুলি মোরা আশেপাশে,
সেই বনমালা দু'হাত দিয়ে জড়াস্‌নে লো বুকে॥

রাই নূপুর কেন থামায় লো তার পায়ে দিয়ে পা,
আঁচল দিয়ে ঝাঁপিস্‌নে লো শ্যামের আদুল গা।

মোরা চোখে চোখে বাঁধব রাখি
ঢাকিস্‌নে ওর কাজল আঁখি
আজ পারন ভ'রে দেখব মোরা পরাণ বঁধুকে॥

['হিন্দোলা' গীতি–আলেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৪২

জাগো বিরাট–ভৈরব যোগসমাধিমগ্ন।
ভুবনে আনো নব দিনের শুভ প্রভাত লগ্ন॥

অনন্ত শয্যা ছাড়ি অলখ লোকে
এসো জ্যোতির পথে
দেব–লোকের তিমির–কারা প্রাচীর করো ভগ্ন॥

ভয়হীন, দ্বিধাহীন উদার আনন্দে,
তোমার আবির্ভাব হোক প্রবল ছন্দে॥
হোক মানব স্বপ্রকাশ আপন স্বরূপে
বিরাট রূপে,
সফল করো আমার সোহং স্বপ্ন॥

['ষট ভৈরব' সংগীতালেখ্যের গান, সুর : নজরুল]

৪৩

নিশি ও প্রভাতে মিলন লগন
জাগিল অরুণ তন্দ্রা মগন,
রাধামাধব মধুবাসরে অতি কাতর ঘুমে।
পাপিয়া কুহু ডাকিয়া কেন গো
সহসা থামিল কুঞ্জে যেন গো,
মেলিয়া আঁখি গিরিমল্লিকা কেন পড়িল ঝুমে॥

কেন চাহিতে গিয়ে ফুল, চাহিতে পারে না।
গাইতে গিয়ে পাখি গাইতে পারে না,
যদি শ্যামের ঘুম ভাঙে, গাইতে পারে না
যদি ফুল ফোটা দেখে রাধা জেগে ওঠে—
ফুল ফুটিতে পারে না।
জটিলা কুটিলা সম কেন এল
ঊষা আর শুকতারা গো।
করুণ অরুণ আসিবে এখনি
যেন আয়ানের পারা গো।
চাঁদের হাট এই বৃন্দাবনে কেন
রবি উঠিতে চায়।
কোকিল, পাপিয়া, শুকসারী, ময়ূরের দেশে
ব্যাধ কেন আসে হায়।
সে তীর কেন হানে গো,
যথা নিত্য থির আনন্দ সেই বনে
বিরহের তীর কেন হানে গো।
কেমনে ভাঙাব ঘুম ঘনশ্যাম কিশোরীর
কেমনে করিব রসভঙ্গ সখি গো।
মহাভাবে পুঞ্জিত প্রেমঘন মাধুরী
কেমনে ছুঁইব সে-অঙ্গ সখি গো॥

['অভিসার' পালাকীর্তনের গান, সুর : নজরুল]

৪৪

জাগো বৃষভানু নন্দিনী জাগো গিরিধারী।
জাগাইতে দুখ পাই তবুও জাগাই মোরা শুকসারী॥

তোমরা না জাগিলে ভুবন জাগে না,
সংসার ধর্মকর্ম থাকে না,
তোমরা কুঞ্জে যদি ভুঞ্জ নিত্য হয়ে মহাভাব নিমগ্ন॥

আর কে বাজাবে বেণু
আর কে চরাবে ধেনু,
কে আনিবে আনন্দ লগ্ন॥
কে আনিবে রাসলীলা হরির মাতন
কে আনিবে ফুলদল মধুর ঝুলন,
রাই জাগো, জাগো জাগো—
শ্যাম রাই জাগো জাগো॥

['অভিসার' পালাকীর্তনের গান, সুর : নজরুল]

৪৫

কৃষ্ণ-প্রিয়া লো কেমনে যাবি অভিসারে।
সে-বিরহী রহে মানস-সুরধুনী পারে॥

সে এপারে রহে না
পারাপারের অতীত সে, এপারে রহে না
এপারে রহে না, ওপারেও রহে না, কোন পারে রহে না
গগনে গুরু গুরু মেঘ গরজে
অবিরল বাদল ঝরঝর ঝরে।
আঁখিজলে আঁখি তোর টলমল সই
অন্তর দুরুদুরু করে।
পথ দেখিবি কেমনে
তোর আঁখি পিছল পথও পিছল
পথে যাবি কেমনে।
তোর অন্তরে মেঘ, বাহিরে মেঘ
পথ দেখিবি কেমনে।
একে কুহু যামিনী তাহে কুল কামিনী
পথে পথে কাল্‌নাগিনী (লো)।
আছে আড় পেতে শাশুড়ি ননদিনী লো।

তুই চাতকীর মতো কেতকীর মতো রাই ;
মেঘ দেখে মত্ত হইলি ভয় নাই।
যার প্রেমের পথে বাধা বিধির অভিশাপ
সাপেরে সে ভয় করে না॥

['অভিসার' পালাকীর্তনের গান, সুর : নজরুল]

৪৬

হোরি

আজ হোরির ঝরে কেন
রাধার চোখে বারি।

[অসমাপ্ত অবস্থায় শৈল দেবীর খাতায় প্রাপ্ত]

৪৭

আকাশ গঙ্গাস্রোতে
কার গানের তরী যায় ভেসে ভেসে।
হলো ঘরে থাকা দায়
ওর সাথে যেতে চায় মন নিরুদ্দেশে (গা)॥
ওর সুরের মালা নিতে নাই কি গো কেউ,
ও গানে মোর বুকে কেন ওঠে ঢেউ।
ওর চাঁদ–মুখের গানে চাঁদিনীরাতি আনে
গগন মগন হয় স্বপ্নাবেশে॥

ও গানের ছন্দে কারে কারে কি কথা কয়,
ও কাহার কাছে এত মিনতি জানায়।

সুরের আড়াল টেনে মনের ব্যথা
কেন লুকাইতে চায় (গো)।
কাঁটালতার মতো ওর কথাগুলি হায়
যেন জড়াইতে চায় মোর আকুল কেশে॥

['পূর্বাণী' গীতিচিত্রের গান, সুর : নজরুল]

৪৮

বঁধু কি ক্ষণে হলো দেখা
নয়ানে নয়ানে গো যত দেখি
তত তৃষ্ণা বেড়ে যায় গো।
নদীর স্রোতের মতো এ প্রেম অবিরত
কৃষ্ণ–সাগর পানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধায় গো॥
নদীর এ–কূল ভাঙে ও–কূল থাকে
বঁধু তোমার প্রেম যাহারে ডাকে,
তার দু'কূল ভাঙে হায়
অকূলে সে কূল হারায়ে ভেসে যায়।
জ্ঞাতি কুল হারায়ে ভেসে যায় গো।
সে ফেরে না আর ঘরে গো।
নদী–স্রোতের মতো সে ফেরে না আর ঘরে গো।
বৃন্দাবনের ঘরে পরে যত সবাই নিন্দা করে,
তত কৃষ্ণ প্রেমের ঢেউ ওঠে তার কলঙ্ক সাগরে।
মাধব সবই জানো
কলঙ্কিনী রাধার ব্যথা সবই জানো।
বঁধু হে, ব্রজে, সবাই কৃষ্ণ ভজে
মনে মনে তোমায় ;
পরম পতি তোমায় ভজে
রাধা হলো দ্বি–চারিণী।
যার আচারে দুই ভাব নাই হে
সদা কৃষ্ণ ভাবে বিভোর থাকে
সেই রাধা হলো দ্বি–চারিণী।
বঁধু সকলের দিলে ঘর সংসার
দিলে শ্রীচরণ তরী হে।
রাধার ধরম কিছু রাখিলে না হরি হে।
মোর সেই তো ভালো
গুরু গঞ্জনা দিয়ে তব প্রেমে
হরি যেন বঞ্চনা করো না।
তব কলঙ্ক পসরা বহিব মাথায় করে
চন্দ্রাবলীর দল হইল সতী
জনমে জনমে রাই কলঙ্কিনীর
তুমি হয়ো পরম গতি।

মোর কৃষ্ণ বিনোদ বেণী, মোর কৃষ্ণ নয়নমণি
কৃষ্ণ নীলাম্বরী অঙ্গে !
কৃষ্ণ কলঙ্কমালা, কৃষ্ণ কাঁকনমাল
ভাসি, ডুবি কৃষ্ণ তরঙ্গে।
মতি দিও হে, যেন কলঙ্কে চন্দন ভাবি
মতি দিও হে, তোমার শ্রীমতীর সুমতি দিও হে
যেন কৃষ্ণপদে মতি থাকে, মতি দিও হে॥

['রূপানুরাগ' পালাকীর্তনের গান, সুর : নজরুল]

৪৯

কার স্মৃতি উদাসী ভোরে
ঘুম ভাঙায়ে জাগাল মোরে।
শুকতারা ছলছল, ও কি তার আঁখি-জল
হিমেল হাওয়ায় সেই অশ্রু কি
শিশির হইয়া ঝরে॥

অস্তচাঁদে হেরিয়া কাঁদে
আমার হিয়ায় কে, ও কি সেই?
আমার মনে রজনীগন্ধা
সুরভি আনিল সে, ও কি সেই?
মোর বিরহী হিয়ায় ও-চাঁদ স্বপনে
জড়ায়ে ছিল কি গভীর গোপনে?
এত কাছে তবু এত দূরে
কেন ধরিতে নারি ওরে॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫০

প্রেম-অন্ধ হে ভিখারী ! কার কাছে ভিখ চাও?
আমি তোমার মতো ভিখারিণী হায়
দেখিতে পাও না তাও॥

তব আহ্বানে তনু-প্রাণ-মন
চৈতালী ঝড়ে ফুলের মতন
ছড়াইয়া পড়ে দিক-দিগন্তে
কে তুমি বলে যাও॥

(প্রেম) ভিক্ষার ছলে জাগাতে আসিলে
এ কি প্রেম অনুরাগ?
নীরস নয়নে বহালে যমুনা
হৃদয়ে ছড়ালে ফাগ (গো)।

(আর) কোরো না ছলনা, কে তুমি বল
(মোরে) করিলে এমন রস-বিহ্বল,
তুমি যে-প্রেমে হলে অন্ধ ভিখারী
মোরে সেই প্রেম দাও॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫১

বঁধু তব প্রেম অনুরাগে
আমারই কাছে গো
মোর তনুমন কেন সুন্দর লাগে॥

বঁধু জ্বালাইলে কোন্ আলো
আজ তোমারই মতো আমারও লাগে ভালো,
মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন
অনঙ্গ-মঞ্জরী রূপ জাগে॥

বঁধু তুমি যবে রহ পাশে
রস-আবেশ-মাধুরীতে মন
অবশ হইয়া আসে (গো),
লয়ে শত ফাল্গুন মধু।

কিশোরী বয়স ফিরে এল যেন বঁধু
আজ যেদিকে তাকাই রেঙে ওঠে
সেই দিক কুসুম ফাগে॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫২

ভৈরব—কাহারবা

মোর কথার ভ্রমর সুরে সুরে
গুনগুনিয়ে গুনগুনিয়ে।
তব মুখ–কমল ঘিরে যায় গো
গান শুনিয়ে, গান শুনিয়ে॥

তুমি যেন চাঁদ মোর হৃদয়–আকাশে
তোমারে ঘিরে আমার মনের কথা
তারা হয়ে হাসে।
মোর সুরের নূপুর কাঁদে, কাঁদে গো
তোমার রাঙা পা জড়িয়ে॥

তোমার নয়ন যেদিন আমায় নতুন কথা কয় গো
নতুন কথা কয়,
সেদিন তোমার পায়ে আমার গানের
পুষ্পবৃষ্টি হয়।

সেদিন শ্রাবণধারার মতো
সুর ঝরে যায় অবিরত,
সেদিন তোমার স্মৃতি এসে
কাঁদায় আমায় ঘুম ভাঙিয়ে॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত। পরে শৈল দেবীর ভাই কুলেন্দু দাস গানটি রেকর্ড করেছিলেন। সুর : নজরুল]

৫৩

বনের মনের কথা ফুল হয়ে জাগে।
কয় না সে কথা তবু তারে ভালো লাগে॥

শ্যাম পল্লবে তনু ছেয়ে যায়,
ভরে ওঠে সুরভিত সুষমায়।
ফুটে ওঠে তার না-বলা বাণী
রক্তিম অনুরাগে॥

বন-মর্মরে সেই মৌনীর
শুনি মৃদু গুঞ্জন,
ললিতার মতো তার ভালবাসা
গভীর চির গোপন।

যত সে নিজেরে লুকাইতে চায়
তত মধু তার উছলিয়া যায়,
কত সে পলাশে কত সে অশোকে
কত কুঙ্কুম ফাগে॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫৪

তোমার গানের সুরটি প্রিয় বাজে আমার কানে।
মনের কথা সেদিন কিগো শুনিয়েছিলে গানে॥

তোমার করের বীণায় জাগে প্রাণ,
তাই মধুময় হয়ে ওঠে তোমার মধুর গান॥

দেবতা তাঁর সকল সুধা কণ্ঠে তব করেছিল দান,
তুমি যে-গান শোনাও মোরে, হয় না যেন সে-গান অবসান।

কোন্ কবি আজ তোমার কথা, লিখছে হায় তা কে জানে,
তোমার ও-গান না শুনিলে অশ্রুবারি হানে॥

[শৈল দেবী কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫৫

বরষার দিন তো হয়ে গেছে সারা
তবু কেন ঝরে বাদল।
বনের বেদের দল গেছে তো চলি
তবে ও–কে বাজায় মাদল॥

ও সই কৃষ্ণ তো গেছে কবে মথুরায়
কেন বৃন্দাবনে চাঁদ ওঠে হায়,
কেন আঁখিজলে ভেসে যায়
নয়ন–কাজল॥

আহা সাথীহারা রাধা পাগলিনী প্রায়,
নিদহারা প্রাণ তার বাঁশি শুনে ছুটে যায়।

ও কে গভীর রাতে যেন কিসের আশে।
ঘুরিয়া বেড়ায় সেই যমুনা পাশে।
দেখিতে না পায় মূরছিত বেদনায়
পড়িল রাধা ধরণীর তল॥

[গীতা বসু কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫৬

ফুলমালিনী ! এনেছ কি মালা।
এনেছ কি মালা, ভরি তনু ডালা॥

এনেছ পসারিণী নয়ন–পাতে
প্রেম সুধা–রস–মালারই সাথে
অধরের অনুরাগে রাঙা পেয়ালা
এনেছ কি মালা॥

এনেছ প্রীতির মালতী বকুল,
রসে টলমল রূপের মুকুল।

গাঁথো পরান মম, তব ফুলহারে,
মালার বিনিময়ে লহ আমারে।
বৃথা না যায় শুভ লগ্ন নিরালা
এনেছ কি মালা॥

[নীলমণি সিংহ কর্তৃক বেতার অনুষ্ঠানে গীত, সুর : নজরুল]

৫৭

ঝুলনের এই মধু লগনে।
মেঘ-দোলায় দোলে, দোলে রে,
বাদল গগনে॥

উদাসী বাঁশির সুরে ডাকে শ্যামরায়,
ব্রজের ঝিয়ারি আয়, পরি নীল শাড়ি আয়।
নীল কমল কুঁড়ি দোলায়ে শ্রবণে॥

বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী চিতচোর
অনুরাগে ডাকে আয় দুলিবি কে ঝুলনে॥

মেঘ-মৃদঙ বাজে, বাজে কী ছন্দে
রিম্‌ঝিম্ বারিধারা ঝরে আনন্দে।
বুঝি এল গোকুল ব্রজে নেমে
কৃষ্ণ রাখাল প্রেমে শুনি বাঁশি তায়
ফোটে হাসি গোপীজন আননে॥

[বিমলভূষণ কর্তৃক 'ঝুলন' অনুষ্ঠানে গীত। এই গানটির সঙ্গে 'মম বন-ভবনে ঝুলন দোলনা' গানটির গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সুর : নজরুল]

৫৮

ঐ নন্দন-নন্দিনী দুহিতা, চির-আনন্দিতা।
যেন প্রথম কবির প্রথম লেখা কবিতা॥

তব চরণের নূপুরধ্বনি,
মধুকর গুঞ্জন তোলে যে রণি।
মন মোর ভোলে হেরি তোমারে যে গো
ঐ যে যৌবনগর্বিতা॥

দোলায় দোদুল দুল তব নৃত্য,
আবেশে আকুল হয় মোর চিত্ত।

নৃত্যশেষে তব পায়ের নূপুর
গ্রহ তারকায় রয় আকাশের সুদূর।
সুরলোক উর্বশী তুমি যে আমার
রও চির–আনন্দিতা॥

[বিমলভূষণ কর্তৃক গীত, সুর : নজরুল]

৫৯

ঘন শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যয়
এ ভব সংসার মে।
প্রীত্‌কে ব্রজবাসী হুঁ ম্যয়
রস যমুনাকি কিনার মে॥

হির্‌দয়্‌ মে মোর নন্দলালা
গলেমে উন্‌হি কে নাম কি মালা,
উয়ো মোর্‌ সুন্দর চাঁদ উজিয়ালা
রাত্‌কে আঁধিয়ার মে॥

ধেনু চরত যাঁহা বেণু বাজত
কৃষ্ণ কানাইয়া সুমরন আওয়ত,
মদনমোহনকে বিছুয়ানা সুনত
পাঞ্জিকি ঝন্‌কার মে॥

[নীলমণি সিংহ কর্তৃক রেকর্ডে গীত, রেকর্ডটি বাতিল হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি। সুর : নজরুল]

৬০

তুম্‌হি মোহন চাঁদ কি জ্যোতি
মেরে হির্‌দয় গগন প্যরে।
বন্‌শি বাজে হির্‌দয় মাহি
প্রাণময় মেরে হরণ ক্যরে॥

রাস রচো মন মে মেরে
রহো রাধা কুন্‌জন্ ঘেরে,
জীবন মেরে সফল পিয়া
তুঁহারে চরণ পূজা না ক্যরে॥

মধুর হোয়ি মিলন রাতি
প্রেম কুসুম সেজ পো পিয়া,
শোওন্ করি শীতল তব
প্রেম্‌কে দ্যুতি মুরলিয়া।

সাগর নদী মিলন হোবে
চন্দ্র বিনা চকোর রোবে,
তুহারি মিলন হোবে মেরে
নয়ন নীর আরতি ক্যরে॥

[নীলমণি সিংহ কর্তৃক রেকর্ডে গীত, রেকর্ডটি বাতিল হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি। সুর : নজরুল]

৬১

বাতা দে রে যমুনাকে জল কাঁহা মেরে শ্যামল।
কোন্ বন্‌মে বাঁশরি বজায় রে উয়ো মেরে চঞ্চল॥

নন্দকে ভবন কাঁহা, খেলত গোপাল যাঁহা
রার করত কাঁহা উয়ো মেরে শ্যামল॥

ম্যয় পুছা ব্রজবাসীকো সব ম্যয় পুছা
কৃষ্ণ কাঁহা হোই,
শুন্‌তে হি সব্ রোনে ল্যগে বাত্ বলে কোই।

লেতা কৃষ্ণজিকে নাম, আয়া রো রো কে ইয়ে ব্রজধাম
হায় দরশন কি আশ্ কোন্ মিটায়ে
ক্যরে জীবন সফল্॥

[নীলমণি সিংহ কর্তৃক রেকর্ডে গীত, রেকর্ডটি বাতিল হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি, সুর : নজরুল]

৬২

পাপী তাপী সব্ তারলে
চলি হ্যয় কৃষ্ণ প্রেমকি নাইয়া।
ভঁওয়র নেহি আব ভব–সাগর্মে
খেওত কৃষ্ণ কানাইয়া।
চলি হ্যয় কৃষ্ণ প্রেম–কানাইয়া॥

কৃষ্ণ প্রেম্সে যাওয়ে উদাসী
সঙ্গ রাখ্লে নিত জগবাসী,
মিট্ জাওয়েগা লাক্ চৌরাশি
বনয়া কৃষ্ণ সেওইয়া।
চলি হ্যয় কৃষ্ণ প্রেম–কানাইয়া॥

একবার তু কৃষ্ণনাম লে
মধুর নাম সব জগকো লিখালে,
প্রেম নগরকি রাহ বানালে
কৃষ্ণ কে নাম লেওইয়া।
চলি হ্যয় কৃষ্ণ প্রেম–কানাইয়া॥

[এন ৯৯৬৪, শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী, অক্টোবর ১৯৩৭]

৬৩

যৌবনের বনে মোর
কোয়েলা মত মাচাও শোর্।

বিরহ দাহনে জ্ব'লে মরি
তু ভি য়োর্ সতানা ছোড়়॥

একা বিরহিনী ফাগুন তায়
ফুলেল বায়ে আগুন ছিটায়,
ডরতা হুঁ জ্ব্যলে না যায়
জ্ব্যলে হুয়ে য়্যে দিল্ তো ঔর॥

তোর গানে কোয়েলিয়া
প্রাণ কাঁদে কোথায় পিয়া,
খাবার কর্ কে চলা গিয়া
ফের্ না আয়া প্রীত–চোর্॥

[সূত্র : পাণ্ডুলিপি]

৬৪

প্রাণ চায় চোখে চাহিতে পারো না
ক্যায়সি য়্যে শরম তোমহারা।
পরিয়া বসন ফেলো গো খুলিয়া
জেয়সি উয়ো, আ কর্ পোকারা॥

পাতিয়া যতনে ফুলের শয্যা
ডাকিতে পারো না একি এ লজ্জা,
আঁখ ফেরা লেতা হেয় যব্ উয়ো
তব্ তু করতি হেয় ইশারা॥

সাধে সে যবে চরণে ধরে
কও না কথা শরমে মরে,
রোতে হো, চলে জানে কে বাদ
হায় তুঝে শরম সে মারা॥

[সূত্র : পাণ্ডুলিপি]

৬৫

পল্লু ছোড়ো সজন ঘর যানা রে
জরা নয়নো সে নয়না বিতানা রে॥

মাটি পড়ে সরাব সে পিনেসে গগরিয়া
সুবাহ হো গয়ি করুকা বাহানা রে॥

বড়া পেয়ার হ্যায় তুমসে পলঘট আনে কা—
জরা ধীরে সে বীন বাজানা রে॥

শাড়ি তেরি হ্যায় পল রঙ্গিন আঁখিয়া টুটেগা
জরা সিনে সে আঁচল হটানা রে॥

[জে. এন.জি. ৫২৩, মিস্ কানন, অক্টোবর ১৯৯৩, সুর : নজরুল]

৬৬

নেহি তোড়ো ইয়ে ফুলোঁ কী ডালি রে হা।
মালি ভোমরা বুলবুল তেরি গালি রে হা
যাও সওতন কে পাস শুনো ভিগা ভিগা বাত
ম্যায়তো হোনেকা চাহ্‌তি হুঁ প্রীত বিমার
আভি চাহ ফেকা যায়েগা কালীরে হা॥

হায়রা হায় বান্দা অব দালা যৌবন অভি
অভি ফুলো মে নেহি আয়ি হ্যায় সৌগন্ধ।
আভি গালো পে আয়ি নেহি লালী রে হা... ॥

নেহি আত্তকি অভি রাহাজানে পাও নেহি বাত
আভি ছোটি হ্যায় ফূলকলি কাচ্চা আনার
জবানসে মে অবতক্ হর যাতে॥

[রেকর্ড শুনে গানের বাণী উদ্ধার করা হয়েছে। সেজন্য দু–একটি শব্দ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল না। জে.এন.জি. ৫২৩, মিস্ কানন, অক্টোবর, ১৯৩৩, সুর : নজরুল]

৬৭

আজ প্রভাতে বাহির পথে
কে ডাকে কোন্ (সই) ইশারায়।
সিঁথিতে তার সিঁদুর মাখা
কে পরালে নিরালায়॥

ঘুম ভরা তার নয়ন দু'টি
ফুলেরি মতো উঠল ফুটি,
সুখের আভায় ঢেউ খেলে যায়
আজকে ধরার আঙিনায়॥

হাততালি দেয় গ্রামের বধূ
পল্লীপথের ধারে,
জলের পথে যাবার বেলায়
কূলের বধূ আড়ে।

লুট করে আজ তারার আলো
গহীন রাতে আঁধার কালো,
কে এলে আজ বধূর বেশে
আমার ঘরের কিনারায়॥

[আজহারউদ্দীন খানের তালিকা, জে.এন.জি. ৭৩, শিল্পী : নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী, গজল, সুর : নজরুল]

৬৮

একদা সব সুরাসুরের খেয়াল হলো দাদা।
সমুদ্রেরে ঘেঁটেঘুঁটে করতে হবে দধিকাদা॥

দেখেছ তো গয়লানিরা যে ভাবে দই মথে।
(তেমনি) সাগরকে সব ঘুঁটে ছিলেন মন্দার পর্বতে॥

(অর্থাৎ) মন্দার গিরি হয়েছিল দই ঘুঁটবার কাঠি।
আর কূর্ম হলেন সমুদ্ররূপ দই রাখবার বাটি॥

কাঠি এল বাটি এল দড়া কোথায় পান।
(সবে) বাসুকির শ্রী লেজুড় ধরে মারেন হেঁচকা টান॥

বাসুকি কয়ল্যাজ ছাড়ো বাপ গ্যাজ উঠল মুখে।
বাসুকিকে করল দড়া দেবতারা সব রুখে॥

ল্যাজ ধরল দেবতা, অসুর দানব ধরে মুড়ো।
সাগর বলে আস্তে বাবা একি প্রলয় হুড়ো॥

যা আছে মোর বের করছি—ঘাঁটিস্‌নে আর পেট।
উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্র লক্ষ্মী সব দিচ্ছি ভেট॥

(ক্রমে) অমৃত যেই উঠল অমনি লাগল গুঁতোগুঁতি।
দৈত্যেরা সব কোপ্‌নি আঁটে দেবতা কসেন ধুতি॥

মাঝে থেকে শ্রীবিষ্ণু মোহিনী রূপ ধরে।
ছোঁ মেরে সেই সুধার ভাণ্ড নিয়ে পড়লেন সরে॥

অমৃত খান দেবতারা সব অসুর মাটি চাটে।
(যেমন) দোহন শেষে দুগ্ধ খোঁজে বাছুর শুকনো বাটে॥

(ক্রমে) ঘটরঘটর ঘোঁটার ঠেলায় উঠল হলাহল।
ত্রাহি ত্রাহি বলে ত্রিলোক করে কোলাহল॥

বিষের জ্বালায় সৃষ্টি বুঝি পটল তোলে ওই।
সিদ্ধিখোর শ্রীপিশাচপতি কয় ডেকে মাভৈঃ॥

ছুটে এসে পাগ্‌লা ভাঙোড় এক সুমুদ্দুর বিষ।
ঢকঢকিয়ে ফেললে গিলে গা করে নিস্‌পিস্‌॥

বলদে যে বেড়ায় চড়ে ছাইপাঁশ গায়ে মাখে।
তাকে ছাড়া চতুর দেবতা বিষ দেবে বল কাকে॥

ফুলের মধ্যে ধুতরো নিলেন মশান যাহার ঘর।
(পোড়া) কপালে তার আগুন জ্বলে জয় ন্যাংটেশ্বর॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের পট-গান, সুর : নজরুল]

৬৯

ও সে বাঁশরি বাজায় হেলে-দুলে যায়
গোঠে শ্যামরায় নওল-কিশোর।
জোছনা পিয়াসে চাঁদ-মুখ পাশে
ঘোরে গোপিনীর নয়ন-চকোর॥

নীল-উৎপল ভ্রমে মধুকর
উড়ে চলে সাথে ছাড়ি সরোবর,
অঙ্গের গোপী-চন্দন বাস
লুটিয়া পালায় সমীর চোর॥

চরণ কমলে ভ্রমরের প্রায়
সোনার নূপুর গুঞ্জরিয়া যায়।

শ্যামেরে নবীন নীরদ ভাবিয়া
নাচিছে ময়ূর কলাপ মেলিয়া,
ঢেউ তুলে যেন চলে রূপের সায়র॥

[টুইন, নভেম্বর ১৯৩৪, এফ.টি. ৩৫৫০, শিল্পী : সমর রায়, রেকর্ড বুলেটিনে উল্লেখিত— 'সমরবাবু গীত-জাদুকর কবি নজরুল ইসলামের দু'খানি গান গেয়েছেন।']

৭০

কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে এল বনবাসী
(এল) এ কোন্ বনবাসী।
হাতে বাঁশের বাঁশি তাহার মুখে কুটিল হাসি
(এল) এ কোন্ বনবাসী॥

চঞ্চলতার দোলা দিয়ে
দিল ব্রজের ঘুম ভাঙিয়ে,
উঠ্‌ল নেচে ঝিলমিলিয়ে যমুনার জলরাশি॥

এ বুঝি গো বেদের কুমার তাই সে কালি-দহে,
নাগের ফণায় চরণ রেখে হেসে চেয়ে রহে।

সে একলা বসে কদম শাখে
বাঁশির সুরে যেম্‌নি ডাকে,
নরনারী সব ছুটে এসে চরণে হয় দাসী॥

[এফ.টি. ১২৪৫০, রাখালি গান, শিল্পী : কুঞ্জলাল সিংহ, সুর : সুবল দাশগুপ্ত, বুলেটিনে এভাবে উল্লেখিত—'কথা : কবি কাজী নজরুল ইসলাম'। জুলাই ১৯৩৮]

৭১

মালার ডোরে বেঁধো না গো বাহুর ডোরে বাঁধো।
কাঁদোই যদি, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো॥

তোমার পূজার আসন হতে
দেবতা বলে সেধো না গো, প্রিয় বলে সাধো॥

পূজারিণী, জাগো জাগো হৃদয় দুয়ার খোলো
নিবেদনের ফুলে বরণ–মালা গেঁথে তোলো॥

[এইচ.এম.ভি. কোম্পানির সঙ্গে কবির ২১–১২–১৯৩৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের গান। নভেম্বর ১৯৩৫, শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন, এন ৭৪৩৩]

৭২

ফুল ভরা গুলবাগে ঐ গাহে বুলবুল,
গানে জাগে হিল্লোল, প্রাণে জাগে হিন্দোল
মনের মাধবী বনে জাগিল মুকুল॥

হিয়ায় গোপন রাগে
রঙিন স্বপন জাগে,
ঢলঢল অনুরাগে আঁখি ঢুলঢুল॥

ঝলমল (২) রূপে ও রসে,
অধীর হিয়া অস্থির, রহে না বশে।

পাপিয়ার কলগানে
কোকিলের কুহু তানে
যৌবন মৌবনে হলো দিল্ মশ্‌গুল॥

[সূত্র : বিমলভূষণ]

৭৩

ভক্তিভরে পড়রে তোরা কলমা শাহাদত।
আরশ হতে আনলেন নবী বেহেশতি দাওয়াত
এই কলমা শাহাদত॥

পাপে তাপে আছিস্ ডুবে একবার বল ভুলে
কলমা শাহাদতের বাণী অমনি উঠবি কূলে,
নিভবে দোজখের আগুন, পাবি শাফায়ৎ॥

'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র তাবিজ বেঁধে হাতে
চল্‌রে পথে, দেখবি আছেন নবীজী তোর সাথে,
(তোর) ইহলোকের পরলোকের মিট্‌বে রে হসরত্॥

[এন. ৯৮০৬, শিল্পী : সাকিনা বেগম, রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—'কাজী নজরুল', নভেম্বর ১৯৩৫]

৭৪

মুকুর লয়ে কে গো বসি
হেরিছে আপন ম্লান মুখ শশী॥

সখিরা ডাকে বেলা বয়ে যায়
দোপাটির ফুল ঝুরে অঙিনায়,
ধূলাতে লুটায় কাঁখের কলসী॥

হেরিয়া তারি অলস ছবি
ডুবিতে নারে সাঁঝের রবি।

কমল কলি ল'য়ে আঁচলে
ডাকিছে তারে গাঁয়ের সরসী ॥

[কবির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি—'কাফেলা', জ্যৈষ্ঠ-১৩৮৯]

৭৫

যে-অঙ্গুলিতে রঙ গুলিয়াছ এত কুঙ্কুম ফাগ,
আমার বক্ষে লাগিবে কখন সেই আঙুলের দাগ ॥

যে-রঙ ছড়াও অশোকে পলাশে
যে-আবির মাখো উদাস আকাশে
ফাগুন বাতাসে গো—
আমার নয়নে পড়িবে কখন সেই রঙের পরাগ ॥

যে-রঙের লোভে শ্যাম তব পায়ে আল্‌তা হতে চায়,
তব শ্রীচরণ ধুয়ে সেই রঙ ঢেলে দাও মোর গায়।

তুমি যে-প্রেমের রঙে রাঙিয়া কিশোরী
পৃথিবীতে আনো হোরির লহরী
হরি-প্রেম-হোরী
হে কৃষ্ণা প্রিয়া ! কবে দেবে মোরে সেই প্রেম-অনুরাগ ॥

[সূত্র : কবির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, 'কাফেলা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮]

৭৬

রিক্ত করিয়া ভিখারী করিলে তাই তো পূর্ণ আমি।
জগৎ ঘুরালে তাই তো তোমারে পাইনি জগৎস্বামী ॥

সব কেড়ে নিয়ে আপনারে দিলে
ভবন ভাঙিয়া ভুবনে মিলিলে,

প্রদীপ নিভায়ে ধ্রুবজ্যোতি হও
সাথের দিবাযামী ॥

[২৫-৫-৯২ তারিখে নজরুল জন্মদিবস উপলক্ষে বিমলভূষণ কর্তৃক গীত]

৭৭
মডার্ন

হৃদয় চুরি করতে এসে পড়ল ধরা চোর।
বন্দি থাক এই হৃদয়ে এবার জীবন তোর ॥
মনের দুয়ার ভেঙে এবার
পালিয়ে যেতে পারবে না আর,
প্রহরী যে পলক-হারা নয়ন দুটি মোর ॥

হে চোরের রাজা ! করলে চুরি ত্রিভুবনের মন,
এনেছি তাই তোমার সাজার বিপুল আয়োজন।

আকুল কুন্তল দিয়ে
রইনু তোমার পা জড়িয়ে,
(তোমায়) নিঠুর হাতে শিকলি দিলাম
(আমার) গলার ফুল-ডোর ॥

[সূত্র : 'কাফেলা', শ্রাবণ ১৩৯২]

৭৮

নিশীথ জাগিয়া সে কি মোর গান শোনে।
যে-গান ভাসিয়া যায় আজি নিশি-পবনে ॥

বলাকা মালার মতো আকাশের কোলে
আমার গানের কথা দোলে দোলে,
(তারা) যেতে যেতে হায় ছায়া ফেলিয়া কি যায়
তার মন-বাতায়নে ॥

(মোর) কুণ্ঠিতা বাণী সুরের গুণ্ঠনে
শিহরায় আবেশে,
শুনিয়া আমার গান আমার চেয়ে কি গো
মোর কথা ভাবে সে।

আমার সংগীত–ইঙ্গিতে তাহারে
আনিবে না কি মোর পথের ধারে,
সুমুখে যে কথা তায় বলিতে পারি না হায়
গানের আড়ালে তাই জানাই গোপনে॥

[সূত্র : 'কাফেলা', আষাঢ় ১৩৯২]

৭৯
মডার্ন

(এখনো) দোলনচাঁপার বনে কুহু পাপিয়া।
প্রিয়া তব নাম ল'য়ে ওঠে ডাকিয়া
কুহু পাপিয়া॥

আজিও তোমার কথা
ভোলেনি বনের লতা,
জড়ায়ে তরুমূলে ছড়ায়ে পথে ফুল
ওঠে কাঁদিয়া॥

[পাণ্ডুলিপি : 'কাফেলা', কার্তিক ১৩৮৮]

৮০

তুমি বিদেশ যাইও না বন্ধু আঁধার করে পুরী।
আমি দিন গোঁয়াতে পারব না আর একলা ঘরে ঝুরি॥

নদীতে মাছ আছে আজো ফসল ফলে মাঠে।
থাকলে তুমি কাছে দুখের দিনও হেসে কাটে,
আমি রূপার বাজু চাই না বন্ধু দিও কাচের চুড়ি॥

বন্ধু কে দেখবে ঢাকাই শাড়ি (যদি) রহ বিদেশ যেয়ে
বন্ধু বিনা প্রাণ কি জুড়ায় সোনা রূপা পেয়ে,
নারীর যৌবন বনের পাখী বনে যাবে উড়ি॥

বাণিজ্যে কে যায় রে সাধু ঘরে নারী রেখে
আঁচল দিয়ে রাখব কত বুকের আগুন ঢেকে,
বিয়া হইয়াও হায়রে আমি রইলাম আইবুড়ি॥

[সূত্র : 'কাফেলা', ভাদ্র ১৩৮৯]

৮১

ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরণী
কে আসে গো।
বলাকার রঙ পালক কুড়ায়ে
বাহি ছায়া-পথ-সরণী
কে আসে গো॥

দলি শাপলা শালুক শতদল
আসে রাঙায়ে কাহার পদতল,
(নীল) লাবণি ঝরায়ে ঢলঢল
ভরাইয়া সারা ধরণী
কে আসে গো॥

মৃদু মধুর মধুর হাসিয়া
সমীরণ সম ভাসিয়া
আসে কারে ভালোবাসিয়া
বলো কার মনোহরণী
কে আসে গো॥

[সূত্র : বিমলভূষণ, তুলনীয় : 'এসো শারদ প্রাতের পথিক']

৮২

আজি নাচে নটরাজ একী ছন্দে ছন্দে
কী আজি কী সুখাভাসে
মৃদু মৃদু মধু হাসে
কে জানে মাতিল কোন্ আনন্দে॥

ধুতুরা খুলিয়া ফেলি
পরেছে চম্পা বেলি
অপরূপ রূপ হেরি সবে বন্দে॥

সুরধুনী গঙ্গে তরল তরঙ্গে
ছন্দে তুলিল ধ্বনি তরঙ্গরঙ্গে।

উমারে লইয়া বুকে
মহাকাল দোলে সুখে
রবি–শশী–গ্রহ–তারা অভিবন্দে॥

[সূত্র : বিমলভূষণ]

৮৩

ও ভাই হাজি ! কোন্ কাবা–ঘর হজ্ করিয়া এলে ?
গিয়ে কি ভাই খোদায় পাওয়ার পথের দিশা পেলে ? ?

খোদার ঘরের দিদার পেয়ে বলো কেমন করে
ফিরে এলে দুনিয়াদারির এই না–পাক ঘরে,
কেউ বলেছে কি, কোন্ কাবাতে গেলে খোদায় মেলে ? ?

খেলেছিলেন নবীজী যে মক্কা মদিনায়
বেহোঁশ হয়ে পড়োনি কি পৌঁছিয়া সেথায় ?
কেমন করে ফিরে এলে সেই মদিনা ফেলে॥

এনেছ কি আব্–হায়াতের পানি, দিতে পারো ?
মোর আঁধার ঘরে দিতে পারো নূরের চেরাগ জ্বেলে ? ?

[সূত্র : মেগাফোন, জুন ১৯৪০, বুলেটিনে মুদ্রিত, সুর : নজরুল]

৮৪

করিও ক্ষমা হে খোদা আমি গুনাহ্‌গার অসহায়।
কাজের মাঝে অবসর পাই না ডাকিতে তোমায়॥

যতবার তোমারে পথে হে খোদা যেতে চেয়েছি
বাহির ভিতর হতে হাজারো বাধা পেয়েছি,
তোমার পথের দুশমন ঘরে বাহিরে দুনিয়ায়॥

দুখ-শোক-ব্যাধির তাড়নায় শুনিয়াও শুনিনি আজান,
বান্দার সে-অপরাধ করিও ক্ষমা হে রহমান।

আমি যে কাঙাল ভিখারি পুণ্যের পুঁজি নাহি
শূন্য হাতে আমারে ফিরায়ো না হে ইলাহী,
কোরো না নিরাশ যদিও শরণ যাচি অবেলায়॥

[সূত্র : বুলেটিন, মেগাফোন, জুন ১৯৪০, সুর : নজরুল]

৮৫

জাগো ভূপতি শুভ্র জ্যোতি নবপ্রাণপ্রবুদ্ধ
পুণ্যস্নান শুদ্ধ।
বিশ্ব সাথে যুক্ত করো, গ্লানি হতে মুক্ত করো
চিত্ত মোহমুগ্ধ
স্নিগ্ধস্নাত নব প্রভাত সূর্যসম জাগো
ধৌতপাপ কলুষতাপ, হে নিরুপম জাগো,
যজ্ঞভূমে নবজনম লভো, হে ক্লেশক্ষুব্ধ॥

ধূমের ঊর্ধ্বে জাগো দিব্যদ্যুতি
হোমবহ্নি শিখায় দাও আত্মাহুতি,
হে ভারতত্রাতা, জনগণবিধাতা
জাগো দৈন্যকারারুদ্ধ॥

[মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রচিত 'চক্রব্যূহ' নাটকের গান, সুর : নজরুল ইসলাম]

৮৬

গাও দেহ–মন শুক–শারী
গাওরে ব্রজের নরনারী
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

গাও তারি নাম যমুনার বারি,
গাও কুহু কেকা ধেনু বনচারী।
গাওরে সজল শ্যামল গগন,
কদম্ব–তরু তমাল কানন।
গাওরে ভ্রমর মাধবীলতা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

[‘চক্রব্যূহ’ নাটকের গান]

৮৭

কালিন্দী নদীর ধারে ডাকছে বালি–হাঁস গো, ডাকছে বালি–হাঁস।
মানিকজোড়ের ঝুমকো পরে হাসছে লো আকাশ॥

চল জল আনিতে চল লো জল আনিতে চল।
শালের বনে ময়না শালিক ডাকে
বউঝিরা সব কলসি নিয়ে কাঁকে
জল আনতে চল লো
দেখ লো পথ চেয়ে আছে পথের দুর্বো ঘাস॥

বাবলা বনে ফুল ফুটেছে ওই
বলছে পাহাড়তলির মেয়েরা কই,
মহুয়াবনে নিশাস ফেলে ভোরের বাতাস লো, ভোরের বাতাস॥

[‘কালিন্দী’ নাটকের গান। সূত্র : ‘দেশ’, ১২.৬.৯৯ সংখ্যা, ‘নজরুলের হারিয়ে–যাওয়া গান’, দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়]

৮৮

ও রাঙাবাবু !
তুই ডাঁশা ডালিম দানা
পলাশফুল।
তোকে বুকে নিয়ে কাঁদব
এলোখোঁপায় বাঁধব, করব কানের দুল॥

তুই ফাগুনের ফুল, তুই আগুনের ফুলকি
তুই আকাশের চাঁদ রে, চন্দনের উল্‌কি
তুই কেষ্টচূড়া রঙে রসে ভরা
তুই রথের ঠাকুর, মোরা পথের বাউল॥

[‘কালিন্দী নাটকের গান, সূত্র : ‘দেশ’, ১২.৬.৯৯ সংখ্যা, ‘নজরুলের হারিয়ে-যাওয়া গান’, দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়]

৮৯

কোন্ সাপিনীর নিশাসে আশার বাতি মোর
নিভে যায়
মোর প্রথম প্রেমের ফুল ফুটিতে দিল না
কীটে কাটিল হায়॥

মোর অন্ধ আঁখি যেন কত সাধে
দেখেছিল প্রথম সুন্দর চাঁদে,
ডুবে গেল সে চাঁদ, হতভাগিনী কাঁদ
ঝরা দোপাটি ফুলের মতো আঙিনায়॥

কেন কাছে ডেকে ভরা জলের কলসি
ভাঙিয়া নিল বিদায়॥

[‘কালিন্দী’ নাটকের গান, সূত্র : ‘দেশ’; ১২.৬.৯৯ সংখ্যা , ‘নজরুলের হারিয়ে-যাওয়া গান’, দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়]

৯০
(নর্তকীদের গীত)

ঢালো মদিরা মধু ঢালো (ঢালো আরো)।
মদ রঞ্জিত হোক্ পান্‌সে চাঁদের আলো।।

সারা দিনমান গেল বিফল কাজে
জাগে হৃদয়ে আনন্দ তৃষ্ণা সাঁঝে,
চাহে পরান বিধুর সুরা আর সুর,
আর অনুরাগ-রাঙা দু'টি নয়ন কালো।।

['দেবী দুর্গা' নাটকের গান]

৯১
(ঋষি কুমারীগণের আবৃত্তি নৃত্যসহ গীত)

পরমা প্রকৃতি দুর্গে শিবে,
গৌরী নারায়ণী লহো প্রণতি।
লহো মা আনন্দে নৃত্যের ছন্দে
উদার বন্দনা সন্ধ্যা আরতি।।

ঝরনাধারায় নদী সিন্ধুতরঙ্গে
মৃদঙ্গ বাজে নিতি মধুর বিভঙ্গে,
অসীম অম্বর মন্দিরতলে—
জ্বলে রবি চন্দে আরতি দীপ-জ্যোতি।।

প্রসীদ শরণাগত দীন-তারিণী,
চির-মঙ্গলময়ী দুর্গতিহারিণী
জয় মহাকালী, জয় মহালক্ষ্মী,
জয় চণ্ডিকে মহাসরস্বতী।।

['দেবী দুর্গা' নাটকের গান]

৯২

(মায়াকন্যাগণের গীত)

আয় ঘুম আয়
সাপিনীর দংশনে যেমন অবশ তনু
তেমনি ঢলিয়া পড়ো মায়া নিদ্রায়॥

সংসার–অহিফেন বিষ পিয়ে হায়
যেমন অচেতন জীব অসাড়ে ঘুমায়,
যেমন পাতাল তলে ঘুমায় দৈত্যদলে
তেমনি ঘুমাও জড় পাষাণের প্রায়॥

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

৯৩

(জন্মান্ধ রাজকন্যা মিত্রবিন্দ্যার সখিগণের গীত)

সই, চাঁদ কত দূরে?
ফাল্গুন সন্ধ্যার রজনীগন্ধাসম
পথ চেয়ে রই, আঁখি ঝুরে॥

সন্ধ্যামালতীর কলি
ফুটিতে গিয়া নিরাশায় পড়িয়াছি ঢলি,
বাজিয়া শ্রান্ত হয়ে থামিয়াছে সুর ভ্রমর নূপুরে॥

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

৯৪

জাগো দেবীদুর্গা চণ্ডিকা মহাকালি,
মধুকৈটভ মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশিনী
প্রলয়ঙ্করী করালি॥

ভারত শ্মশানে শবের মাঝে শিব জাগাও
তাথৈ তাথৈ নৃত্যে পাষাণের ঘুম ভাঙাও,
রক্তরাগে মাগো দশদিক রাঙাও রাঙাও
দৈত্য কারাগারে আগুন জ্বালি (কালি)॥

যুগে যুগে তুমি আসি দৈত্য ভীতি বিনাশি
সন্তানে দিয়াছ অভয় করুণা প্রকাশি,
আবার ধরণীতে হও অবতীর্ণা শ্রীচণ্ডী
বরাভয় শিবশক্তি নৃমুণ্ডমালী॥

['দেবী দুর্গা' নাটকের গান]

৯৫

লহো লহো লহো মোহিনী মায়া আবরণ।
মায়া সুন্দর এই নাও আভরণ॥

ব্যর্থ জীবন কার অর্থ বিনে
সংসারে লাঞ্ছিত অভাবে ঋণে,
লহো মোহ মদিরা কাম-কাঞ্চন॥

ষড়ৈশ্বর্য এই ষড় রিপু লহো গো
মায়ার খেলাঘরে এসো সুখী হও,
যশখ্যাতি লও যাহা প্রয়োজন॥

['দেবী দুর্গা' নাটকের গান]

৯৬
(মায়ার গীত)

ভালোবাসি কলঙ্কী চাঁদ মেঘের পাশে।
(মোর) ফুল আরো ভালো লাগে
ভ্রমর সে-ফুলে যদি আসে॥

ভালোবাসি নিঝুম রাতি
যদি রহে সুন্দর সাথী,
সেই সুন্দর সাথী প্রিয়তম হয়
(যবে) চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রণয় পিয়াসে॥

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

৯৭

(কিরাত ও কিরাত-রমণীগণের নৃত্যসহ গীত)

মহুয়া মদ খেয়ে যেন বুনো মেয়ে
(চৈতি রাতে লো) নিশির চাঁদ ঢুলে আবেশে।
নিশুতি রাতি পেল তাহার চাঁদ গো
আমার চাঁদ কেন বিদেশে॥

সখি, বাঁশি বাজে দূরে পাহাড়ে
যত নেশা বাড়ে তত মনে পড়ে লো তাহারে।
আমার এলোখোঁপায় দিবে দোপাটি ফুল কবে সে এসে॥

বুনো হরিণ চেয়ে আছে ঝর্নাতীরে
সে অমনি করে চাইত ফিরে ফিরে।
সে মাদল বাজাবে কবে আদুল গায়ে
আবার সখি আমার গা ঘেঁসে॥

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

৯৮

(ধরিত্রীর প্রবেশ ও গীত)

নিপীড়িতা পৃথিবীকে করো করো ত্রাণ
অসুর সংহারী হে ভগবান॥

দৈত্য অত্যাচারে সন্তান তার
অন্ন বস্ত্রহীন করে হাহাকার,
নিরস্ত্র নির্জিত শৃঙ্খল পায়
পাষাণ কারাগারে কাঁদে হতমান॥

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

৯৯
(মায়ার নৃত্য-গীত)

একাকিনী বিরহিণী জাগি আধো রাতে,
বঁধু নাহি পাশে, নিদ নাহি আসে
কণ্টক ফোটে হায় ফুল-বিছানায়॥

আবার ফুটিবে ফুল উঠিবে চাঁদ
আমারি মনের হায় মিটিল না সাধ,
যামিনীর ফুল যেন এ রূপ-যৌবন
নিশীথে ফুটিয়া লাজে ঝরে যায় প্রাতে।

[‘দেবী দুর্গা’ নাটকের গান]

১০০
(বেতালিকের প্রবেশ ও গীত)

এ দুর্দিন রবে না তোর আসবে শুভদিন
নতুন আশায় বুক বাঁধ রে অন্ন-বস্ত্রহীন॥

রাত পোহাবে, এই আঁধারে রইবি না তুই ডুবে
আশার সূর্য উঠবে আবার পুবে,
তুই সাহস ক'রে উঠে দাঁড়া, হবে দুঃখের আয়ু ক্ষীণ॥

ধর্ম জাগেন মাথার উপর, অসীম আকাশতলে,
আজো তাহার চাঁদ সুরযের রুদ্র আঁখি জ্বলে।

এই সুখে রাখা দুঃখ দেওয়া যাহার হাতের খেলা
তুই ধর দেখি রে তাহার চরণ-ভেলা,
তুই দেখ্‌বি সেদিন রইবি না আর এমন পরাধীন ॥

['দেবী দুর্গা' নাটকের গান]

১০১

জয় উমানাথ শিব মহেশ্বর।
চির ভোলা আশুতোষ স্বয়ম্ভু শঙ্কর ॥

তুমি ভগবান জীব কল্যাণ লাগি
শ্মশানে রহ শিবলোক তেয়াগি,
বিশ্বেশ্বর হয়ে তুমি বৈরাগী
হে মহাভিক্ষু দিগম্বর ॥

স্বর্গের দেবতারে অমৃত দিয়া
তুমি নাচো আনন্দে গরল পিয়া,
ধুতুরার ফুল শিঙ্গা ডমরু নিয়া
ভস্ম মাখিয়া রহো গঙ্গাধর ॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০২

রতি : বিশ্বে কামনার আগুন লাগাব
মদন ভস্ম ছড়াব মনে মনে ;
মৃত মদনে প্রতি ভবনে জাগাব ॥

বসন্ত : সিদ্ধ যোগীর ধ্যানে আমি হব প্রতিকূল
ফোটাব তপোবনে বাসনা মুকুল।
উভয়ে : সন্ন্যাসীরে মোরা করিব ভোগী
লোভ মোহ মদে নিখিল রাঙাব ॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৩

(দেবমোহিনীগণের গান)

হে তরুণ ! কেন এই অকরুণ খেলা।
মদালস রসঘন এস নব যৌবন
প্রথম প্রেমের কুঁড়ি ফুটিবার বেলা॥

কেন এই কঠিন তপস্যা মগ্ন,
এই বসন্ত-সেনা ফিরে আর আসিবে না
(ওগো) নবীন যোগী, তারে করিও না হেলা॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৪

অশিব শক্তি হতে হে শঙ্কর
অষ্টসিদ্ধিরে করো ত্রাণ—ত্রাণ করো শঙ্কর॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৫

(দেবকন্যাগণের বারাণসী গান)

জয় মুক্তি-দাত্রী কাশী বারাণসী।
নিত্য দেবাদিদেব শিব শোভিতা
বেষ্টিতা বরুণা-অসি॥

তব পুণ্যে মর্ত হলো স্বর্গভূমি
সকল তীর্থের তীর্থ তুমি,
যোগী ঋষি বাঞ্ছিতা ত্রিলোক পূজিতা
বিভূষিতা ত্রিশূল অর্দ্ধশশী॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৬
(নর্তকীগণের নৃত্যসহ গান)

চিরদিন পূজা নিয়েছ দেবতা
এবার মোদের পূজিতে হবে।
বৃথাই কেঁদেছি বৃথাই সেধেছি
সহেছি দুঃখ-শোক নীরবে॥

টলেনি পাষাণ বলোনি কথা
কাঁদিয়েছ চিরকাল নিঠুর দেবতা
কাঁদিতে হবে আজ আমাদের ঘরে
সে-পূজার ঋণ শুধিবে এ ভবে॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৭
(কেশবের গান)

সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাতা !
পূজব তোমায় সবার আগে
দিয়ে দূর্বা আর বেলপাতা॥

জীবের তরে তোমার ত্যাগ দেখে অবাক হই
জীবের দুখে তুমিই দুখি, তোমা বিনে গতি কই,
সিদ্ধি দিতে একাই তুমি—জনগণের নেতা
তুমি সিদ্ধিদাতা॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৮
(অবগুণ্ঠনে ঢাকা রতির সনৃত্য গান)

চঞ্চল মলয় হাওয়া শোনো শোনো মিনতি।
গুণ্ঠন খুলো না মোর, আমি নব-যুবতী॥

অঙ্গে জাগেনি যার আজিও অনঙ্গ
অসময়ে কেন তার করো রসভঙ্গ,
লুকায় মুকুল হেরো পাতার আঁচলে
ভোমরার ভয়ে ভীরু বন–মালতী॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১০৯

আমি বুকের ভিতরে থাকি
তবু ওরা ডাকে 'দেখা দাও' বলে।
(ওরা) চিনিতে পারে না কত রূপে আমি
দেখা দিই কত ছলে॥

চোর চোর খেলি মনে বসে
ওরা বনে যায় খুঁজিতে,
কোলে থাকি আমি খোকা হয়ে
ওরা মন্দিরে যায় পূজিতে।
(মোরে) পাষাণ করিয়া ফেলে রাখে
ওরা আঁধার দেউলতলে।
(ওরা ডাকিয়া লয় না কোলে গো
আমি কোল যে বড় ভালোবাসি)
কেশবে ডাকিয়া লয় না কোলে॥

(ওরা) দেবতা ভাবিয়া পূজা দেয় যাহা
আমি তাহা নাহি খাই।
লুকায়ে ভিখারি সাজিয়া
ওদের পাতের অন্ন চাই।
(ওরা) প্রভু বলে মোরে দূরে রাখে
তাই কেঁদে দূরে যাই চলে।
(ওরা গোপাল বলিয়া ডাকে না মোরে
কেন বুকে বেঁধে রাখে না)
আমি তাই দূরে যাই চলে
কেশবে ডাকিয়া লয় না কোলে॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১১০

('বসন্তে'র গান)

মহাদেবী উমারে আজি সাজাব হর-রমা সাজে।
মহামায়ার বুকে তাঁরি মায়ার শর দেখব কেমন বাজে॥

হরমোহিনী বিনা এই ত্রিদিবে
কে ভোলাবে দেবাদিদেব শিবে
শিব হলে অচেতন পুন জাগিবে মদন,
চলিবে নিলাজ কামনা-লীলা বিশ্ব মাঝে॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১১১

(যক্ষকন্যাগণের গান)

ওঁ শঙ্কর হর হর শিব সুন্দর
কোটি ভাস্কর জ্যোতি শূলপাণি নটবর।
রজত গিরিনিভ কান্তি মনোহর
জটাভূষণ ত্রিনয়ন শশী শেখর
বাঘাম্বর যোগীন্দ্র ডমরুধর
প্রসীদ আশুতোষ রুদ্র মহেশ্বর॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১১২

(যক্ষকন্যাগণের গান)

হে দেব অতিথি ! এসো অলোকনন্দার তীরে
জুড়াও শ্রান্ত তনু (জুড়াও)
চন্দন সুবাসিত দখিনা সমীরে॥

সুরা লও, মধু লও যার যাহা সাধ
বিহঙ্গ সংগীত চৈতালি চাঁদ,

লহো ভীরু কুমারীর আঁখির প্রসাদ
অঙ্গ রাঙ্গাও অনুরাগ আবীরে ॥

লহ সেই ফুল যাহে বসেনি ভ্রমর
চাহ যদি ফুল ফেলে লহ ফুলশর,
নিঙাড়িয়া রক্তিম নিটোল অধর
করো রস–পান বাহুবন্ধনে ঘিরে ॥

['অন্নপূর্ণা' নাটকের গান]

১১৩

এসো এসো বন–ঝরনা উচ্ছল–চল–চরণা।
সর্পিল ভঙ্গে লুটায়ে তরঙ্গে ফেন–শুভ্র–ওড়না ॥

পাষাণ জাগায়ে এসো নির্ঝরিণী
এসো প্রাণ–চঞ্চলা জল–হরিণী,
মরু তৃষিতের বুকে ঢালো ধারা–জল শ্যাম–মেঘ–বরণা ॥

এসো বুনো পথ বেয়ে অকারণ গান গেয়ে,
গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভেঙে ভয়হীন পাহাড়ি মেয়ে।
নৃত্যপরা পায়ে ছন্দ আনো
আনন্দ আনো মৃত–প্রাণ জাগানো,
অনাবিল হাসির ঝরা ফুল ছড়ায়ে এসো মঞ্জুলা মনোহরণা ॥

['হরপার্বতী' নাটকের গান]

১১৪

(ঝর্না ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বৈত গান)

ঝর্না : আমি চাই পৃথিবীর ফুল
ছায়া–ঢাকা ঘরে খেলা।

ব্রহ্মপুত্র : আমি চাই দূর আকাশের তারা
সাগরে ভাসাতে ভেলা ॥

ঝর্না : আমি চাই আয়ু, চাই আলো প্রাণ
ব্রহ্মপুত্র : মরণের মাঝে মোর অভিযান,
উভয়ে : মোরা একটি বৃন্তে যেন দুটি ফুল প্রেম আর অবহেলা ॥

ব্রহ্মপুত্র : আমি বাহির ভুবনে ছুটে যেত চাই উদাসীন সন্ন্যাসী,
ঝর্না : হে উদাসীন ! তব তপোবনে তাই উর্বশী হয়ে আসি।
ব্রহ্মপুত্র : মোর ধ্বংসের মাঝে উল্লাস জাগে
ঝর্না : তাই বাঁধি নিতি নব অনুরাগে,
উভয়ে : মোরা চিরদিন খেলি এই খেলা
গড়ে তোলা ভেঙে ফেলা ॥

['হরপার্বতী' নাটকের গান]

১১৮

(অলকার গান)

আয় আয় যুবতী তন্বী,
জ্বালো জ্বালো লালসার বহ্নি।

হানো হানো হানো নয়ন-বাণ,
তনুর পেয়ালা ভরি মদিরা আন্।

['হরপার্বতী' নাটকের গান]

১১৯

ভুবনে কামনার আগুন লাগাব।
রিক্ত কাননে ফাগুন জাগাব ॥

বিলাস লাস্যের নৃত্যে
আনিব অনুরাগ বৈরাগী চিত্তে,

যৌবন–তরঙ্গে দুলাব রঙ্গে
ধ্যানী যোগীর ধ্যান ভাঙাব ॥

মদ আলসে, রস লালসে
জাগে যে মুকুল প্রথম বয়সে,
তাহারি পরিমল পরাগ ফাগে পথধূলি রাঙাব ॥

[‘হরপার্বতী’ নাটকের গান]

১১৯
(রতির গান)

পুষ্পিত মোর তনুর কাননে হায়
ওগো ফুলধনু, লগ্ন যে বয়ে যায় ॥

আজি ফাগুন ঋতু–উৎসবে
এ দেহ–দেউল শূন্য কি রবে,
রতির আরতি ধূপ কি পুড়িবে
বিফল কামনায় ॥

[‘হরপার্বতী’ নাটকের গান]

১২১
(বাসন্তী সখিদের গান)

চলো জয়যাত্রায় চলো বাসন্তী বাহিনী।
চলো রচিতে বুকে বুকে নব প্রেমকাহিনী ॥

যথা উদাসীন পুরুষ তপস্যামগ্ন
যার বাসনা ফুরায় মরমে—চলো তার তপোবনে
চল–কামনার কামিনী ॥

[‘হরপার্বতী’ নাটকের গান]

১২৪
(কন্দর্পের গান)

দু'হাতে ফুল ছড়ায়ে মন রাঙায়ে ধরায় আসি।
প্রথম যৌবনেরই ঘুম ভাঙায়ে বাজাই বাঁশি॥

আমি কই, দেখ রে চেয়ে, নেই রে জবা
আজিও চির-নূতন সেই পুরাতন বসুন্ধরা,
মাধবী চাঁদের চোখে আঁকা আজো বাঁকা হাসি॥

ফুটাই আশার কোলে শুকনো ডালে
অবসাদ আসে যবে সাধ ফুরালে,
আমি কই, এই তো সুরাপাত্র-পুরা রসপিয়াসী॥

[‘হরপার্বতী’ নাটকের গান]

১২৩

কত যুগ যেন দেখিনি তোমারে
দেখি নাই কতদিন।
তুমি যে জীবন তোমারে না হেরি
হয়েছিনু প্রাণহীন॥

তুমি যেন বায়ু, বায়ু যবে নাহি বয়,
আমি ঢুলে পড়ি, আয়ু মোর নাহি রয়
তুমি যেন জল, বাঁচিতে পারি না
জল বিনা আমি মীন॥

তুমি জানো না গো তব আশ্রয় বিনা
আমি কত অসহায়,
তুমি না ধরিলে আমার এ তনু
বাতাসে মিশায়ে যায়।

তাই মোর দেহ পাগলের প্রায়
তোমার অঙ্গ জড়াইতে চায়,

তাই উপবাসী তনু মোর হেরো
দিনে দিনে হয় ক্ষীণ্॥

[সূত্র : 'কাফেলা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯]

১২৪

আমি মা বলে যত ডেকেছি
সে-ডাক নূপুর হয়েছে ও-রাঙা পায়।
মোর শত জনমের মতো নিবেদন
চরণ জড়ায়ে কহিয়া যায়॥

মাগো তোরে নাহি পেয়ে লোকে লোকে
যত অশ্রু ঝরেছে মোর চোখে,
সেই আঁখি-জল জবা ফুল হয়ে
শোভা পেতে ঐ চরণ চায়॥

মাগো কত অপরাধ করেছিনু বুঝি
সংহার করে সে-অপরাধ,
বল্ লীলাময়ী মিটেছে কি তোর
মুণ্ডমালিকা পরার সাধ?

যে ভক্তি পায়নি চরণতল
আজ হয়েছে তা বিল্বদল,
মোর মুক্তির তৃষা মুক্তকেশী গো
এলোকেশ হয়ে পায়ে লুটায়॥

[কিউ. এস. ৬০৩, শিল্পী : কৃষ্ণদাস ঘোষ, সুর : নজরুল]

১২৫

মোর আদরিণী কালো মেয়ে শ্যামা নামে ডাকি।
আমার হৃদয়-পিঞ্জরে সে যেন কালো পাখি॥

কালো মেয়ে কালী সেজে ঘোরে
তবু হাসিতে তার জোছনা পড়ে ঝরে,
সাধা হয় মোর ঐ চরণে জবা হয়ে থাকি ॥

মা কি মেয়ে বুঝতে নারি, লীলা কেমন ধারা,
শুধু জানি তারা আমার কালো নয়ন-তারা।

তারে আদর করে বুকে টানি যত
দুষ্টু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় তত,
আমার কভু মা হয়ে সে মুছায় আমার আঁখি ॥

[সূত্র : গিরীন চক্রবর্তীর গানের খাতা]

১২৬

তুমি ভাগিয়াছ ভাগলুয়া দলের সাথে।
নিয়ে গেছে হায় বাক্সের চাবি দিয়েছ দাদার হাতে ॥

বোমা না পড়িতে বাপের বাড়িতে
ছুট্ দিলে স্বামীরে ভুলে,
আমি পথে ফিরি হায়
কর্পোরেশনের ষাঁড় যেন কলকাতাতে ॥

যখন ভালুক নাচাতে এই স্বামী লয়ে
(তখন) ভুলেছিলে বাবা দাদা,
(তখন) তোমার বেণীটি, আমার টিকি-টি
একদিকে ছিল বাঁধা।

সে-বেণী কুলিল, সে-টিকি ছিঁড়িল
ঘরের উনুন নিভিল,
আমি আবার প্রেমের হাট বসাব
ফিরে এসো হাটখোলাতে ॥

[এন ২৭৩১৪, শিল্পী : রঞ্জিৎ রায়]

১২৭

দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ হে নাথ
তাহে দুঃখ নাই।
তুমি যেন অন্তরে মোর বিরাজ করো সর্বদাই॥

রোগের মাঝে অশান্তিতে
তুমি থেকো আমার চিতে,
তোমার নামের ভজন-গীতে প্রাণে যেন শান্তি পাই॥

দুর্দিনে ঘোর বিপদ এলে
তোমায় যেন না ভুলি,
তোমার ধ্যানে পর্বত-প্রায়
অটল থাকি, না দুলি।

সুখের দিনে বিলাস-ঘোরে
ভুলতে নাহি দিও মোরে,
আপনি ডেকে নিও কোলে দূরে যদি সরে যাই॥

[এফ. টি. ১২৪৫১, শিল্পী : আবদুল লতিফ, সুর : নজরুল]

১২৮

স্বপনের ফুলবনে যেদিন দেখিনু
রূপরানি তোমায়।
চকিতে ঐ চোখে তোমার
শরমের কোন্ হাসি লুকায়॥

নিরালার কুঞ্জবীথিকায়
সে প্রথম প্রেম নিবেদনে,
দেখেছি ঐ অধর কোণে
সে-ভীরু কোন্ হাসি পালায়॥

বিদায়ের সে-বেদন বেলায়
মানা না মানলে আঁখি-জল

ভোরে ম্লান চাঁদসম সখি
বিমলিন কোন্ হাসি লুকায়॥

আজ আর নাই হাসি-খেলা
নিভেছে সে-উজল আলো
ভাবি আজ সব চেয়ে তোমার
ভুলাল কোন্ হাসি আমায়॥

[এন. ৭১৪১, শিল্পী : মাস্টার সুনীল বসু, সুর : নজরুল। অপর পিঠের গান 'জাগো জাগো রে মুসাফির]

১২৯

মোরে মেঘ যবে জল দিল না
কখন তুমি আঁখি-জল দিলে।
যারে ঘন বন ছায়া দিল না
তাহারে অঞ্চলে জড়াইলে॥

অসীম আকাশ ধরিতে নারিল যারে
তোমার নয়ন কেমনে ধরিল তারে?
বল কেন ভিখারির শূন্য পাত্রে
অমৃত ঢালিয়া দিলে॥

বলো বলো চির-বৈরাগিনী গো,
তোমার কি ক্ষতি তায়,
পৃথিবী হইতে মোর নাম
যদি চিরতরে মুছে যায়।

চাওনি কিছুই মোর কাছে তুমি কভু
কেন ফিরাইতে চাহ বক্ষে ধরিয়া তবু?
তব গৈরিকাবাসে এ প্রেম-প্রবাহ
কেমনে রাখিয়াছিলে॥

[সূত্র : 'কাফেলা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২]

১৩০

মোর যাবার বেলায় বলো বলো
তুমি চিনিতে পেরেছ মোরে।
গানের সুরের আড়ালে
খুঁজিতে যেন প্রেম–সুন্দরে॥

যাহার বিরহ যাহার আদর চেয়ে
বীণাসম তব তনু সুরে সুরে যেত ছেয়ে
(সে) তার নামখানি তোমার চরণে
লিখে গেল আঁখি–লোরে॥

ফিরায়ে দিলাম তোমারে তোমার ঘরে,
আমি চলে যাই আমার নীলাম্বরে
বলো বলো, মনে আর নাই কোনো ভয়
যত কলঙ্ক হলো চন্দনময়,
নন্দন–বন পারিজাত প্রেম পাইয়াছি অন্তরে॥

[সূত্র : 'কাফেলা', আষাঢ় ১৩৯১]

১৩১

তুমি বহু জনমের সাধ মিটালে
এ বিরহীরে কাঁদাইয়া।
কভু অবহেলা, কভু অনাদর
কভু সে আদর দিয়া॥

ভিক্ষা পেয়েও দাঁড়াইয়া থাকে দ্বারে
ক্ষমা করো তুমি তারে
ভিখারির মন নাহি ভরে যদি
হাতের ভিক্ষা নিয়া॥

ধনীর প্রাসাদে গেল না ভিখারি
তোমার কুটিরে এসে,

ভিক্ষা-পাত্র ভুলিয়া ধরিল
কেন আঁখি-জলে ভেসে।

জানে না কে তারে পথ দেখাইল
কোন্ সুন্দর যেন বলে দিল,
আপনারে দিতে ভিক্ষা লইয়া
জাগিয়ে রে তোর প্রিয়া
তোর চির-জনমের প্রিয়া॥

[সূত্র : 'কাফেলা', আষাঢ় ১৩৯২]

নাটিকা ও গীতিবিচিত্রা

ভূতের ভয়

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—দেবলোক। দেবাধিপতি, দেবকুমারগণ ও দেব-কন্যাগণের আহূত সভা-মণ্ডল]

(দেবকুমার ও দেবকন্যাগণের গান)

জাগো জাগো দেব-লোক।
এলো স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক॥

সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ,
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈ মাভৈ;
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক॥

ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারিভয়,
মোরা ভয়ে উঠি শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়।
ওঠো ওঠো বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি কুয়াশা মায়ার,
আনো আশার আলোক॥

দেবাধিপতি : মাভৈঃ ! মাভৈঃ বন্ধুগণ, আমরা এতদিনে আমাদের মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে মারণ-মন্ত্র নয়—মরণ-মন্ত্র। আমরা—দেবলোকবাসী এতদিন নিজেদের অমর মনে করে জীবনকে অবহেলা করেছি। অমৃতকে পচিয়ে মদ করে তারি নেশায় যখন বুঁদ হয়ে গেছি, তখনই এসেছে সাগর-পারের নির্বাসিত অভিশপ্ত প্রেতপিশাচের দল। তারা আমাদের প্রমত্ততার-জড়তার অবকাশে আমাদের অমৃত, কবচ, শক্তি সব কিছু অপহরণ করেছে। আজ বিশ্ববাঞ্ছিত দেবলোক নিরামৃত নির্জীব, নিষ্প্রাণ, শক্তিহীন। আমাদেরই পাপে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত সত্য,—আজ আমাদের তপস্যার শক্তি অপহরণ করে প্রেতের দল শক্তিমান সত্য,—তবু আজ একমাত্র আশা আমরা আমাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। আমাদের হস্তপদের অশেষ বন্ধনের দারুণ পীড়া অনুভব করবার চেতনা ফিরে পেয়েছি।

সমবেত কণ্ঠে : সাধু ! সাধু !

দেবাধিপতি : আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-স্থানীয় দেবকুমার ও দেবকন্যাগণ ! তোমাদের এক শতাব্দী পূর্বে আমার জন্ম, আর আমাদেরই পাপে তোমরা আজ প্রেতের মায়ায় বদ্ধ-কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি—দেবলোকে জরা-মৃত্যুর, দুঃখ-তাপের বলি হয়ে। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদের পিতৃ-পিতামহের পাপে তোমরা আজ প্রেতাধীন। আমরা ভূতাধীন—অতীতের দাস, তোমরা বর্তমান শতাব্দীর নবজাত শিশু। তোমরা অতীতের দাসকে—ভূতের অধীনকে মুক্ত কর। পদাঘাতে পতিত কর ভূতকে—অতীতকে, দক্ষিণ করে কর মিলিয়ে টেনে তোল ভবিষ্যৎকে !

সমবেত কণ্ঠে : সাধু ! সাধু ! জয় দেবাধিপতির জয় ! ! অমর দেবলোকের জয় ! !

দেবাধিপতি : দেবলোকের জয়ধ্বনি কর, দেবাধিপতির নয়। আমি অতীতের লজ্জা, ভূতের লাঞ্ছনা আমায় অপবিত্র করেছে !

দেব-সঙ্ঘের একজন : না। না। আপনি তার ব্যতিক্রম। সত্য, আপনি জরায় ন্যুব্জ কিন্তু ঐ ন্যুব্জ দেহই অতীত হতে বর্তমানে আসার সেতু।

সমবেত জয়ধ্বনি : সাধু ! সাধু ! বেশ বলেছ ভাই ! বেঁচে থাক !

দেবাধিপতি : তোমাদের এই শ্রদ্ধাই আমার সকল কলঙ্ক, সকল লজ্জাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার দুঃসাহস অর্জন করেছি। আমি বলছিলাম—আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। যে অস্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, সে অস্ত্র বাণীর। সে অস্ত্রের নাম 'মাভৈঃ' !

সকলে : মাভৈঃ মাভৈঃ

দেবাধিপতি : হাঁ, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ কর সকলে। মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! ভয় নাই ! ভয় নাই ! শুধু এই বাণীর আশ্বাসে—এই মন্ত্রের জোরেই আমরা অভিশপ্ত-আত্মা ভূতের দলকে আবার সাগর—পারে তাড়িয়ে রেখে আসব।

সকলে : মাভৈঃ ! জয় দেব-লোকের জয় !

জনৈক দেবযুবা : শুধু বাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী নই দেবাধিপতি : আমরা বলি 'এহ বাহ্য !'

সমবেত দেবসঙ্ঘ : বসে পড়ো ! বসিয়ে দাও !

দেবাধিপতি : (দক্ষিণ কর উত্তোলন করিয়া সকলকে শান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলেন। দেব-সঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল) কে তুমি উদ্ধত যুবক? তোমাকে এই নিপীড়িত দেবপুরীর কোনো যজ্ঞে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দেবযুবা : আমরা থাকি আমাদের যজ্ঞের গোপনতম অন্তরালে, দেবাধিপতি ! আমরা আপনার যজ্ঞের মন্ত্র-পাসক নই—আমরা যজ্ঞের অগ্নি-পূজারী ! আমরা যজ্ঞের আহুতি হয়ে আত্মবলি দিই, আর সেই আহুতিই হয়ে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমরা নিপীড়িত দেব-আত্মার দাহিকা-শক্তি।

দেবাধিপতি : চিনেছি তোমায়। তুমি বিপ্লব-কুমার ! বীর ! আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রাণকে—তোমাদের দুর্দৈব বিলাসিতাকে আমি শতবার প্রণাম করেছি—কিন্তু তোমাদের এই পথকে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভূতগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত,—জানি। তবু বলি—সৈনিকের দুর্ধর্ষতাই একমাত্র গুণ নয়। দুর্ধর্ষতা সৈনিককে করে শুধু সৈনিক, ধৈর্যই করে তাকে মহান।

বিপ্লব-কুমার : আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন দেবাধিপতি ! আপনাকে আমরা পূজা করি দেবতার অন্তরের রাজাধিরাজ বলে, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই মনে করতে পারিনে—আপনি আমাদের যুযুৎসু সেনাদলের অধিনায়ক।

দেব-সঙ্ঘ : বসিয়ে দাও ! বসিয়ে দাও ! উন্মাদ ! উন্মাদ !

বিপ্লব-কুমার : হ্যাঁ বন্ধু, আমরা সত্যসত্যই উন্মাদ। আমাদের উন্মাদনার গান শুনবে ?

দেব-সঙ্ঘের কয়েকজন : এই রে ! সর্বনাশ করলে এই পাগ্‌লাচণ্ডী ! এইবার ধরলে বুঝি ভূতে !

[বিপ্লবকুমারের গান]

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারি ঢাক
যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মারের পিঠে
পড়ুক না এবার !
তোরা নবীন মন্ত্র শোন্ আমাদের—
'প্রহার ধনঞ্জয় ! !'

দেবসঙ্ঘ : সাধু ! সাধু ! 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' ! জোর বলেছ দাদা ! বেঁচে থাক !

আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা
হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে মার
এসেছে আজ দিন।
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়॥

খর স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়—
'সাগর-অভিযান !'

তোরা যজ্ঞ করিস্ অযোগ্য সব
প্রাণে মৃত্যুভয় !

তোদের হাড্ডি গেছে মাংস গেছে
চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস্ তোরা
যজ্ঞ অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার
আগুন জ্বালাময়॥

দেব-যুবাগণ : জয় বিপ্লব-কুমারের জয় !

সকলের গান—

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয় !

দেবাধিপতি : আমি কি তা হলে বুঝব..এই তোমাদের ঈপ্সিত পথ ? বন্ধুগণ ! তা হলে আমায় বিদায় দাও। আমি জানি—ও-পথ মৃত্যুর পথ, জীবন জয়ের পথ নয়। মৃত্যু তো আমরা ভূতের হাত দিয়েই নিত্য-নিয়ত পাচ্ছি ওর জন্য নতুন আয়োজনের তো কোনো দরকার নেই। আমরা চাই জীবন এবং জীবন লাভ করতে হলে চাই,—তপস্যা !যুদ্ধ নয় ! তা ছাড়া, যুদ্ধ করবে কার সাথে ? এ মায়াবী ভূতের দল তো সামনে থেকে দিনের আলোকে যুদ্ধ করে না। এরা যুদ্ধ করে অপ্রকারের আড়ালে থেকে—অন্তরীক্ষে থেকে—পাতালতলে থেকে। শুন্যের সাথে যুদ্ধ করি কি দিয়ে ? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে— অস্ত্র দিয়ে তো নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায়—কিন্তু ভয় দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈঃ-বাণীর ভরসা ছাড়া অন্য উপায় নেই !

[এমন সময় সভা-মণ্ডপে ভীষণ আর্ত বর উঠিল। সভার সকলে যে যেদিকে পারিল—ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। চতুর্দিকে 'ভূত—ভূত' রব উঠিতে লাগিল। ভূতদের কাহাকেও দেখা গেল না। কেবল অন্তরীক্ষে কিসের ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সভার সমস্ত আলোক একসঙ্গে নিভিয়া গেল। মনে হইল, অসংখ্য কায়াহীন ছায়া বীভৎস মূর্তিতে সভা-মণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লব-কুমার ও দেবাধিপতি ব্যতীত সভামণ্ডপে আর কাহাকেও দেখা গেল না।]

বিপ্লব-কুমার : দেবাধিপতি ! এই কাপুরুষের দল কি আপনার মন্ত্রশিষ্য ?

দেবাধিপতি : (হাসিয়া) এরাই কি তোমার যুদ্ধ-সেনা ? জানি বন্ধু, আমাদের দেব-জাতির ক্লীবতা নির্লজ্জতার কত অতলতলে গিয়ে পড়েছে, তাই আমি বলি—এ জাতিকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কল্পনা একেবারে অসম্ভব।

বিপ্লব-কুমার : এই অসম্ভবের সম্ভাবনার আশাতে আমি ভবিষ্যৎ-কালের প্রতীক—যৌবনের প্রতীক পথে বেরিয়েছি, দেবাধিপতি ! আমার জীবনে তারি শেষ

ফলাফল দেখতে পাই। কিন্তু—এ কি ! আমিও কি ভূতের মায়ায় আবদ্ধ? আমি আর নড়তে পারছিনে কেন?

দেবাধিপতি : বন্ধু ! আমরা অনেক আগেই ভূতের মায়ায় বন্দি হয়েছি। আমাদের দুই জনেরই এখন এক গতি। আমাদের জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ আজ এক সাথে বন্দি হয়ে পাতাল-পুরীর অন্ধকার আশ্রয় করে পড়ে থাকবে।

বিপ্লব-কুমার : আপনার মন্ত্র হয়তো বাধাকে বাধা না দিয়ে জয় করা কিন্তু আমি সে মন্ত্রের উপাসক নই, দেবাধিপতি। আমি এ বন্ধন ছিন্ন করব। (বংশী বাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রক্ত-বেশ পরিহিত দেব-যুবার প্রবেশ। তাহারা আসিয়াই ঝড়ের বেগে বিপ্লব-কুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। চতুর্দিকে ভূতের অবোধ্য ভাষায় ভীষণ কিচির-মিচির শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ রক্ত-আলোকে দেখা গেল—বাঁদর ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শার্দুল, হায়েনা, খটাস প্রভৃতি নানা মুখের নানা বীভৎস ভূতের দল দেবাধিপতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবাধিপতি প্রসন্ন হাসিমুখে তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। সহসা নানাপ্রকার রথে আরো নানা মুখের ভূতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহারা দিকে দিকে রথ লইয়া বিপ্লব-কুমারের দলকে ধরিতে বাহির হইয়া গেল। ভূতের মুখে নাকি-সুরে শুধু এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল—বিপ্লব-কুমার ! বিপ্লব-কুমার) !

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেব-লোক। ভূত-নিবারিণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নব-নির্বাচিত সভাপতি জয়ন্তের প্রাসাদে কথোপকথন করিতেছেন।]

জয়ন্ত : আমি বলি কি, আমাদের বন্দি নেতা দেবাধিপতির নির্বাচিত পথই আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃষ্ট পথ। অবশ্য অধিকাংশ সভ্যের মত হলে আমরা এর চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠবার চেষ্টা করতে পারি।

জনৈক সভ্য : আমরা দেব-লোকে এতদিন শুধু মাভৈঃ-বাণীর মন্ত্রই প্রচার করেছি। তাতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভূতের ভয় দেবলোক হতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে—তাতেই আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে এই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে শোষণ-শুষ্ক দেব-লোক !।

দ্বিতীয় সভ্য : আমিও বলি, আমরা তো হাতে মারতে পারব না ওদেরে। এখন ভাতে মারতে পারি কি-না তারই আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় সভ্য : কিন্তু এ ভূত যে আমাদের অন্নের চেয়ে রক্তই শোষণ করে বেশি। ঐ রক্ত-খেকো ভূতকে ভাতে মেরে বিশেষ সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

দ্বিতীয় সভ্য : ভাতে মারা মানেই ওদের প্রাণ আমাদের রক্ত শোষণে বাধা দেওয়া। তাহলেই ওদের আয়ু যাবে কমে। আমিও বলি যুদ্ধ করে ওদের কাটব কি, ওরা যে কন্দকাটা ভূত। ওদের রক্তপাত করলেই ওরা হয়ে উঠবে আরো ভীষণ, ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজে পান করে উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দেবে।

জয়ন্ত : ও কার আলোচনায় এখন প্রয়োজন নেই। রক্তারক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের এ অহিংস যুদ্ধ। আমরা দলে দলে ধরা দিয়ে ওদের পাতালপুরীর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করে দেব। যে অন্ধ-কারার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের নির্বীর্য করে রেখেছে, সেই ভয়টাকেই আগে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। মারবে কতক্ষণ? ওদের মারের মুখে যদি আমাদের দেব-লোকের সব শির এগিয়ে দিই, তাহলে দু'দিনই ওদের মারের অস্ত্র যাবে ভোঁতা হয়ে—মারের শক্তি যাবে ফুরিয়ে।

চতুর্থ সভ্য : আমাদের দলপতি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। ওরা আমাদের অমৃত অপহরণ করে তার বদলে যে বিষ-মাখা খাদ্য জোর করে খাওয়াচ্ছে—আমরা শুকিয়ে মরলেও তা আর গ্রহণ করব না। আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে হয় ভূতুড়ে কিম্ভূতকিমাকার বস্ত্র দিয়ে, আমরা আর তা পরব না। নির্যাতন আরো বেশি চলুক, তবু ওদের দান গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দেব-কান্তিকে আর অপবিত্র পঙ্কিল করে তুলব না।

(হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে বিপ্লব-কুমার চলিয়া গেল)

জয়ন্ত : ওকে চেনেন আপনারা? ওই বিপ্লব-কুমার। কখনো গান গায় কখনো যুদ্ধ করে। কখন যে কি করে বুঝবার উপায় নেই। ভূতের চোখে ধুলো দিয়ে রাত-দিন ও এই দেব-লোকে নানা মূর্তিতে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে বেড়াচ্ছে। ভূতদের চেষ্টার আর অন্ত নেই ওকে বন্দি করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ও কি বলে, কি করে কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম সভ্য : ওই দেবলোকের একমাত্র যুবা—যে ভূতকেও ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছে।

(জলন্ত অগ্নি-বর্ণা। স্বাহা দেবীর প্রবেশ। সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন)

জয়ন্ত : আসুন দেবী। আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

স্বাহা : আমি কিন্তু আপনার কথা ভেবে এখানে আসিনি, জয়ন্তদেব! আমি ভাবছিলাম ঐ যুবকের কথা—যে এখনি গান গেয়ে চলে গেল।

জয়ন্ত (ম্লানমুখে) : বিপ্লব-কুমারের কথা? কিন্তু ওর আদর্শ তো আমাদের আদর্শ নয়, দেবী!

স্বাহা : এতদিন তাই ভেবেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, আগুনকে ধোঁওয়া করে রাখায় কোনো লাভ নেই, ওতে চক্ষুই জ্বালা করে—দমই বন্ধ হয়ে আসে—দাহ করে না। আগুন যদি আমরা জ্বালিয়েই থাকি, তাহলে ওকে তুষ-চাপ দিয়ে ধোঁওয়া করে রেখে লাভ নেই, আগুন এবার ভাল করেই জ্বলে উঠুক।

জনৈক সভ্য : মার্জনা করবেন, দেবী। আপনি আমাদের দেবী–শক্তি। সমগ্র দেবী–জাতির প্রাণ–শিখা। তবু জিজ্ঞেস করি, তাহলে এ–আগুনে কি আপনিই কুলোর বাতাস করবেন ?

স্বাহা : বিপ্লব–কুমারকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাই করাই উচিত। পুরুষেরা যখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, তখন নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে বই কি ! এমন পড়ে পড়ে আর কতদিন মার খাওয়া যায় ? এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক !

তৃতীয় সভ্য : (হাসিয়া) আমাদের রান্নাঘরে থেকে থেকে আগুনটা গা সওয়া হয় গেছে দেবী, তাই আপনারা হয়ত ওটাকে ভয় করছেন না, কিন্তু উনুনের আগুন আর বিপ্লবের আগুন এক জিনিস নয় !

স্বাহা : উনুনের আগুন আমরা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, কিন্তু আপনাদের মুখে আগুন উঠেও—এত ধূমপান করেও তো আগুনের ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না ! উনুনের আগুনেও তো আপনাদের অনেকে পুড়েছে, এবার না হয় ওর চেয়ে প্রখর আগুনেই পুড়বে। আমাদের তো পুড়ে মরতেই জন্ম !

জয়ন্ত : আমাদের কোনো সভ্যের প্রগল্‌ভতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দেবী। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করলে আমরা সত্যসত্যই শক্তিহীন হয়ে পড়ব। আপনি দেব–লোকের প্রাণ–স্বরূপা। আমাদের আছে শুধু অস্থি আর চর্ম, আপনাদের আছে প্রাণ। এই প্রাণ–শক্তি যেখানে যোগ দেবে সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বাহা : আমরা যদি সত্যই দেব–লোকের প্রাণ–শক্তি হই, এবং যেখানে যোগদান করি, সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আপনার দুঃখের তো কোনো কারণ দেখছিনে। দেব–লোক ভূত–মুক্ত হোক এইতো আপনারা সকলে চান। যে মুক্তি আপনিই আসুক—আর বিপ্লব–কুমারই আনুক—তাতে তো কিছু আসে যায় না।

জয়ন্ত : কিন্তু বিপ্লব–কুমারের আন্দোলন সে শক্তি আনতে পারবে না বলেই আপনাদের শক্তি সেখান ব্যয় করে ব্যর্থতা আনতে নিষেধ করছি, দেবী। আমরা বলি, আমরা জয় করব সত্যের জোরে, আমরা সত্যাগ্রহী। বিপ্লব–কুমার বলে, সে জয় করবে অস্ত্রের জোরে—সে বলে, সে অস্ত্রাগ্রহী। কিন্তু ভূতের অস্ত্রবলের কাছে ওর মূল্য কতটুকু !

স্বাহা : ও শুধু তাই বলে না। বলে, ভূত আর পশু, দুইটা জাতই আগুনকে অতিরিক্ত ভয় করে। এ ভূতের অর্ধেকটা পশু, অর্ধেকটা ভূত। একবার ভালো করে আগুনজ্বেলে তুলতে পারলে এরা তল্পিতল্পা তুলে লম্বা দৌড় দেবে !

জয়ন্ত : আগুন তো আমরাও জ্বালাতে চাই, দেবী। সে আগুন অসন্তোষের আগুন।

স্বাহা : আগুন নয় জয়ন্তদেব, ও হচ্ছে ধোঁওয়া। বড় বড় ওঝাদের দেখেছি, তারা ভূত তাড়াবার জন্য শুধু ধোঁওয়া আর সর্ষে–পড়াই ব্যবহার করে না,—উত্তম–মধ্যম মারও দেয় ! নমস্কার ! (প্রস্থান)

জয়ন্ত : আমি বিপ্লব–কুমারের খুব বেশি বিরোধী নই, কিন্তু আমার মনে হয়—সে প্রস্তুত না হয়েই নেমেছে। এতে সে দেব–লোকের ক্ষতিই করবে।

সভ্যগণ : (উঠিয়া পড়িয়া) এ সব আগুনের আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা আমাদের সত্যচ্যুত হয়ে পড়ব এখানে থাকলে। এ আলোচনা আমাদের এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করবে। আমরা আজ উঠলাম। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অন্যদিন অন্য স্থানে হবে। (সকলের প্রস্থান)

(বিপ্লব-কুমার ও স্বাহাদেবীর প্রবেশ)

বিপ্লব-কুমার : আমি তখন এসে ফিরে গেছি, জয়ন্ত দেব। ঐ ভিরু লোকগুলোকে ভয় করিনে, কিন্তু যখন ভাবি যে, দেব-লোকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে ওরাই—তখন আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারিনে। তখন এলে একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হত ভেবেই চলে গেছি।

জয়ন্ত : কিন্তু এখনই বা এসেছেন কেন? আপনি তো জানেন, আপনাদের এবং আমাদের পথ একেবারে বিপরীতমুখী।

স্বাহা : সেই মুখকে ঘুরিয়ে একমুখী করবার জন্যই আমি এসেছি, জয়ন্ত দেব!

জয়ন্ত : সে অধিকারের মর্যাদাকে আপনিই আগে ক্ষুণ্ন করেছেন দেবী। আপনি ক্ষমা করবেন, যদি আপনার অধিকারের সম্মান রাখতে না পারি। এ পথ এক হবার নয়। আপনি মনে করেছেন, আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে সেতু হয়ে। কিন্তু তা নয়, বরং আমাদের মিলনের যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি তাতে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এসে!

[বিপ্লব-কুমার চমকিত হইয়া উঠিল। সে একবার জয়ন্তের দিকে, একবার স্বাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্বাহা : (ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি ভুল করলে জয়ন্ত। এই ভুলের জন্য সারা দেব-লোককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সারা দেব-লোকের যৌবনের মূর্ত প্রতীক তোমরা দুজন। তোমরাই যদি দ্বিধা-বিভক্ত হও, দেব-লোকের কল্যাণ তাহলে পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করবে কেমন করে? দেব-লোকের কল্যাণের জন্য যদি আমি তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে কি তোমরা এক হবে?

বিপ্লব-কুমার : এ সব হেঁয়ালির মানে তো বুঝতে পারছিনে, স্বাহা দেবী! আমি যা ভেবেছি, তাই যদি সত্য হয়—তাহলে আপনাদের দুইজনকেই বলে রাখি, আমায় দিয়ে আপনাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভালাভের ভয় বা আশা নেই। আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে। জয়ন্তদেবকে সাথে পেলে আমার ব্রত সহজে উদ্‌যাপন হত। নাই পাই, ওঁকে নমস্কার করে চলে যাব। এর মাঝে মান-অভিমানের পালা আস্‌বার তো কথা ছিল না!

জয়ন্ত : আপনি আমার নমস্য বিপ্লব-কুমার! আমার বির্লজ্জতা ক্ষমা করুন। আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার মতো সংযম আর শক্তি যদি থাকত, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার সে শক্তিও নাই। তা'ছাড়া আপনার পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গ্রহণ করবার মতো বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি আজো। আপনার মন্ত্রে

অবিশ্বাসী আপনার পথে শুধু বাধারই সৃজন করবে—পথকে এগিয়ে দিতে পারবে না।

বিপ্লব-কুমার : আপনার শক্তির উপর আপনার চেয়ে আমার বেশি বিশ্বাস আছে, জয়ন্ত দেব। কিন্তু সে শক্তিকে যখন আপনি দেশের বড় কল্যাণের জন্য দান করতে কার্পণ্য করছেন, তখন সেখানে আমার বলবার কিছু নেই। আমার শুধু একটি প্রশ্ন মনে রাখবেন—এবং পারেন তো পরে উত্তরও পাঠাবেন। সে প্রশ্নটি এই যে, দেব-লোকের যৌবন আজো শুধু অতীতের দাসত্বই করবে, না সে তার নিজের পথ নিজে রচনা করবে? সোজা পথ দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল বলেই কি তাকে ছেড়ে এক বছরের লক্ষস্থলে একশ বছরে পৌঁছুতে হবে? চললাম—স্বাহা দেবী, নমস্কার! আপনার এখন জয়ন্ত দেবের সাহায্য করাই উচিত।

স্বাহা : এখন আপনার পিছনে চলা ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ নাই, বিপ্লব-কুমার! যিনি আমাকে বুঝতেই পারেননি, তাঁর পথের বোঝা হয়ে থেকে কোনো লাভ নেই!।

জয়ন্ত : নমস্কার! (উভয়কে নমস্কার করিলেন)

বিপ্লব-কুমার : তাহলে আমার পশ্চাতেই আসুন! শক্তিকে ফিরিয়ে দিতে নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর পার্বত্য অরণ্য। সেই অরণ্যে রক্ত-বাস-পরিহিত যোদ্ধৃবেশে বিপ্লবী দেব-যুবাদল ও বিপ্লব-কুমার। পর্বতের সানুদেশে পর্বত ঘিরিয়া ভূতের শত শত কালো তাম্বু। পর্বত-শিখর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ শকুনের মতো দলে দলে ভূতের রথ উড়িয়া ফিরিতেছে।]

বিপ্লব-কুমার : বীর দেব-সেনাদল! আজ আমাদের শেষ ভাগ্য-পরীক্ষা, ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন, এমন দুরাশা করিনে। তবু যাবার আগে ভূতের নখর দন্তগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে চাই—আমাদের এই মুষ্টিমেয় দেব-যুবার আত্মবলিদানে। কত বড় বিপুল শক্তি শুধু আত্মশক্তির অ-পরিচয়ে, আত্ম-চেতনার অভাবে নিষ্ক্রিয় নিবীর্য হয়ে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে—শুধু সেইটুকু জানিয়ে যেতে পারলেই বুঝব—আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। বাকি কাজ দেব-লোকের অনাগত যুবারা স্বল্পায়াসেই করতে পারবে।

দেব-সেনাদল : জয় শিব শঙ্কর! জয় দেব-লোকের জয়!

[গান করিতে করিতে দেব-যুবাদলের অগ্র-গমন]

বজ্র-আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়!
জয় জীবনের জয়॥

শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥

মরু-অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।
আমাদের শত শব-চিন্‌ ধরি
আসিবে শক্তি প্রলয়ংকরী,
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতরি
নবীন অভ্যুদয়
জয় জীবনের জয়॥

বিপ্লব-কুমার : সাবাস জোয়ান ! এইবার হানো বজ্র, হানো ত্রিশুল, হানো পরশু—ঐ ভূতের বাথান অস্ত্র লক্ষ্য করে।

[দেব-যুবাগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঊর্ধ্ব অধঃ সম্মুখ, পশ্চাত-সকল দিক দিয়া পশু-মুখ ভূতের দল অলক্ষ্যে অস্ত্র হানিতে লাগিল।]

দেব-যুবাগণ : সেনাপতি ! আমাদের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বিপ্লব-কুমার : (যুদ্ধ করিতে করিতে) শুধু হাতে-পায়ে যুদ্ধ কর। হত আহত সৈনিকের হাত ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ কর। মনে রেখো বন্ধু আমরা কেউ ফিরে যাবার জন্য আসিনি !

[দেবযুবাগণ শুধু হাতে ভূতেদের উপর লাফাইয়া পড়িল। হত-আহত সৈনিকদের হাত-পা ছিঁড়িয়ে লইয়া আঘাত হানিতে লাগিল। ভূতের তাম্বুতে ভীষণ সন্ত্রাস। কিচিরমিচির শব্দ উত্থিত হইল। ভূতের সিংহ-মুখ সেনাপতির ইঙ্গিতে ভূতেরা ঊর্ধ্ব হইতে এক অদৃশ্য মায়াজাল নিক্ষেপ করিল। দেব-যুবাগণ সেই জালের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া বদ্ধহস্ত-পদ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভূতেরা একে একে সকলকে বন্দী করিল।]

বিপ্লব-কুমার : রাক্ষুসী ! এতেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না ? তোর বিজয়া দশমী কি চিরকালের জন্য হয়ে গেছে ? আমার সেনাদল গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি। ওদের মায়াজালের বন্ধনকে অতিক্রম করে বাঁচার শক্তি আজো আমি হারাইনি। উঃ ! পশ্চাৎ হতে আমায় আক্রমণ করেছে।

[কৃষ্ণবাস-পরিহিত একদল ভূত বিপ্লব-কুমারকে ভীষণ আক্রমণ করিলে। বিপ্লব-কুমার পড়িয়া গেল !]

স্বাহা : ভয় নাই বীর, আমি এসেছি। ঐ দেখ পশ্চাতে আমার নারী সেনাদল ! ও-মায়াবী ভূতের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারবে—এই মায়াবিনী নারীসেনা ! ওদের অস্ত্র ব্যর্থ করতে পারব আমরাই।

বিপ্লব-কুমার : না দেবী, পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ নয়। দেবতায় পশুতে যুদ্ধ এ। রক্ত-খেকো পশু আর রাক্ষস পুরুষ-নারীর সমানে রক্ত

শোষণ করে। ওদের শক্তিকে ভয় করি না, ভয় করি ওদের উলঙ্গ নির্লজ্জতাকে। ওরা তোমাদের–আমাদের দেব–লোকের প্রাণ–শক্তির অবমাননা করে যদি তার কর্তব্য সাধন করে—আমাদের দেব–লোক কোন দিনই ভূতের গ্রাস থেকে মুক্ত হবে না। তুমি ফিরে যাও তোমার কাজ আমার এই হারাপথের সন্ধানী যুবকদের খুঁজে বের করা। তাদেরে এই মৃত্যু–পথের সন্ধান দেওয়া। আমরা আত্মদান করে ভয়–মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেব–লোকের যুব–শক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে ধরে আমাদের আহতদের রক্ত–চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে। ভূতের হাত থেকে অমৃতের উদ্ধার করে আমাদের বাঁচিয়ে তুলবে। সেইদিন আসব আমরা নতুন দেহে—নতুন রূপে। ধ্বংসের পূজারী–দল আসব নব–সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে ! স্বাহা ! আমি যাই। উঃ !

স্বাহা : (বিপ্লব–কুমারের উপর পড়িয়া) বন্ধু ! প্রিয় ! তোমার শেষ দান আমায় দিয়ে যাও।

বিপ্লব–কুমার : আমার শেষ দান—আমার শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। তারপর যা চাও, সে প্রীতি সে প্রেম—পাবে যখন আবার আমি আসব। সে আজ না, স্বাহা !

স্বাহা : (উঠিয়া পদধূলি লইয়া) তুমি শান্তিতে যাও বীর, আমি তোমার ব্রত গ্রহণ করলাম।

[বিপ্লব–কুমার দক্ষিণ কর ললাটে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

যবনিকা

জাগো সুন্দর চিরকিশোর

প্রথম অঙ্ক

(কোরাস গান)

জাগো সুন্দর চিরকিশোর
জাগো চির অমলিন দুর্জয় ভয়-হীন
আসুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর ॥
অগ্নিশিখার সম সূর্যের প্রায়
জ্বলে ওঠো দিব্য জ্যোতির মহিমায়,
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা,
জড় প্রাণ পাষাণের ভাঙো ঘুমঘোর ॥

কঙ্কণ : ওস্কার ! ওস্কার ! খেলতে খেলতে আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে ?

কল্পনা : আমি—তোমাদের দিদি কল্পনা। কঙ্কণ ! ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি আমাকে চিনতে পার কি না !

কঙ্কণ : না—হ্যাঁ—তোমায় যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে !

কল্পনা : আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কি ভাবছিলে, মনে পড়ে ?

কঙ্কণ : হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম আমি যদি ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে পারতুম, তা হলে কী মজাই না হ'ত। তারপর মনে হ'ল আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরি আছে, সে যেন জাদু জানে, সে যেন এক-নিমেষে আমায় যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে !

কল্পনা : ঠিক ধরেছ ! এখন চেয়ে দেখ দেখি, আমি সেই পরির মত কি না !

কঙ্কণ : আরে, ঠিক সেই ত ! এক্কেবারে হুবহু মিল ! আমার মনের সেই পরি তুমি। তোমার নাম কি বললে ?

কল্পনা : আমার নাম কল্পনা। আমায় কল্পনা-দি বলে ডেকো !

কঙ্কণ : ধ্যেৎ, তুমি যে মাথায় আমারই মত বড়। তোমাকে—আচ্ছা দিদি বললে যদি সুখি হও, তাই বলব। কিন্তু—

কল্পনা : বুঝেছি—আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে, আমি সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাব। এখন চলো সাগর-জলের তলে। (সাগরের শব্দ ভেসে এলো।)...

কামাল : এই কঙ্কণ ! পালিয়ে আয় ! ও জাদু জানে, পরির বাচ্চা, উড়িয়ে নিয়ে যাবে !—এই যাঃ ! তোর মাদুলিটা ফেলে এসেছিস বুঝি ?—দেখি আমার তাবিজটা আছে কি না ! অ্যাঁ, আমার তাবিজটা—কে নিলে ?

কল্পনা : এখন আর কোনো বীজেই কিছু ফল হবে না কামাল ! আমি তোমাদের ফুলের রথে করে সমুদ্র-জলে নামতে শুরু করেছি ! ওকি ওঙ্কার অমন চোখ বুঁজে আছ কেন ?

ওঙ্কার : ভয় পেলে আমি চোখ বুঁজে বসে থাকি। কিংবা প্রাণপণে চেঁচিয়ে গান করি।

কল্পনা : এই চোখ বোঁজা কার কাছে শিখলে ?

ওঙ্কার : ভেড়ার কাছে !

কল্পনা : ভেড়ার কাছে ?

ওঙ্কার : হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দেখেছিলুম, একপাল ভেড়ার মাঝে একটা নেকড়ে বাঘ এসে পড়ল। যাহাঁ নেকড়ে বাঘ দেখা, আর অমনি পালের সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্পনা : আর, তাই দেখে বুঝি নেক্‌ড়ে বাঘ পালিয়ে গেল !

ওঙ্কার : দূর ! তা হবে কেন ? নেকড়ে বাঘ ভেড়াদের এক একটার কান ধরে ঘাড় মটকে রেখে আসে, এসে আবার একটার কান ধরে নিয়ে যায় !

চাকাম ফুসফুস : ওরেব্বাবারে। গেছি রে গেছি রে, একেবারে মরে গেছি রে মা ! (সমস্ত 'স' এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স' দিয়ে) আজ সকালে সাল্‌কের শ্মশান ঘাটে সিনান করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হল। শ্মশানের শ্যাওড়া গাছের শাকচুন্নিতে ধরেছে রে বাবা !

কল্পনা : ও কে চিৎকার করে অমন করে ? কে ঐ ভিরু ?

কঙ্কণ : ওর নাম ন্যাড়া, আমরা ওর নাম রেখেছি চাকাম-ফুসফুস ! ও বড় ভিতু কি না ! একটু কিছু ভয়ের কথা শুনলেই ওর ফুসফুস চুপসে গিয়ে বুকে গর্ত হয়ে যায়।

কামাল : আর মুখ শুকিয়ে গিয়ে চাকাম চুকুম শব্দ করতে থাকে—তাই ওঙ্কার ওর নাম রেখেছে চাকাম ফুসফুস।—(সমুদ্রের শব্দ)

ওঙ্কার : উঃ কী ভীষণ গর্জন !

কামাল : কী ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস ! আমার গা শির শির করছে !

চাকাম ফুসফুস : আমার দাঁতে দাঁত লাগছে ! শ্মশান দেখে কী সর্বনাশটাই হলো ! হি হি হি হি ! (দাঁত দাঁত লাগার শব্দ।)

কঙ্কণ : আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে কল্পনা-দি, কিন্তু অত অন্ধকার কেন ? সমুদ্রে কি আলো নেই ?

কল্পনা : সাগর-জলের নিচে মণি মুক্তার আলো। আর দেরি নেই, ঐ আমরা এসে পড়েছি—সাগর-জলের পাতাল-তলে ! খোলো দুয়ার।

(হঠাৎ যন্ত্র-সঙ্গীত ও সাগর-গর্জন বন্ধ হয়ে গেল।)

কঙ্কণ : (হাততালি দিয়ে) কল্পনা-দি, দেখ দেখ কী সুন্দর আলো ! কত হীরা মানিক মুক্তো ! কামাল ! ওঙ্কার !

কামাল : এই কঙ্কণ, খবরদার, ও-সব হীরা মানিক ছুঁস্‌নে ! আমাদের গাঁয়ে একজন পুঁথি পড়ছিল, তাতে লেখা আছে—ও-সব পরিদের হিকমত। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি !

ওঙ্কার : হাফপ্যান্টের পকেট ত ভর্তি হয়ে গেল হীরা মানিকে। আর নিই কোথায়? বাবাকে কতবার বললাম যে, হাফপ্যান্টের দুটো বুক পকেট করে দাও, তা বাবা শুনলেন না। গায়ের জামাটাও ভুলে এলুম !

চাকাম ফুসফুস : ওরে বাপ রে ! কী সর্বনাশটাই হলো। এ যে খই মুড়ির মত হীরা ছড়ানো রয়েছে ! নিলে শ্যাওড়া গাছের ঐ শাকচুন্নিটা ধরবে না ত?

কল্পনা : শোনো কঙ্কণ, ওঙ্কার, কামাল ! তোমরা বড় হয়ে আসবে এই সাগর-জয়ে। এই সাগরকে যে বীর জয় করবে—সেই পাবে এই সাগরতলের হীরা মানিক মুক্তা। এই পাঞ্চজন্য শঙ্খে বেজে উঠবে তারি শুভ আগমনী বার্তা ! কামাল তুমি কি হবে?

কামাল :

আমি সাগর পাড়ি দেবো, হব সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচা-কেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজরা আমার লাল রাঙা পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলে দুলে।
চারপাশে মোর গাঙ-চিলেরা করবে এসে ভিড়,
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

কল্পনা : আর কঙ্কণ?

কঙ্কণ :

সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, হব সিন্ধুপতি ;
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিন্ধু ভাগীরথী॥
রক্ত-রাঙা পলার দ্বীপে রাজধানী মোর হবে,
জয়-গান মোর উঠবে নিতুই সাগর-রোলের স্তবে।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরে রইবে সদা ঘিরে
যেন কোলের খোকার মতো আমার সাগর-নীরে !
সাগর-তলের সপ্ত পাতাল নাই সন্ধান যার
জয় করব, আমি তারে করব আবিষ্কার॥

(সাগর-জলের শব্দ ! পুষ্পরথ যেন সাগর হতে উঠে অন্যত্র চলে গেল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(ভোর হয়ে এলো। পাখির কলরব ভেসে আসছে !)

বেণু : কঙ্কণ-দা, ওঙ্কার-দা ! চোখ খোলো, আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ঐ দেখ, সুয্যি উঠছে।

ওঙ্কার : বায়স্কোপের সুয্যি নয় ত ! কল্পনাদির মায়ায় সব যে ভুল দেখছি মনে হচ্ছে।

কল্পনা : খুকি, তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার নাম কি?

বেণু : আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইখানেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলুম। সব শুনেছি সব দেখেছি। ভয়ে কথাটি কইনি !

কল্পনা : তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গল গ্রহে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু : (ভয় পেয়ে) না ! আমাকে 'হেদো'র কাছে নামিয়ে দাও, আমি এক ছুট্টে বাড়ি পালাব !

ওঙ্কার : তোর আঁচলে কি রে বেণু? অ ! আমার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো মানিক চুরি করেছিস বুঝি? দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেণু : বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপ্‌না থেকে আমার কাছে এসেছে ! আমি চুরি করব কেন? আচ্ছা, ওঙ্কার-দা, তোমরা ব্যাটা ছেলে, তোমরা ও নিয়ে কি করবে? এখন ওগুলো আমার কাছে থাক, তোমার বৌ এলে মালা গেঁথে উপহার দেবো।

চাকাম-ফুসফুস : (কল্পনাকে উদ্দেশ ক'রে) কাল-ফণী দিদি ! ঐ শ্যামবাজারের দোতালা বাস যাচ্ছে—ওর ছাদে আমায় টুপ করে ফেলে দাও না ! আমি সাঁ করে সোজা সরে পড়ি ! কী সর্বনাশটাই হলো আমার।

কল্পনা : তোমার ভয় দূর না হওয়া পর্যন্ত এমনি ভয় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব তোমায়। ভয়ের মাঝে রেখেই তোমার ভয় দূর করব। আচ্ছা বেণু, তোমার কী ভালো লাগে? চাঁদের দেশ, না, মাটির পৃথিবী?

বেণু : মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। ও যেন আমার মা।

কল্পনা : আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছা করে?

বেণু : আমার ইচ্ছা করে—

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি।
সুয্যিমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন" মা বলবেন রেগে।
বলব আমি "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না কো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে !"

উষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নিচে ঘুমায় শহর শীতের-কাঁথা মুড়ে।
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়,
বলব আমি, "ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়"।

ঝর্না-মাসি বলবে হাসি', "খুকি এলি না কি?"
বলব আমি, "নই ক খুকি, ঘুম-জাগানো পাখি!"

ওঙ্কার : কল্পনা-দি! মঙ্গল গ্রহ না চাঁদের দেশে যাবে বলছিলে না? সমুদ্রের জলে ভিজে আমার ভীষণ সর্দি করেছে—তাই বলছিলুম যা যুদ্ধ লেগেছে কল্পনা-দি, তাতে বুঝে দেখ্‌লুম, আমার রাজা টাজা হওয়া পোষাবে না। ও ঝক্কির চেয়ে অনেক ভালো—

আমি হবো গাঁয়ের রাখাল ছেলে!
বলব, "দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে।"
আঁচল ভরে মুড়ি নেবো, হাতে নেবো বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটিরে কোলে করে পার হব বিল খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।
আমি হবো রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,
ছাতিম তরু ধরবে ছাতা আমার মাথার 'পরে।
শালের পাতায় মুকুট গ'ড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাতবে এনে নবীন ধানের চারা।
সন্ধ্যা হলে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে!

কঙ্কণ : কল্পনা-দি, তোমার রথ থামিও না। চলো হিমালয়ের গৌরীশঙ্করের চূড়ায়, উত্তর-মেরু, বরফ পেরিয়ে নাম-না-জানা দেশে। চলো চাঁদের বুকে, মঙ্গল গ্রহে।

কল্পনা : তোমায় নিয়ে যাব কঙ্কণ, অসীমের সীমা খুঁজতে—অকূলের কূল দেখাতে। তার আগে তোমার পৃথিবীর কাজ সেরে নিতে হবে। ধর, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয়—তুমি কী কর্‌বে?—

কঙ্কণ : আমি গাইব গান—আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধুয়া।

(গান)

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে বাদল...

কল্পনা : শুধু গান গাইবে? কর্ম করবে না?

কঙ্কণ : কর্মই ত আমার প্রাণ। কাজ করি বলেই ত রাত পোহায়।

আমি হব দিনের সহচর—
বলব, "ওরে, রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর।
তোদের ছেলে উঠল জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশি,
জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষী।"
"শ্যাওলা" "হাঁসা" দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখব সবুজ-কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি—
ওপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।

ধরায় ডেকে বলব, "ওগো শ্যামল বসুন্ধরা
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল-ভরা।
জংলি মেয়ে ছিলে, তুমি, ছিল না ক ছিরি,
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে ফিরতে দরি গিরি।
আমরা তোমায় পোষ মানিয়ে দিয়েছি ঘর বাড়ি
গা-ভরা তোর গয়না মা গো, ময়নামতীর শাড়ি !
জংলা কেটে' ক্ষেত করেছি, ফসল সেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর বাংলো তুলে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্য-মেয়ে ! আমরা তোরে করেছি রাজরানী,
ধূলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসনখানি।
খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেবো প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

(হঠাৎ সকলে "ধর্ ধর্ গেল" বলে চিৎকার করে উঠল। চাকাম-ফুসফুসের "কী সর্বনাশটাই হল রে বাবা" বলে চিৎকার শোনা গেল।)

ওঙ্কার : কল্পনা-দি, কল্পনা-দি, ধর ধর, চাকাম-ফুসফুস হেদোর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে !

বেণু : (কাঁদতে কাঁদতে) চাকাম-ফুসফুস আমার সব মুক্তো মানিক চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে !

কল্পনা : (হেসে) ভয় নেই, ও জল থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে বাড়ির দিকে দৌড় দেবে ! তবে দৌড়ে পালাবে কোথায়? আবার আমার কাছে ধরা দিতেই হবে !—ও কি, বেণু কাঁদছ? ওগুলো মুক্তো মানিক নয়। তোমরা শুধু ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছ। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আর তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ঐ সাগর অভিযানে—সেইদিন সত্যিকারের মুক্তো মানিক পাবে।—তার আগে নয়।

কঙ্কণ : ওদের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চলো না কল্পনাদি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে আনব অমৃত পৃথিবীতে, জরা মৃত্যু থাকবে না—থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

[রথের দূরে যাওয়ার শব্দ]

* * * * *

(উড়ে চাকরের প্রবেশ)

হেই খোকাবাবু সব উঠো উঠো। সারা রাত্তির কি ছাদে শুয়ে থাকবে? ঠাণ্ডা লাগিব যে ! উঠো ! উঠো !

ওঙ্কার : কঙ্কণদাকে উঠিয়ো না—ও এখন 'রকেট' ক'রে চাঁদের দেশে গিয়ে জ্যোৎস্নার আরক খাচ্ছে। আমি ততক্ষণ ওর পকেটের কমলালেবুটা খেয়ে ফেলি !

—যবনিকা—

ঈদ

মহ্‌বুব, শমশের, মাহ্‌তাব, গুলশন, বিদৌরা।
(মাহ্‌তাব গাহিতেছিল)

গান

বিদায়-বেলায় সালাম লহ মাহে রমজান রোজা।
(তোমার) ফজিলতে হাল্কা হলো গুনাহের বোঝা॥

ক্ষুধার বদলে বেহেশ্‌তি ঈদের সুধা তুমি দিলে,
খোদার সাধনার দুঃখে কি সুখ তুমি শিখাইলে,
(তুমি) ইশারাতে খোদায় পাওয়ার পথ দেখালে সোজা॥

ভোগ-বিলাসী মনকে আন্‌লে পরহেজগারির পথে,
দুনিয়াদারি করেও মানুষ যেতে পারে জান্নাতে ;
কিয়ামতে তোমার গুণে ত্রাণ করবেন বদরুদ্দোজা॥

মহ্‌বুব : মাহ্‌তাব ! আজ ঈদের ভোরে আবার রোজার গান কেন ?

মাহ্‌তাব : মহ্‌বুব ! মহ্‌বুবের রোজা ফুরায়, মাহ্‌তাবের রোজা ফুরায় না। রোজার তৃষ্ণা তার যায় না ; রোজা ফুরোলে যে ঈদ ফুরিয়ে যাবে ! তুমি মহ্‌বুব, তোমার হয়তো রোজা শেষ হয়ে গেছে !

বিদৌরা : মহ্‌বুব ভাই এত সকালে ?

মহ্‌বুব : বিদৌরা ! আজ ভোরে কিসের খুশিতে মন যেন শিউলি-ঝরা আঙিনার মতো রেঙে উঠেছে। এই নাও—আমার রুমালের ঝরা শিউলি তোমার আঁচলে উঠে বেঁচে উঠুক !

বিদৌরা : দাদাভাই, মহ্‌বুব ভাই, তোমরা কোথাও যেয়ো না। আমি খোর্মা, সেমাই, আর আতরদানি এনে দি।

শম্‌শের : (ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে) শম্‌শের ঘরে এল—বিদৌরা ! আমার জন্য গোলাপ-পানি আর সুর্মা !

বিদৌরা : শম্‌শেরকে আমার ভয়ানক ভয়, ও কেবল গলায় পড়বার জন্য ছটফট করে বেড়ায় ?

(দূরে গুলশনের হাসি)

শম্‌শের : ও নিশ্চয় গুলশনের হাসি।

মাহ্‌তাব : গুলশনের বুকেই যত বুলবুলের ভিড় কি না। আচ্ছা শম্‌শের, এই ঈদের মানে কি জানো?

মহ্‌বুব : মাহ্‌তাব ! দোহাই, আজ রসের ঈদ, আনন্দের ঈদ, আজ আর তত্ত্ব নয়। তত্ত্বের কথা শুনব বকরীদে। এক মাসের উপোসী রসনা আজ রসের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠেছে।

শম্‌শের : মাহ্‌তাব যে সেই রসের পিয়ালা, সেই খুশির পিয়ালা, মহ্‌বুব !

মহ্‌বুব : হাঁ, তা বটে। তবে ওর খুশির কথায় আমার কিন্তু মাঝে মাঝে গলা খুশখুশ করে।

মাহ্‌তাব : সেমাই খোর্মা চা আসছে মহ্‌বুব—তোমার গলা খুশ্‌খুশানি বন্ধ হবে।

শম্‌শের : মাহ্‌তাবের অর্থাৎ চাঁদের জ্যোৎস্না পান করে চকোর-চকোরী আর শাপলা ফুল। মাহ্‌তাব সকলের জন্য নয়। বলো মাহ্‌তাব, কি বলছিলে? সত্যি এই এক মাস উপোস করে কি লাভ হয়।

মাহ্‌তাব : শম্‌শের ! আমরা যে ক্ষীর-সন্দেশ বা পোলাও-কোর্মা মসজিদে পাঠাই, তা কি আল্লাহ্‌ খান? ঐ ক্ষীর-সন্দেশই, ফিরনিই শিরনি হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। আমাদের অশুদ্ধ দেহ-মনের দান আল্লাহ্‌র নামে নিবেদিত হয়ে শুদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। এ আল্লাহ্‌র পরীক্ষা। তাঁর রহম ও রহমত্‌, কৃপা ও কল্যাণ পেতে হলে আমাদের দেহ-মনকে মাঝে মাঝে উপবাসী রাখতে হয়। এই উপবাসে দেহ-মনের ভোগের তৃষ্ণা যখন চলে যায়, তখনি ঈদের অর্থাৎ নিত্য-আনন্দের চাঁদ, পরমোৎসবের চাঁদ ওঠে।

শম্‌শের : সত্যি, এক মাস রোজা রেখে ঈদের যে অপূর্ব আনন্দ পাই—তা বৎসরের আর কোনো দিন পাওয়া যায় না।

মাহ্‌তাব : হ্যাঁ, এ তো দেহের রোজা, মনের রোজা রাখলে অর্থাৎ তাকে ভোগের থেকে ফিরিয়ে রাখলে দুর্ভোগ কমে যায়—শান্তি আনন্দ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেমে আসে।

গুলশন : চা সেমাই সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ! এর মধ্যে মহ্‌বুব ভাই-ই সবচেয়ে চালাক। ও রসও পান করছে, তত্ত্বও শুনছে। তোমরা তত্ত্ব-বিলাসী, তোমাদের রসের খোরাক জুড়িয়ে গেল।

মহ্‌বুব : গুলশনই বুলবুলকে চেনে। এইবার ওরা রস গিলুক, আমি গিলে ফেলেছি। তুমি গানের রস পরিবেশন করো।

গুলশন : আমার আবার গান ! শম্‌শের হয়তো রাগে ঝলমলিয়ে উঠবে।

শম্‌শের : ভয় নাই গুলশন, কাছে মাহ্‌তাব আছে—প্রেমে গলিয়ে দেবে।

(গুলশনের গান)

নাই হলো মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার।
আছে আল্লা আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার॥

নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি
ওতেই আমায় মানায় ভারি,
কল্‌মা আমার কপালে টিপ
নাই তুলনা তার॥
হেরা গুহার হীরার তাবিজ
কোরান বুকে দোলে,
হাদিস ফেকাহ্ বাজুবন্দ,
দেখে পরাণ ভোলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি, মা,
নবীর চার ইয়ার॥

শম্‌শের : সাবাস্ গুলশন। ঈদ মোবারক হো ! ঈদ মোবারক—গুলশন মোবারক !

গুলশন : বিদৌরা, মোবারক বলো ! নইলে পর্দার আড়ালে তার রাগ তিন পর্দা চড়ে যাবে।

বিদৌরা : শম্‌শের ভাই ! ভয়ে আসিনি, যা ঝলমল করছ।

শম্‌শের : বিদৌরা মোবারক ! মহ্‌বুব মোবারক ! না বিদৌরা, গুলশন এসে শম্‌শেরের ঝলমলকে মলমল করে তুলেছে।

মহ্‌বুব : সব মোবারক হলো—মাহ্‌তাব মোবারক হো, বল্‌লে না যে কেউ। মাহ্‌তাব মানে চাঁদ, এই মাহ্‌তাব, এই চাঁদই আমাদের নিরাশার আঁধার রাতে ঈদের চাঁদ এনেছে।

শম্‌শের : নিশ্চয়ই ! আমি তো ওরই হাতের শম্‌শের, তলোয়ার !

মহ্‌বুব : আমি তো ওরই প্রেমে মহ্‌বুব।

গুলশন : আমি ওরই রচিত গুলশন—শীর্ণ প্রান্তরকে ওরই আদর, ওরই যত্ন গুলশনে ফুলবনে পরিণত করেছে। বিদৌরা, চুপ করে রইলি যে !

বিদৌরা : আল্লাহ্ জানেন, ঐ মাহ্‌তাবের মহিমাই আমায় বিদৌরা করেছে।

মহ্‌বুব : এসো, আমরা সকলে মিলে ঐ আল্লাহ্‌র দান মাহ্‌তাবকে মোবারকবাদ দিই !

সকলে : ঈদ মোবারক হো ! মাহ্‌তাব মোবারক হো ! মাহ্‌তাব মোবারক !

শম্‌শের : আজকার ঈদগাহে তুমিই তো আমাদের ইমাম !

মাহ্‌তাব : আল্লাহু আকবার ! আমি ইমাম নই, আমি মুয়াজ্জিন। আমি আজান দিয়ে তোমাদের আনন্দের ঈদগাহে ডেকে এনেছি। মুয়াজ্জিন যে কেউ হতে পারে, ইমাম হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।

মহ্‌বুব : আমরা যদি বলি, আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছা তোমাতে অবতরণ করেছে !

মাহ্‌তাব : আল্লাহ্ আমায় সব অহঙ্কার, সব প্রলোভন থেকে রক্ষা করুন। ইমাম তোমাদের মাঝেই লুকিয়ে আছেন। তিনিই এই নবযুগের সর্বভ্রাতৃত্বের ঈদগাহে আত্মপ্রকাশ করবেন আল্লাহর ইচ্ছায়। জমায়েত সেদিন সার্থক হবে। সেই দিন

আমরা এই মহামিলনের ঈদগাহে সর্ব জাতিধর্ম, হানাহানি ঈর্ষা ভেদ ভুলে, সর্বধর্মের পূর্ণ সমন্বয়—সেই পরম নিত্য পরম পূর্ণ সনাতন আল্লাহ্কে একসাথে সিজ্দা করব—নামাজের শেষে অশ্রুসিক্ত চোখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবো। কোথায় সেই সর্বত্যাগী ফকির, কোথায় সেই মহা ভিক্ষু? এক আল্লাহ্ জানেন। আমি তাঁর বান্দা, হুকুম-বর্দার! যেদিন তাঁর হুকুম আসবে—সেদিন এই বান্দা তাঁর সিংহাসনের দিকে শির উঁচু করে ক্রন্দন করে উঠবে—আল্লাহ্, তোমার নিত্য দান তোমার হুকুম-বর্দার বান্দা হাজির!

মহ্বুব : ইনশাআল্লাহ্! মা শা আল্লাহ্। জাজা কাল্লাহ্! আল্লাহ্র হুকুম-বর্দারই অন্যকে হুকুম করতে পারে। সেই সর্বত্যাগী ফকিরই সামান্য জীবকে ইমাম করে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন। তিনি যে সকলের, তাই সকলকে ছেড়ে, জামাতকে ছেড়ে আগে গিয়ে দাঁড়ান না। আল্লাহ্র ইচ্ছা ইমাম হয়, আল্লাহ্ ত ইমাম হন না। আপনি যে আল্লাহ্র ইচ্ছা, আপনার সকল ইচ্ছা সেই পূর্ণ পরম ইচ্ছাময়কে সমর্পণ করেছেন। এক আল্লাহ্র ইচ্ছাই সকল ইমামকে পরিচালিত করে। মাহ্তাব ভাই, ক্ষমা করো, তুমি কি আল্লাহ্র সেই গোপন ইচ্ছা?

মাহ্তাব : (হাসিয়া) আল্লাহ্ জানেন। তোমরা যখন আমাকে এইসব কথা বলছিলে, আমার প্রতি অণু-পরমাণু কেঁপে আল্লাহ্র উদ্দেশে বলছিল, "আল্লাহ্ তুমি জানো, আমাদের ব্যক্ত-অব্যক্ত সর্ব-অস্তিত্ব তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়, পরিবর্তিত হয়। আমরা যদি সুন্দর হই, সে যে তোমার সাধ, তোমার ইচ্ছা, তোমার লীলা, তোমার বিলাস। তাই তোমরা যে ভালোবাসা প্রেম শ্রদ্ধা আমায় দাও, তা আমি আল্লাহ্কে নিবেদন করে দিই। আমার সর্ব-অস্তিত্বের যে তিনিই একমাত্র অধিকারী।

বিদৌরা : আচ্ছা মাহ্তাব ভাই, এই যে এত ছেলেমেয়ে কী যেন অজানা আকর্ষণে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চায়, প্রেম দেয়, মালা দেয়—তুমি তার কিছুই গ্রহণ করো না?

মাহ্তাব : চাঁদকে দেখে ফুল ফোটে, চকোর-চকোরী কাঁদে। চাঁদ ফুল ফুটায়, চকোরীকে কাঁদায়—কিন্তু সে ফুলের গন্ধ কি সে চকোরীর কাঁদন দেখে বিচলিত হয়? ঐ ফুলের গন্ধ চকোরীর ক্রন্দন, চাঁদকে ছুঁয়ে আল্লাহ্র কাছে চলে যায়। চাঁদ যদি ঐ দান নিত, তা হলে চাঁদ শুকিয়ে মরা তারার মতো ঘুরে বেড়াতো আঁধারের প্রেতলোকে। নদীতে যে ফুল ঝরে, নদী কি তা নেয়? সেই ফুল নদী তার প্রিয়তম মহাসাগরকে দেয়। উপনদী নদীতে পড়ে, সেই উপনদীর জল কি নদী নেয়? সেই উপনদীর জলকে সমুদ্রের জলে পৌঁছে দেয়।

গুলশন : এ কি করুণ বৈরাগ্য তোমার! কেন, কেন তুমি নিজেকে এত বেদনা দাও? কেন এমন নিষ্ঠুরের মতো তুমি নিজেকে অবহেলা করো, বঞ্চিত কর? তোমার এই নিজেকে এমন অবহেলাই আমাদের এমন করে কাঁদায়!

মাহ্তাব : (হাসিয়া) আমি খুলে বলি। তোমরা যে প্রেম আমায় দাও, তা যদি আমার কামনার অগ্নিতে পুড়ে দগ্ধ হয়ে যেত, তা হলে তোমরাও আমাকে হারাতে,

আমিও তোমাদের হারাতাম। আল্লাহ্‌কে দিয়েছি বলে তোমাদের প্রেম আজ এত বিপুল প্রবাহের আকার ধারণ করেছে। তোমাদের দেওয়া প্রেম আল্লাহ্‌কে দিয়েছি বলে সেই প্রেম আজ সকলে পাচ্ছে। আল্লাহ্ যে সর্বময়। যেখানে আল্লাহ্ নাই, তাঁর অস্তিত্বও নাই ; যেখানে অস্তিত্ব সেইখানেই আল্লাহ্। কাজেই আল্লাহ্‌র দেওয়া তোমাদের এই প্রেম তাঁকে দিলে তাঁর সকল অস্তিত্ব অর্থাৎ সমস্ত জড় জীব ফেরেশতা মানুষ সেই প্রেমের স্বাদ পায়। সেই প্রেমে তারা গলে যায়—তাদের সমস্ত মন্দ ভালো হয়ে যায়।

গুলশন : বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি পেলে?

মাহ্‌তাব : আমি আল্লাহ্‌কে পেলাম। অর্থাৎ তাঁরই অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছার সৃষ্টি তোমাদের সকলকে পেলাম। তাই আমার ঈদ ফুরায় না। আমার ঈদ ফুরায় আবার আসে। নদী যেমন সাগরকে নিত্য পেয়ে আবার নিত্য তার পানে 'পাইনি পাইনি' বলে কেঁদে কেঁদে ধায়, আমার মিলন-বিরহ তাঁর সাথে তেমনি নিত্য। এ বোঝাবার ভাষা নাই ; নদী হও, তখন বুঝবে। বিরহের রোজা না রাখলে কি প্রেমের চাঁদ দেখতে?

মহ্‌বুব : ভাগ্যিস তুমি স্নিগ্ধ চাঁদ, প্রখর সূর্য নও, তা হলে এতক্ষণ গলে মোম হয়ে যেতাম। বিদৌরা! একি! তুমি কাঁদছ কেন? চাঁদের এত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাও এমন করে গলায়! গোসলের সময় হয়ে এলো, আল্লাহ্‌র লীলা-সাগরে অবগাহন করলাম তবু গোসল করতেই হবে, এও তাঁর ইচ্ছা। এখন তাঁরই ইচ্ছায় "এলো ঈদ ঈদ" গানটা গাও ত!

(বিদৌরার গান)

এলো ঈদল-ফেতর এলো ঈদ ঈদ ঈদ।
সারা বছর যে ঈদের আশায় ছিল না ক' নিদ॥
রোজা রাখার ফল ফলেছে দেখ রে ঈদের চাঁদ,
সেহরী খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরা বাঁধ।
ওরে বাঁধ আমামা বাঁধ।
প্রেমাশ্রুতে ওজু করে চল্ ঈদগাহ্ মসজিদ॥

(আজ) ছিটায় মনের গোলাব-পাশে খুশির গোলাব-পানি
(আজ) খোদার ইশ্‌কের খশবু-ভরা প্রাণের আতর-দানি।
ভরল হৃদয়-তশ্‌তরিতে শির্‌নি তৌহিদ॥

(দেখ্) হজরতের হাসির ছটা ঈদের চাঁদে জাগে,
সেই চাঁদেরই রঙ যেন আজ সবার বুকে লাগে।
(এই) দুনিয়াতেই মিটলো ঈদে বেহেশ্‌তি উমিদ॥

ইত্তেফাক ১৩৬৫
বিশেষ ঈদ-সংখ্যা
৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

গুল-বাগিচা

গুল-বাগিচায় নৌ-বাহারের মরসুম। যৌবনের এই গুল-বাগিচার বুলবুলি, গোলাপ, চম্পা, চামেলি, ভ্রমর, প্রজাপতি, নহর, লতাকুঞ্জ, শারাব, সাকি—চির-তাজা। এখানে চির-বসন্ত বিরাজিত। সাকির হাতে শিরাজির পেয়ালা, কবির বুকে দিল্‌রুবা, রবাব বেণু, আর গজল-গানের দীওয়ান। এই গুলিস্তানের কবি চির-তরুণ, চির-কিশোর। কবির অঙ্গে হেলান দিয়ে লীলায়িত-দেহা কবির মানসী প্রিয়া। ফিরোজা রং-এর ওড়না, গোধূলি-রঙের পেশোয়াজ-পরা সুর্মামাখা ডাগর চোখে তার বিকশিত প্রেমের নিলাজ আকুতি। এই শীর্ণা তন্বী কবি-প্রিয়ার হাতে মৌন বীণা, অধরে অভিমান, পায়ের কাছে পড়ে গোলাপকুঁড়ির গুচ্ছ। চঞ্চল কবিকে তার বিশ্বাস নেই, কোনো প্রেমের বন্ধনে যেন এই চঞ্চলকে বাঁধা যায় না। এই আনন্দ-বিলাসী প্রজাপতিটাকে সে তার কিঙ্খাবের বক্ষ-আস্তরণে দিবানিশি লুকিয়ে রাখতে চায়,— প্রতি মুহূর্তেই হারাই-হারাই ভয়ে তার প্রেম চকিত, বেদনা-বিহ্বল। আকাশে চাঁদ—পৃথিবীর বুলবুলিস্তানে কবি—কাউকেই ধরা যায় না।

কবি ভাবেন—যৌবন আর ফুল সকালে ফুটে সন্ধ্যায় যায় ঝরে। ফুলের মালাকে মিলন-রাতের শেষে স্রোতে ফেলে দিতে হয়। —এই তার নিয়তি।

প্রতি মুহূর্তের আনন্দকে স্বীকার করে নিতে হয় তার উদ্ভবের শুভ মুহূর্তে। এ লগ্ন বয়ে গেলে—আর তা ফিরে আসে না। তাই সে হাতের ফুলকে কখন অভিনন্দিত করে, তখন না-ফোটা গোলাপের জন্য সে কাঁদে। যে ফুল ঝরে গেল, সেই মৃত ফুলের শবকে ধরে সে অতীতের শ্মশানে কাঁদে না।

কবি তাঁর উন্মনা মানসীর আঁখি-প্রসাদ পাওয়ার জন্য গেয়ে ওঠেন—

[গান]

আধো-আধো বোল, লাজে-বাধো-বাধো বোল
বলো কানে কানে।

যে-কথাটি আধো-রাতে মনে লাগায় দোল্—
বলো কানে কানে॥

যে-কথার কলি প্রিয়া আজো ফুটিল না,
শরমে মরম-পাতে দোলে আন্‌মনা,
যে-কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল—
বলো কানে কানে॥

যে-কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে,
না বলিতে যে-কথাটি জানাজানি লোকে,
যে-কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল—
বলো কানে কানে॥

যে-কথা বলিতে চাও বেশ-ভূষার ছলে,
বলে দেয় যে-কথা তব আঁখি পলে পলে,
যে-কথা বলিতে গিয়া গালে পড়ে টোল—
বলো কানে কানে॥

কবির কাব্যলক্ষ্মী আন্‌মনে কপোলে ঝুম্‌কো-চাঁপার পরশ বুলাতে বুলাতে গোলাপ-লতার বুলবুলির পানে চেয়ে থাকে। বাহিরে-পাওয়ার ব্যর্থতা তার মনে তোলে অশান্তির ঝড়। তাই সে তার সুন্দরের বিগ্রহ অন্তর-দেউলে প্রতিষ্ঠিত করে আনন্দ পেতে চায়। বাহিরের সুন্দর ঘুরে বেড়ায় বাহির-ভুবনে ; অন্তরের সুন্দরের চরণ নেই—নিশ্চরণ চারণকে বাঁধবার এই বোধ হয় সহজতম উপায়। তাই সে তার সুন্দরের অনুনয়ের বিনিময়ে গেয়ে ওঠে—

[গান]

মন দিয়ে যে দেখি তোমায়
তাই দেখিনে নয়ন দিয়ে।
পরান আছে বিভোর হয়ে
তোমার নামের ধেয়ান নিয়ে॥

হৃদয় জুড়ে আছ বলে
এড়িয়ে চলি নানান ছলে ;
আছ আমার অন্তরে, তাই
অন্তরালে রই লুকিয়ে॥

আমার কথা শুনাই না গো
তোমার কথা শোনার আশায় ;
ভরে আছে অন্তর মোর
বন্ধু তোমার ভালোবাসায়।

তোমায় ভালো বাস্‌তে পেরে
পেয়েছি মোর আনন্দেরে,
অমর হলাম প্রিয়, তোমার
বিরহেরই সুধা পিয়ে॥

কবি আর তাঁর মানসী দ্রাক্ষা-কুঞ্জে চোখে চোখে কথা কয় ; সুরে সুরে মনের ভাবের মালা গাঁথে—এ ওর গলায় দেয় ; আর সাকি পরিবেশন করে তাদের আনন্দের শিরাজি। তার আপন হৃদয়-পেয়ালা থাকে শুন্য, তাকে মুখ-ভরা হাসি নিয়ে তাদের বাসি হৃদয়কে সঞ্জীবনী-সুধা দিয়ে জীবন্ত করতে হয়। ও যেন ব্রজের ললিতা। রাধা-কৃষ্ণের

মিলন ঘটিয়ে তিনি তাঁর উপবাসী মনের প্রসাদ পান। তাই সাকির তৃষিত-আত্মা যে-গান গেয়ে ওঠে, তারই ভাষা ফুটে ওঠে কবির রবাবে।

[গান]

(যবে) আঁখিতে আঁখিতে ওরা কহে কথা
দু'টি বনের পাখি।
শুধু শিরাজি ঢালি, আমি চোখের বালি
আমি পাষাণ সাকি॥

রিক্ত ওদের হৃদয়-পেয়ালায়
আমি অমৃত ঢালি,
আমারই অন্তর শুধু পাইল না প্রেম-মধু
রহিল খালি।

(আমি) রহি' আভরণ-হীনা বাঁধি ওদের
হাতে প্রেমের রাখি॥
আমি হাসিয়া রচি যার কুঞ্জ-বাসর
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তারি জাগি রাতি ;
আমি শিয়রে রহি' হায় নিজেরে দহি
যেন মোমের বাতি।
আমি গাঁথিয়া মালা, দিই সখির হাতে,
দেখি কে দেয় কার মালা কার গলাতে ;
শিরাজি ঢালিতে হায় পিয়ালা ভাঙিয়া যায়
নিরালায় বন্ধুর মিলন-ছবি
আমি হৃদয়ে আঁকি॥

ফুল-চোর বুল্‌বুল্‌ কেবলই গুঞ্জন-গানে গুল-বাগিচা প্রতিধ্বনিত করে তোলে। তার নিবেদনের বাণী যেমন অশান্ত, তেমনি মধুর, তেমনি ব্যাকুল। তার স্তব্ধ গানের সুর দখিন হাওয়ার বুকে আবর্ত তোলে, সে যেন ফাগুন-মাসের ঘূর্ণি-হাওয়া। কবিতার উদাসীনা ধরা-না-দেওয়া প্রিয়ার শ্রবণে কেবলই গানের দুল্‌ দুল্‌তে থাকে—

মোর প্রিয়া হবে এস রানী, দিব
খোঁপায় তারার ফুল।
মনে দুলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতি চাঁদের দুল্‌॥
কণ্ঠে তোমার দুলাব বালিকা
হংস-সারির দুলানো মালিকা,
বিজলি-জরিন্‌ ফিতায় জড়াব
মেঘ্‌-রঙ্‌ এলোচুল॥

রামধনু হতে লাল রঙ্ ছানি'
আল্‌তা পরাব পায় ;
চাঁদ হতে এনে চন্দন, প্রিয়
মাখাব তোমার গায়।
গোলাপ-ফুলের পাপড়ি আনিয়া
রচিব তোমার বাসর, লো প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া কাঁদিবে আমার
কবিতার বুলবুল॥

কবির কাব্যশ্রী যাকে ঘিরে পুষ্পে সুষমায় বিভূষিত হয়ে ওঠে, সেই কবিতার দেবী কবির টলমল হৃদয়-কমলে টল্‌তে টল্‌তে গেয়ে ওঠেন—

সাকি ! বুল্‌বুলি কেন কাঁদে গুল্-বাগিচায়।
ও কি মধু যাচে, কেন আসে না কাছে
অকরুণ পিয়াসে কেন মুখ-পানে চায়॥

ওর করুণ বিলাপ শুনি' লতার গোলাপ আমি
ঝুরিয়া মরি।
আমি কাঁটা-লতায় বাঁধা কুলবধূ, হায়
যাই কেমন করি !
ও যে-শিরাজি মাগে, দিতে ভয় লাগে,
তাহা সঞ্চিত থাক্ অন্তর-পেয়ালায়॥

কত চামেলি হেনা ওর আছে চেনা,
আমি কণ্টক-বিজড়িত গোলাপ-কলি,
মোর ডাক-নাম ধরে কেন ডাকে ঘুম-ঘোরে
ভিখারির বেশে চাহে প্রেমাঞ্জলি।
ও কি বুঝিতে পারে না মোর মৌন ভাষা,
রক্তিম হৃদয়ের ভালোবাসা,
ঝরার আগে সাকি ওরে আমি পাব না কি
শুধু ক্ষণিকের তরে তৃষিত হিয়ায়॥

বহু-রস-পিয়াসি বৈচিত্র্য-বিলাসী কবি-মন যায় সাকির পাশে। তার না-বলা বাণী সে যেন তার অতীন্দ্রিয় শ্রবণ দিয়ে শুন্‌তে পায়।

প্রেমের কণ্টক-বিদ্ধ কবি সাকির দ্বারে গিয়ে ফিরে আসে। মুক্তপক্ষ মুক্ত আকাশের পাখিকে ডাকে নীড়ের মায়া। গুল-বাগের ছায়া-কুঞ্জে প্রেমের যে শান্ত নীড় রচেছে কবি-মানসী, তার মায়া মুক্তপক্ষের পাখা কণ্টক-বিদ্ধ করেছে—বহু-রূপের পিয়াসি-চিত্ত এক-রূপে আত্মস্থ হয়ে আজ শান্তি পেতে চায়। সাকি গুল্-বাগিচার বুল্‌বুলের হৃদয়ের প্রসাদ হৃদয়ে অনুভব করে। ভীরু কবিকে উদ্দেশ করে সে গেয়ে ওঠে—

[গান]

মুখের কথায় নাই জানালে,
জানিও গানের ভাষায়।

এসেছিলে মোর কাছে, হে পথিক,
কিসের আশায়॥

আপন মনের কামনারে
রাখ্‌লে আড়াল অন্ধকারে,
আপ্‌নি তুমি কর্‌লে হেলা
আপন ভালোবাসায়॥

সাধ ছিল যে-হাত দিয়ে গো
পরিয়ে দেবে হার,
দ্বিধা ভরে সেই হাতে, হায়
কর্‌লে নমস্কার !

নিশুত্‌ রাতে বলো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে,
কেন এমন গোপন কর
বুক-ভরা পিয়াসায়॥ *

---

* অধ্যাপক রফিকুল ইস্‌লামের সংগ্রহ থেকে।

অতনুর দেশ

যৌবনের তীর্থক্ষেত্র অতনুর দেশে তরুণ-তরুণীর নিত্য সমারোহ। কারো চোখে জল, কারো চোখে জ্বালা; কারো হাতে ফুল, কারো বুকে কাঁটা; কারুর হৃদয়ে অমৃত, কারুর হৃদয়ে বিষ। এই মহা-তীর্থে তনুতে তনুতে অতনু দেবতার ক্ষণ-ভঙ্গুর দেউল, কামনার ধূপ সেখানে নিত্য জ্বলছে, ঝরা-ফুল মরা-হৃদয় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে তার পায়ের তলে। যে তরুণী বুকে আশার বাতি জ্বালিয়ে এই তীর্থে এলো, সে গেয়ে ওঠে—

[গান]

ওগো সুন্দর, তুমি আসিবে বলিয়া
বন-পথে পড়ে ঝরি
রাঙা অশোকের মঞ্জরি।
হাসে বন-দেবী বেণীতে জড়ায়ে
মালতীর বল্লরী
নব কিশলয় পরি॥

কুমুদী-কলিকা ঈষৎ হেলিয়া
চাঁদেরে নেহারি হাসে মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর-ভ্রমরী
ফিরিতেছে গুঞ্জরি॥

যাহা কিছু হেরি ভালো লাগে আজ
লুকাইতে নারি হাসি,
কাজ করি আর শুনি যেন কানে
মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।

এক শাড়ি খুলে পরি আর শাড়ি,
বারে বারে মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরু দুরু হিয়া ওঠে চমকিয়া,
অকারণে লাজে মরি॥

হৃদয়ের এই তীর্থ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য উদাসীন পুরুষ আর বিরহিণী নারীর অশ্রুমতী নদীর তীরে মিলন। নিবিড় বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় নির্মম, উদাসীন বৈরাগী; সেই নিবিড় বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ প্রেম-পথযাত্রী সেই বিরহ-যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায়—

[গান]

আমার কথা লুকিয়ে থাকে
আমার গানের আড়ালে।
সেই কথাটি জানার লাগি
কে গো এসে দাঁড়ালে॥

শুন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী,
গান গেয়ে তাই কাটাই দিবারাতি,
সেই হৃদয়ের গভীর বনে
কে তুমি পথ হারালে॥

হৃদয় নিয়ে নিদয় খেলার
হয় যেখানে অভিনয়,
চেয়ো না সেই হাটের মাঝে
আমার মনের পরিচয়।

যে বেদনার আগুন বুকে লয়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখা হয়ে,
সেই বেদনা জুড়াতে মোর
কে তুমি হাত বাড়ালে॥

এই তীর্থ-ভূমির গোপন বেদনা-কুঞ্জে বসে ভিরু কিশোরী ডাকে তার প্রিয়তমকে—রাতের রজনীগন্ধা যেমন করে ডাকে আকাশের চাঁদকে। সবাই যখন ঘুমায়, সে তখন জাগে। সবাই যখন জাগে, তার প্রেম তখন লজ্জার অবগুণ্ঠন টেনে লুকিয়ে থাকে। নীরব আধো-রাতে শোনা যায় তার কুণ্ঠিত কণ্ঠের সুর—

[গান]

চাঁদের মতো নীরবে এসো প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
নব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ-জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি গোপনে এসো,
বিজড়িত রহিও স্মৃতির সাথে॥

কুসুম-সুরভি হয়ে এসো নিশি-পবনে।
রাতের পাপিয়া হয়ে পিয়া পিয়া ডাকিও বন-ভবনে।
আঁখি-জল হয়ে আঁখিতে আসিও,
বেণুকার সুর হয়ে শ্রবণে ভাসিও,
বিরহ হয়ে এসো হে চির-বিরহী
আমার অন্তর-বেদনাতে॥

অতনুর এই রস-লোকে বয়ে যায় অনন্ত রসের প্রবাহিনী। মুখে হাসি, চোখে জল—যেন রোদে রোদে বৃষ্টি। অন্তরে অনুরাগ, বাহিরে রাগ—যেন সাপে-মানিকে জড়াজড়ি। ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা বধূকে কথা কওয়াবার সাধনায় কোন তরুণের কণ্ঠে সকরুণ মিনতি ফুটে ওঠে—

[গান]

কথা কও, কও কথা, থাকিও না চুপ করে।
মৌন গগনে হেরো কথার বৃষ্টি ঝরে।
থাকিও না চুপ করে॥

ধীর সমীরণ নাহি কহে যদি কথা,
ফোটে না কুসুম, নাহি দোলে বন-লতা,
কমল মেলে না দল, যদি ভ্রমর না গুঞ্জরে।
থাকিও না চুপ করে।

শোনো, কপোতীর কাছে কপোত কি কথা কহে,
পাহাড়ের ধ্যান ভাঙি মুখর ঝর্ণা বহে।

আমার কথার লঘু মেঘগুলি, হায় !
জমে হিম হয়ে যায় তোমার নীরবতায়,
এসো আরো কাছে এসো কথার নূপুর পরে !
থাকিও না চুপ করে॥

মৃদুভাষিণী তরুণী মৃদু মৃদু হাসে আর বলে—

[গান]

শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা।
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে
কহে যাহা বন-লতা॥
চুপ করে চাঁদ সুদূর গগনে
মহা-সাগরের ক্রন্দন শোনে,
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা॥

মনের কথা কি মুখে সব বলা যায় ?
রাতের আঁধারে যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায় ?
পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়,
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহে না চঞ্চলতা॥

অভিমানী সুরের কবি অকারণে অকরুণ হয়ে ওঠে মনে মনে। তার কেবলই মনে হয়, হৃদয়ের এই জলাভূমিতে নিশীথ-রাতে যে আলো দেখা যায় তা আলো নয়— আলেয়া। এই প্রেম-তীর্থে সে তাই বসে থাকে উদাসীন সন্ন্যাসীর মত। অর্ঘ্য নিয়ে আসে যদি কোন নিবেদিতা—তাকে সে দেয় ফিরিয়ে। সে যেন বলতে চায়—

[গান]

আমায় নহে গো, ভালোবাসো শুধু ভালোবাসো মোর গান।
গানের পাখিরে কে চিনে রাখে
গান হলে অবসান॥

চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে,
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে
তুমি বুঝিবে না, বুঝিবে না আলো দিতে কত
পোড়ে প্রদীপের প্রাণ॥
যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল হায়
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
ফুল নিয়ে তার দিয়েছ কি কিছু
শূন্য পত্রপুটে?
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কি তৃষ্ণা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহা-সাগরের কাছে
করো তার সন্ধান॥

কঠিন গিরি-মাটির তলে ফল্গুধারার মত উদাসীন পুরুষের গৈরিক বসনের অন্তরালে যে বেদনার ঝর্না-ধারা, তাকেই লক্ষ করে গেয়ে ওঠে নিবেদিতা নারী—

[গান]

আমি জানি তব মন, আমি বুঝি তব ভাষা।
(তব) কঠিন হিয়া-তলে জাগে কী গভীর ভালোবাসা॥

ওগো উদাসীন, আমি জানি তব ব্যথা
আহত পাখির বুকে বাণ বিঁধে কোথা,
কোন অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা॥

তুমি কেন হানো অবহেলা অকারণে আপনাকে!
প্রিয় যে হৃদয়ে বিষ থাকে, সে হৃদয়ে অমৃত থাকে।
(তব) যে-বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা,
(আমি) দেখেছি যে সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ক্ষুধাতুর! আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব পরানের পিপাসা॥

এই তীর্থধামে মিলনের ব্রজে বেজে ওঠে মাথুরের বিদায়-বাঁশি। যে বিরহ আনে অশ্রু, সেই বিরহই জ্বালায় আগুন। যে মেঘ ফুল ফোটায়, সেই মেঘেই থাকে অশনি। বিরহের তপস্যা যে পুরুষকে করেছে উদাসীন সন্ন্যাসী, মিলনের বিলাস-কুঞ্জে সে তার প্রিয়ার মৃত্যু-কামনা করতে পারে না। তাই নির্মম হয়ে সে চলে যায় নিরুদ্দেশের পথে। পথের প্রান্তে লুটিয়ে কাঁদে তার বিরহিনী প্রিয়ার মত তার গানের সুর—

[গান]

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে?
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে॥

আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর
নিশীথ-অন্ধকারে॥

দয়া কর মোরে দয়া কর,
আর আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা;
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না প্রিয়
সেই শুভ লগনের বেলা।
আমি ফিরি পথে, তাহে কার ক্ষতি,
তব চোখে কেন সজল মিনতি?
আমি কি ভুলেও কোন দিন এসে
দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে॥
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে॥*

পরিক্রম
বৈশাখ, ১৩৬০

---

* জনাব আসাদুল হকের সংগ্রহ থেকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া

(নাটক)

চরিত্র

পুরুষ :

শ্রীগৌরাঙ্গ (নিমাই)
শ্রীনিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত
শ্রীবাস
মুকুন্দ
গদাধর
ঈশান
সনাতন মিশ্র
চন্দ্রশেখর আচার্য
যাদব
মাধব
বুদ্ধিমন্ত

স্ত্রী :

শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া
শচীমাতা
সর্বজয়া
মালিনী
সীতাদেবী
কাঞ্চনা
অমিতা
নদীয়া নাগরীগণ
কুল-ললনাগণ

প্রথম দৃশ্য

[শ্রীগৌরাঙ্গ–বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ–বাসর। সবেমাত্র কন্যা সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে। বিপুল জনগণের (কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের) মুহুর্মুহু আনন্দ–ধ্বনির সহিত অজস্র যন্ত্রের মধুর সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। হুলু ও শঙ্খধ্বনির যেন বিরাম নাই।]

জনৈকা কন্যাপক্ষীয় দাসী : বর কনেকে এখন বাসর–ঘরে নিয়ে এসো না গো ! কন্যা সম্প্রদান ত কখন হয়ে গেছে। ওদের ছাত্‌নাতলায় ধরে রেখে যেন সব ঠাকুর দেখছেন।

বরপক্ষীয় জনৈক লোক : হ্যাঁ গো ঠাকুরণ ! আমরা ঠাকুরই দেখছি এই যুগল-মিলন ত তোমরা মেয়ের দল সারারাত ধরে প্রাণ ভরে দেখবে। আর আমরা বেচারা পুরুষের দল বাইরে বসে কড়িকাঠ গুণ্‌ব।

অন্য আর একজন : বেঁচে থাক দাদা। জোর বলেছিস। যুগল-মিলনের এই গোলক-ধামে ঠাকুর এ-চোখোমী করতে পারবে না। আর করলেও আমরা তা মানব কেন। আধাআধি বখ্‌রা কর—রাজি আছি। অর্ধেক রাত আমরা দেখব—অর্ধেক রাত তোমাদের ছেড়ে দেব।

অন্য আর একজন বরপক্ষীয় লোক : হেরে গেছে ! হেরে গেছে ! আমাদের বর বড়—বর বড় !

কন্যাপক্ষীয় দুইজন : কক্‌খনো না, কনে বড়। এই আমরা তুলে ধরলাম কনেকে।

বরপক্ষীয় লোক : পিঁড়ি যতই উঁচু কর না দাদা, আমাদের বরের নাগাল পাচ্ছ না—পুরো পাঁচ হাত লম্বা বর।

যাদব : কাকিমা মানা করছেন, তোমরা দিদিকে এত উঁচুতে তুলো না, দিদি পড়ে যাবে।

কন্যাপক্ষীয় দাসী : ওগো, মা ঠাক্‌রুণরা বলছেন, তোমাদের বরই বড়। এখন ওদের বাসর-ঘরে আনতে ছেড়ে দাও।

বরপক্ষীয় লোক : হেরে গেছে ! কনে হেরে গেছে। দুও ! দুও !

যাদব : (মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া) হেঁরেঁ গেঁছেঁ। হেঁরেঁ গেঁছেঁ ! কখ্‌খনো না, দিদি বড়, জামাইবুবু ছোট !

বরপক্ষীয় লোক : তোমরা যতই চ্যাঁচাও, আমরা যুগল-মিলনের গান না গেয়ে ছাড়ছিনে। কনেকে বরের বাম-পাশে দাঁড় করাও, আমরা দেখি, যুগল-মিলনের গান গাই তারপর,—না কি বল বুদ্ধিমন্ত !

বুদ্ধিমন্ত : নিশ্চয় ! তা'হলে মুকুন্দ তুমিই গানটা গাও আর আমরা ধুয়া ধরি।

[মুকুন্দের গান]

একি অপরূপ যুগল-মিলন হেরিনু নদীয়া-ধামে
বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী যেন রে গোলক-পতির বামে॥
একি অতুলন যুগল-মূরতি
যেন শিব-সতী হর-পার্বতী
জনক-দুহিতা সীতা দেবী যেন বেড়িয়া রয়েছে রামে॥
গৌরের বামে গৌর-মোহিনী
(যেন) রতি ও মদন চন্দ্র-রোহিণী
(তোরা) দেখে যারে আজ মিলন-রাসে
যুগল রাধা-শ্যামে॥

(হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উভয় পক্ষীয় লোকের আনন্দ চিৎকার, মধুর বাদ্যধ্বনি ইত্যাদি)

দ্বিতীয় দৃশ্য
বাসর–ঘর

[বাসর–ঘরে নদীয়া নাগরীগণ ও কুলমহিলাগণের হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কলগুঞ্জন, বলয়–কিঙ্কিনীর সুমধুর ঝঙ্কার।]

জনৈক মহিলা : মাগো মা, অনেক বিয়েও দেখেছি, বরযাত্রীও দেখেছি, কিন্তু এমন আদেখ্‌লে বরযাত্রী আর দেখিনি। ওরাই ত আদ্ধেক রাত্তির করে দিলে, তার ওপর বর–কনের খাওয়া–দাওয়া নিয়ে গেল ঘন্টাখানেক।

অন্য একজন মহিলা : যা বলেছ দিদি, সব রস ওরাই নিংড়ে নিলে ওদের কেঠো হাত দিয়ে। আমাদের দিলে ছিব্‌ড়ে চিবুতে।

পূর্ব মহিলা : নেলা নে, বাকি যেটুকু রাত আছে তাও হট্টগোল করে কাটিয়ে দিস্‌নে। নাও, জামাইয়ের বামে একবার কনেকে নিয়ে বসাও দেখি। আহা, কি মানিয়েছে—ওলো তোরা দেখ্‌, একবার নয়ন ভরে দেখ্‌। সোনার গৌরের পাশে সোনার পিত্তিমে। বিয়ের এত আলো যেন এদের রূপের কাছে মিটমিট করছে।

অন্য একজন পুরস্ত্রী : কি গো বর মশাই? আজ যে বড় জিভ উলটে নিম্নমুখো হয়ে বসে আছ। তোমার চঞ্চলতায় নাকি সারা নবদ্বীপ কম্পমান, তোমার দাপটে নাকি গঙ্গার স্রোতে কাদা উঠে, আর আজ আমাদের সখীকে দেখে একেবারে গুটিসুটি মেরে বসে আছ। ভয় হচ্ছে নাকি?

নিমাই : আজ বাসর–ঘরে আপনারাই কর্ণধারিণী। আমার দেহ–তরীর মাত্র দুটি কর্ণ, আর তা দেখে আপনাদের শত কর্ণধারিণীর দু'শ হাত উসখুস করছে; তাই ভয় হচ্ছে—তরী আমার ভরা–ডুবি না হয়।

জনৈক মহিলা : ওলো, চঞ্চলের মুখ খুলেছে। সাবধান! ভাল করে সব কর্ণ ধরিস্‌, পাশে রয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া জোয়ারের টানের মত। তাই বুঝি ওঁর ভরসা যে, আমাদের হাত থেকে কর্ণ ছাড়িয়ে চলে যাবেন।

জনৈক কিশোরী : এই চঞ্চল আমাদের কম জ্বালিয়েছে, ভাই। গঙ্গায় এঁর জ্বালায় সোয়াস্তিতে নাইবার উপায় ছিল না। দল বেঁধে সাঁতরে গঙ্গাজলকে যেন দধি–কাদা করত। কখন যে কলসি নিয়ে মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিত, মেয়েদের কাপড় নিয়ে পুরুষদের ঘাটে, পুরুষদের কাপড় নিয়ে মেয়েদের ঘাটে রেখে আসত, আমরা টেরও পেতাম না। তারপর কুমীর হয়ে ডুব–সাঁতার দিয়ে পায়ে ধরে টান। আমরা কিছু ভুলিনি, আজ কড়ায়–গণ্ডায় তার শোধ নেবো। বুঝলে চঞ্চল পণ্ডিত?

নিমাই : আমায় পণ্ডিত বলে গালাগালি করছেন কেন? তার চেয়ে কঠিন করাঘাত ঢের মিষ্টি। যে চুরি করতে ভয় পায় না, শাস্তি নিতেও তার ভয় নেই।

অমিতা : তুই এমন এলিয়ে পড়ছিস্‌ কেন লা বিষ্ণুপ্রিয়া? ক্লান্ত যদি হয়ে থাকিস্‌ বরের গায়ে হেলান দিয়ে বস্‌ না!

বিষ্ণুপ্রিয়া : (চুপি চুপি) ভাই অমিতা ! আমার কিছু ভালো লাগছে না। বাসর-ঘরে আসবার সময় কেমন যেন অজ্ঞানের মত এলিয়ে পড়েছিলাম।

অমিতা : তাত পড়বিই। এত সুন্দর বর পেলে সবাই মূর্চ্ছে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া : যাঃ ! শুনবে যে ! না ভাই শোন্—সেই সময় হোঁচট খেয়ে আমার আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে।

অমিতা : মাগো ! কি হবে ! একি অলুক্ষণে কথা গো !

দু'একজন মহিলা : কি রে, কি হল অমিতা ! কি বলছিস্ তোরা।

বিষ্ণুপ্রিয়া : চুপ ! চুপ ! বলিস্নে কাউকে।

অমিতা : কিচ্ছু না। এমনি। তোমরা চোরের শাস্তি দিচ্ছ দাও না। হ্যাঁ, তারপর? কি করলি তুই?

বিষ্ণুপ্রিয়া : আমি বোধ হয় উহ্ করে উঠেছিলাম। অমনি উনি ওর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার পায়ে আঙুল চেপে ধরলেন। অমনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বেদনাও আর রইল না। তবু কেন যেন আমার বুক কাঁপছে ভাই ভয়ে।

বিধুমুখি : কি হয়েছে মা ! তোমার মুখ চোখ অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া : কিচ্ছু না, কাকি মা। সত্যি, কিছু হয় নি।

অমিতা : সারাদিন উপোস করেছে, তারপর খেয়েই এই হট্টগোল। তুমি যাও কাকি মা, আমরা আছি। বেশি ক্লান্ত হলে ওকে আমরা শুইয়ে দেবো।

একজন মহিলা : ইস্ ! শুইয়ে দিলেই হল আর কি। আমরা বুঝি যুগল-মিলন দেখব না। ছাত্না তলায় শুভ দৃষ্টির সময় যেমন হেসে দু'জন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলে, তেমনি করে আর একবার চাও, নৈলে ছাড়ছিনে।

নিমাই : তা যত ইচ্ছা চিম্‌টি কাটুন, ও অপকর্ম এত লোকের সামনে করতে পারব না।

উক্ত মহিলা : কি ! অমন সুন্দর মুখের দিকে চাওয়া বুঝি অপকর্ম। লুকিয়ে লুকিয়ে এর মধ্যে তো একশ'বার দেখে নিলে, আমাদের চোখ তোমাদের চোখের মত ডাগর না হলেও দেখতে পাই।

নিমাই : তাহলে আবার ধরা পড়ে গেছি। চোরের আবার শাস্তি চলুক।

জনৈক তরুণী : এবার শাস্তি হাত দিয়ে নয়, কথা দিয়ে।

অন্য একজন তরুণী : শুধু কথার বাণ নয় লো, তাতে সুরের বিষ মিশিয়ে।

নিমাই : প্রমীলার দেশে যখন এসে পড়েছি তখন আর উপায় ত নেই। আঁখি-বাণ সহ্য করেও যদি বেঁচে থাকতে পারি, বাক্যবাণও বোধ হয় সইবে।

জনৈক তরুণী : তাহলে বীর প্রস্তুত হও।

[গান]

প্রেম-পাশে পড়লে ধরা চঞ্চল চিত-চোর।
শাস্তি পাবে নিষ্ঠুর কালা এবার জীবন-ভোর॥

মিলন-রাসের কারাগারে
প্রণয়-প্রহরী রাখব দ্বারে
চপল চরণে পরাব শিকল নব অনুরাগ-ডোর॥
শিরীষ-কামিনী ফুল হানি' জরজর করিব অঙ্গ
বাঁধিব বাহুর বাঁধনে দংশিবে বেণী-ভুজঙ্গ
কলঙ্ক-তিলক আঁকিব ললাটে হে গৌর-কিশোর॥

(হুলুধ্বনি, আনন্দধ্বনি ইত্যাদি—বাহিরে বাদ্য।)

তৃতীয় দৃশ্য
নিমাই পণ্ডিতের ভবন

[কাঞ্চনা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফুল-সজ্জায় সজ্জিত করিতেছে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে। গানে শব্দ শোনা যাইতেছে না, তবে তাহার করুণ সুরে সারা গৃহ যেন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।]

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুমি কেবলই গান করছ আর আমায় ফুলের গয়না পরাচ্ছ, তুমি কে ভাই? কতবার জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম ত বললে না। এখন কেউ নেই, এস এই বেলা আমরা সই পাতিয়ে নি। লোক এসে পড়লে আর কথা বলতে পারব না।

কাঞ্চনা : সতীনের সঙ্গে সই পাতালে দুঃখ পাবে ভাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া : সতীন?

কাঞ্চনা : হ্যাঁ সতীন। শুধু আমি নই ভাই, এই নদীয়া নগরের সকল কিশোরী কামিনী তোমার সতীন। তোমার ভাগ্যের ঈর্ষা করে, রূপের হিংসা করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া : (হাসিয়া) ওঃ। সেই সতীন ! তাহলে তোমায় সতীন বলে ডাকব?

কাঞ্চনা : চুপ ! দেয়ালেরও কান আছে। কেউ শুনতে পাবে এখন। আর অমনি সে ছুটে এসে আমাকে দেখিয়ে বলবে, ও নয়, আমিই তোমার সতীন। আচ্ছা ভাই গৌর-প্রিয়া—

বিষ্ণুপ্রিয়া : (কাঞ্চনার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) আমার নাম গৌর-প্রিয়া নয়, আমি বিষ্ণুপ্রিয়া।

কাঞ্চনা : এতদিন বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলে, এখন গৌর-প্রিয়া হয়েছে।

(সুরে)

তার কে গড়িল গৌর-অঙ্গ
চাঁদে চন্দন মাখিয়া গো
আমি শান্তি না পাই তারে কোথাও রাখিয়া গো
এই বুঝি হবে চুরি সদা ভয় ভয়
হৃদয়ে পাইয়া তবু কাঁপে এ হৃদয়
নয়নে পেয়ে যে চাঁদে তবু এ নয়ন কাঁদে

কোথা পাব হেন ঠাঁই যথা আর কেহ নাই
থাকিবে দু'জন, গৌর আর গৌর-প্রিয়া গো॥

শচীমাতা : পাগলী মেয়ে, বসে বসে গান গাচ্ছিস বুঝি? বউমাকে সাজানো হল?

কাঞ্চনা : হ্যাঁ মা, কখন সাজানো হয়ে গেছে। দেখ দেখি কেমন মানিয়েছে।

শচীমাতা : আহা মরে যাই! কি সুন্দর সাজাতে পারিস্ তুই কাঞ্চনা। চিরএয়োতী হয়ে বেঁচে থাক মা। তোমার স্বামীকে ফিরে পাও! আমি আসি, তোরা তাহলে ফুলশয্যার ব্যবস্থা কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তোমার নাম কাঞ্চনা? কি মিষ্টি নাম। যেমন দেহের কাঞ্চন বর্ণ তেমনি নাম। আর গুণ—

কাঞ্চনা : কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

কয়েকটি তরুণী : মা গো! পান সাজতে সাজতে হাত আমাদের চুণে খেয়ে ফেললে। কাঞ্চনা বেচারী একা—ওলো দেখে যা, কি সুন্দর সুন্দর ফুলের গয়না দিয়ে কাঞ্চনা বউকে সাজিয়েছে। আহা! যেন দুগ্‌গো পিত্‌তিমে।

দুই-তিনজন : চমৎকার!

একজন : কাঞ্চনা আর জন্মে বৈকুণ্ঠের মালিনী ছিলি ভাই!

অন্য একজন : কাঞ্চনা দিদি! মা মাসিমা কেউ নেই, এই বেলা এই ফুলসাজের একটা গান গেয়ে শোনা না ভাই! নতুন বৌ জানুক যে তুই শুধু মালিনী নস—গানে—কি বলব ভাই? নাচেতে উর্বশী—গানে—গানে—

অন্য একজন মেয়ে : সরস্বতী। নে ভাই, এই বেলা টুক্ করে গেয়ে নে, নইলে ভিড় জমলে তুই ও গাইবিনে, আমরাও শুনতে পাব না।

[কাঞ্চনার গান]

মুকুল-বয়সী কিশোরী সেজেছে ফুল্ল ফুল-মুকুলে।
শিরে কৃষ্ণচূড়ার মুকুট, গলে মালতীর মালা দুলে॥
যুঁথি ফুলের সিঁথি-মোর, দোলন-চাঁপার দুল
কটিতটে চন্দ্রহার হলুদ-গাঁদার ফুল
অশোক-কুঁড়ির রাঙা নূপুর রাঙা চরণ-মূলে॥
কদম-ফুলের রত্ন বাজু বকুল ফুলের চুড়ি
হাতে শোভে কেয়ূর কাঁকন কুন্দ বেলের কুঁড়ি।
আসবে কবে বনমালী ঘুমে ফুল-বালা পড়ে ঢুলে ॥

চতুর্থ দৃশ্য

শচীমাতা : নিমাই! এ ঘর ও ঘর করে কি খুঁজছিস্ বাবা?

নিমাই : (আমতা আমতা করিয়া) কি যেন খুঁজছিলাম মা, খুঁজতে খুঁজতে ভুলে গেছি।

শচীমাতা : (হাসিয়া) তুই থির হয়ে বস দেখি। আমি বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। (যাইতে যাইতে) বৌমা ! নিমাইকে পান দিয়ে এস ত মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া : ছি ছি ছি ছি ! মা কি মনে করছেন বল ত। পড়াতে পড়াতে পাঁচবার ত পান চাইতে বাড়িতে এলে।

নিমাই : এবার কিন্তু পান চাইতে আসিনি। পড়াতে বসে কিসের যেন সূত্র ভুলে গেলাম--তাই একটা বই খুঁজতে এলাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুমি ভারি দুষ্টু ! তুমি কখ্খনো বই খুঁজতে আসনি। আমি জানি তুমি কি খুঁজতে এসেছ।

নিমাই : বৌ খুঁজতে,—লক্ষ্মী ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : আচ্ছা, তুমি আমায় আমার সতীনের নাম ধরে ডাক কেন বল ত ? লক্ষ্মী ত তোমার প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল। তুমি দিদিকে খুব ভালোবাসতে, না ?

নিমাই : খুব ভালোবাসলে সে কি ছেড়ে যেতে পারত ? তাই এবার বিয়ে করে তোমাকে নিয়ে আবার খুব ভালোবাসার সাধনা আরম্ভ করেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া : যাও ! সত্যি বল না, কেন আমায় যখন তখন ও বলে ডাক ?

নিমাই : যিনি লক্ষ্মী তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া, যে বিষ্ণুপ্রিয়া সে-ই লক্ষ্মী। আচ্ছা, এবার থেকে তোমায় প্রিয়া বলে ডাকব, তাহলে খুশি হবে ত ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : তোমার পায়ে পড়ি, ওতে আমার আরও লজ্জা করবে, তার চেয়ে তুমি বরং লক্ষ্মীই বলো।

নিমাই : আরে, আমি কি পাড়ার লোক ডেকে সভা করে, তোমায় প্রিয়া বলে ডাকব ? এই আড়ালে আড়ালে—দু'জনে যখন এমনি একা থাকব, তখন।... আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রিয়া, তুমি সত্য করে বলবে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : ও কি কথা বলছ তুমি ! তুমি যে স্বামী, নারায়ণ, তোমার কাছে মিথ্যা বললে যে আমার মরলেও স্থান হবে না।

নিমাই : আমি দোজবরে বলে কি তোমার মনে কোনরূপ দুঃখ আছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : (অশ্রু ছল ছল কণ্ঠে) তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন কথা বলো না, ওকথা শুনলেও পাপ হয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি—তোমার মুখে শোনবার আগে ও-কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয় নি। তুমি কেন এ-কথা বললে বল ! ও-কথা মনে আসবার আগে যেন আমার মরণ হয়—মরণ হয়—

নিমাই : ওকি ! এই সামান্য কথায় এমন করে কাঁদতে আছে? তুমি এত কষ্ট পাবে জানলে আমি কখনই এ-কথা বলতাম না। আমি এমনি রহস্য করে বললাম মাত্র, আর অমনি মানিনীর মানে আঘাত লাগল। আচ্ছা, আর একটি কথার উত্তর দাও দেখি। বিয়ের আগে তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : যাও ! কে তোমাকে এ-কথা বললে ? তুমি সকলের অন্তর্যামী কি না।

নিমাই : নিশ্চয়ই। আমি যখন স্বামী অর্থাৎ কি না নারায়ণ, কাজেই অন্তর্যামীও। নৈলে তোমার অন্তরের কথা কি করে জানলাম?

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুমি কিছু জান না। জানলে বিয়ের আগে অমন করে কাঁদতে না।

নিমাই : ও! তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে একবার সম্বন্ধ ভাঙ–ভাঙ হয়েছিল, সেই কথা বলছ বুঝি? তাতে কিন্তু আমার কোন দোষ ছিল না। আমাকে না জানিয়েই মা কাশী মিশ্রকে পাঠিয়ে ছিলেন সম্বন্ধ ঠিক করতে। তাই তোমাদের গণক ঠাকুরকে বলেছিলাম, আমি বিয়ের কিছু জানিনে। কিন্তু তারপর আমি ত আবার লুকিয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া : সে তোমার দয়া। সবাই বলে, তুমি করুণাময়। নৈলে আমার কি দশা হত তাই ভাবি।

নিমাই : তাহলে তোমারও দশা পাবার অবস্থা হয়েছিল বল। তাই ত বলি, রোজ রোজ গঙ্গার ঘাটে আমার মাকে তোমার এত ঘটা করে প্রণাম করার মানে কি। আর দিনে দশবার করে গঙ্গার ঘাটে আসারই বা হেতু কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুমি পণ্ডিত মানুষ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ, তাই ধোঁয়া দেখলেই সেখানে আগুনের সন্দেহ কর। আমার বয়ে গেছিল তোমাকে দেখতে যাবার জন্য। আমি যেতুম মাকে দেখতে।

নিমাই : কিন্তু মা ত থাকতেন তোমার ঘাটেই, তুমি হাঁ করে আমি যে ঘাটে সাঁতার কাটতাম সেদিকে চেয়ে থাকতে কেন?

[দূরে কাঞ্চনার গান]

সিনান করিতে গিয়েছিনু সই সেদিন গঙ্গাতটে।
উদয় হলেন গৌরচন্দ্র অমনি হৃদয় পটে॥
নির্মল মোর মনের আকাশে
উঠিয়া সে চাঁদ মৃদু হাসে,
তারে লুকাইতে নারি, সখি ভয়ে মরি, বুঝি কলঙ্ক রটে॥

নিমাই : (এক লাইন গানের পর) আমি পালালুম কিন্তু। তোমার মুখরা সখীকে আমার বড় ভয়। ও কোন্ দিন আমাকে ধরিয়ে দেবে দেখছি।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

কাঞ্চনা : পণ্ডিত মশাই ভয়ে পালিয়ে গেলেন বুঝি?

বিষ্ণুপ্রিয়া : কার ভয়ে কাঞ্চনা?

কাঞ্চনা : ধরা পড়ার ভয়ে।

বিষ্ণুপ্রিয়া : দূর পোড়ামুখি! আচ্ছা ভাই কাঞ্চনা, তুই যখন তখন ওকে কঠিন কথা শুনাস্, তোর ভয় করে না?

কাঞ্চনা : একটুকুও না। ঐ দুরন্ত পণ্ডিত মশাইটি চিরকাল আমার কাছে জব্দ। ছেলেবেলায় ওর ভয়ে আর সব মেয়ে অস্থির থাকত, কিন্তু আমায় দেখলেই উনি একেবারে কেঁচোটি হয়ে যেতেন। আমি বলতাম, তোমাদের সকলের সঙ্গে আড়ি, আর আমার সঙ্গে ভাব কেন? উনি বলতেন—ভক্তিকে ভগবান বড় ভয় করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : আচ্ছা, ভয় না হয় নাই করলি, পর-পুরুষ বলে লজ্জাও হয় না?

কাঞ্চনা : ওঁর সঙ্গে আমার এই ভাব ত লুকানো ছাপানো নয় ভাই গৌর-প্রিয়া, সারা নদীয়ার লোক জানে ওঁর আমার এই প্রীতি। আমি এই পাড়ারই মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে ওঁকে দেখেছি, আজন্ম ওঁর সঙ্গে খেলেছি—আর আমাদের সে খেলায় লজ্জার কিছু ছিল না। তা ছাড়া ওঁকে আমার কখনো পর-পুরুষ বলে মনে হয় না, যখনই দেখেছি মনে হয়েছে উনি আমার পরম পুরুষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া : কাঞ্চনা, তোর মত প্রেম যদি পেতাম—

কাঞ্চনা : তাহলে ওঁর টোল এতদিন উঠিয়ে দিতেন, আর রাতদিন উনি তোমারই পাঠশালায় প্রেমের পাঠ নিতেন, এই ত?

বিষ্ণুপ্রিয়া : যাঃ! তোর সঙ্গে কথায় সরস্বতীও হার মেনে যায়—

কাঞ্চনা : আর তোমার গুণে যে লক্ষ্মী স্বর্গে পালালেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুই আমাকে সতীনের কথা মনে করিয়ে দিস্ কেন বল ত? আচ্ছা ভাই, দিদি খুব সুন্দরী ছিলেন, না? আর তোর সঙ্গে ওঁর বুঝি আমার চেয়েও বেশি ভাব ছিল?

কাঞ্চনা : হ্যাঁ, সুন্দরী খুবই ছিলেন, তবে তোমার মত না। ওঁর রূপে চাঁদের জ্যোতির চেয়ে সূর্যের তেজ বেশি ছিল। আর ভাব আমার এতটুকু ছিল না ওঁর সঙ্গে। যখন তখন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করতাম আর বলতাম—ঠাকরুণ তুমি বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী। আমাদের ব্রজেশ্বরীর আসবার সময় হল, এবার তুমি সরে পড় না। এ রসের ব্রজে ব্রজেশ্বরী আর গোপিনীদের লীলা তুমি সইতে পারবে না। ঠাকরুণ ভালো মানুষ, এই সব শুনে এবং বুঝে স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : কাঞ্চনা, কেন তুই ওঁর কথা এলেই ওঁকে ভগবান ভেবে কথা বলিস্ বল ত? তোর কথা শুনে আমার বড় ভয় হয়, সই। উনি যদি সত্যি সত্যিই ভগবান হয়ে যান তাহলে আমার কি অবস্থা হবে? আমি কোথায় দাঁড়াব? এক একবার আমারও মনে হয় উনি ছল করে মানুষ সেজে এসেছেন। ওঁর চোখ মুখ রূপ গুণ সব যেন বলে দেয়, আমি কারুরই নই—আমি একা।

কাঞ্চনা : সত্যিই উনি পরম একাকী। আমাদের নিয়ে যে ওঁর এই লীলা এ ওঁর অসীম দয়া। তোমার কেন ভয় হয় গৌর-প্রিয়া জানি না, আমার কিন্তু ভয় হয় না। না, না, ভয় হয় বলেই তুমি ব্রজেশ্বরী, গৌরবক্ষ-বিলাসিনী। তুমি যে প্রেমময়ী তাই

মধুর রূপ ছাড়া তাঁর অন্য রূপের কল্পনাও করতে পারো না। আমরা সাধারণ মানুষ,—তাই দেবতাকে প্রিয়রূপে ভাবতে পারি না।

নিমাই : যাক। আমি আর পণ্ডশ্রম করে মরি কেন, কাল থেকে টোলের ছাত্রদের বলে দেবো, এই ঘরেই তারা ভাগবতের পাঠ নেবে।

কাঞ্চনা : (চিৎকার করিয়া) মা দেখে যাও, আবার আমাদের জ্বালাতন করছে। তোমার ছেলেকে সামলাও, নৈলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

শচীমাতা : নিমাই ! আবার কেন ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে বাবা ? ওরা দুটিতে আপনার মনে আলাপ করছে—

নিমাই : আলাপ নয় মা প্রলাপ, একবার শুনে যাও না এসে।

শচীমাতা : তা ওরা যা ইচ্ছা বকুক, তোর তাতে কাজ কি বাপু ? আমি তখন থেকে কলা আর দুধ নিয়ে বসে আছি—আয় খেয়ে নে।

কাঞ্চনা : মা, দুধকলা খাইয়ে ওঁকে পুষছ—বুঝবে যখন দংশন করে চলে যাবে।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

শচীমাতা : বৌমা ! একি মা লক্ষ্মী। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছ ? ছি মা ! কাঁদতে নেই, নিমাই-এর আমার অমঙ্গল হবে। এইমাত্র খবর পেলুম, নিমাই কাল গয়া থেকে ফিরে আসবে। পাগলি মেয়ে, বললাম দু'দিন মায়ের কাছে গিয়ে থেকে এসো, তবু খানিকটা মন ভাল থাকবে। তা আমায় ছেড়ে যেতে চাইল না।

বিষ্ণুপ্রিয়া : মা, উনি যে যাবার সময় তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করতে বলে গেছেন। আর, তোমাকে মা পেয়ে আর কেউ যে আমার মা ছিল, তা ভুলেই গেছি।

শচীমাতা : ও-কথা বলিস্‌নে মা। আমার বেয়ান শুনতে পেলে আমায় ডাইনি বলবে।—ঐ কাঞ্চনা আসছে—তোমরা দু'টি সখিতে বসে গল্প কর—হ্যাঁ মা, আর ওকেও বলো যে আমার নিমাই কাল ফিরে আসবে—আমি যাই—মালিনী সইকে,—সর্বজয়াকে জানিয়ে আসি খবরটা।

[কাঞ্চনার গান]

প্রথম যৌবনে এই প্রথম বিরহ গো।
(তাই) সহিতে না পেরে রাই, কাঁদে অহরহ গো।
(ফুল) শয্যারে মনে হয় কন্টক শয্যা
কাঁদিতে পারে না, যত ব্যথা তত লজ্জা,
প্রবাসী বঁধুরে ঘরে আসিতে কহ গো॥

বিষ্ণুপ্রিয়া : কাঞ্চনা সই, তোর গান এখন রাখ। শোন, মা বলে গেলেন, উনি কাল আসবেন।

কাঞ্চনা : (সুরে) কাল কাল করে গেল কতকাল
কালের নাহিক শেষ
কাল নাই যথা বন্ধুরে লয়ে
যাব আমি সেই দেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া : সত্যি বলছি, মা এইমাত্র ছোট মাসীকে খবর দিতে গেলেন। মার সে কি খুশি ভাই, যত হাসেন তত কাঁদেন।

কাঞ্চনা : আমার কিন্তু না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস হয় না, ভাই। যদি আসেন তাহলে বুঝব এবার নবদ্বীপে এসে ঠাকুর ভদ্রলোক হয়েছেন। ভদ্রলোকের যে কথা রেখে চলতে হয় এ জ্ঞান ত ওঁর ব্রজে ছিল না, আর ও–জ্ঞান হবেই বা কোত্থেকে! গয়লা ছোঁড়াদের সঙ্গে গরু চড়িয়ে কে কবে ভদ্রলোক হয়েছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া : না ভাই লক্ষ্মীটি, ঠাট্টা রাখ্। এখন কি করব বল দেখি? আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করছে, শরীর কাঁপছে।

কাঞ্চনা : করবে আর কি। এস দুই সখীতে গলা ধরে ধেই ধেই করে নাচি। এতদিন যে বিরহ আমাদের কাঁদিয়েছে, সেই বিরহের বুকে বসে তার দাড়ি উপড়াই।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তোর কথা আমার কিছু ভাল লাগছে না, কাঞ্চনা। কাল যদি ভোর না হতেই এসে পড়েন, তখন ফুল পাব কোথা। এখনও সন্ধ্যা লাগে নি, তুই পাড়ায় গিয়ে কার বাড়িতে কি ফুল পাওয়া যায়, দেখ্ না লক্ষ্মীটি।

কাঞ্চনা : আচ্ছা, আমি চললাম। আমি কিন্তু বেছে বেছে সেই ফুল আনব, যে ফুলে কাঁটা আছে। (প্রস্থান)

শচীমাতা : এই ঘরে বেয়ান, এই ঘরে তোমার মেয়ে। সর্বজয়া, মালিনী সই, তোমরাও এসো বৌমার ঘরে—বৌমা, বৌমা, দেখ আমার দুই বেয়ানকে, তোমার মাকে, খুড়ীমাকে ধরে এনেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া : একি! মা! খুড়ীমা!

মহামায়া : আহা! মা আমার এই ক'দিনে কি রকম শুকিয়ে গেছে, দেখেছিস্ বিধু।

বিষ্ণুপ্রিয়া : আমার কোলে বসে থাকতে লজ্জা করছে মা, নিচে নেমে বসি।

মহামায়া : ওরে তোর কোলে ভগবান যদি সন্তান দেন, তখন বুঝবি সন্তানকে কোলে নিয়ে মায়ের কত সুখ!

বিষ্ণুপ্রিয়া : আমি বুঝি এখনও খুকি আছি? ঐ দেখ ছোট মাসীমা, রাঙা মাসীমা আসছেন এ–ঘরে।

শচীমাতা : ওতে লজ্জার কি আছে বৌমা? নিমাই যেদিন বিয়ে করে প্রথম তোমায় নিয়ে এল ঘরে, আমিই যে সেদিন লজ্জার মাথা খেয়ে অত লোকের মাঝে তোমায়

কোলে নিয়ে নেচেছিলাম। বৌমা, এই যে, তোমার মাসীমারা এসেছেন, প্রণাম করে ওঁদের পান এনে দাও।

সর্বজয়া, মালিনী : (একজনের পরে অন্যজনে) থাক থাক মা, বেঁচে থাক চির এয়োতী হয়ে।

যাদব : দিদি ! দিদি ! কাল জামাইবাবু আসছেন। আমাকে যাবার সময় বলে গেছিলেন, তোমার জন্য লাল শাড়ি আনবেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : (চুপে চুপে) আঃ ! যাদব, চুপ কর।

নিমাই : মা ! মা ! আমি এসেছি—আর তোমার জন্য গয়া থেকে এনেছি কৃষ্ণপ্রেম।

সপ্তম দৃশ্য

তাহার পরদিন দুপুরবেলা

শচীমাতা : নিমাই ! তোর কি হয়েছে বাবা ? গয়া থেকে পিতৃতর্পণ করে এসে কেবলই কাঁদছিস। এই দুপুর পর্যন্ত বৌমা কতবার এসে ঘুরে গেল, একবার তাকে ডেকে দুটো কথাও বল্‌লিনে ? তোর চোখের জলে যে ঘর উঠোন কাদা হয়ে উঠল, বাপ।

নিমাই : (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা, গয়া থেকে এসে আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

শচীমাতা : কেন বাবা, কি জন্য কিছু ভাল লাগছে না ? নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে তোর খ্যাতি, সহস্র পড়ুয়া তোর ছাত্র, কন্দর্পের মতন রূপ, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর মত আমার বৌমা, তোর আবার দুঃখ কিসের, বাবা ? আমি কত আশা করে বসেছিলাম, গয়ার কত গল্প শুনাবি এসে। কিন্তু এসে অবধি কেবলই অঝোর নয়নে কাঁদছিস্। ভগবান আমাকে চিরদিন দুঃখ দিলেন। পর পর সাত মেয়ে মারা যাবার পর তোর দাদা বিশ্বরূপ এলো আমার কোলে। কিশোর বয়সে সে আমাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল, তারপর তোর বাবা স্বর্গে গেলেন। তুই ছাড়া এখন যে আর আমার কেউ নেই, মানিক। তোকে পেয়েই আমার সকল দুঃখ ভুলে ছিলাম। তুই যদি সুখি না হোস্, তা হলে আমার আর এ জীবনে কাজ কি !

নিমাই : কি করব, মা, আমি যে আর কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করতে পারছিনে। আমি কেবলই দেখছি নব-জলধর শ্যাম সুন্দর কান্তি পরম মনোহর এক কিশোর কেবলই বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে আমায় ডাকছে। গয়া থেকে ফেরার পথে কানাই নাটশালা গ্রামে প্রথম দেখি সেই দুরন্ত কিশোরকে। বাঁশিতে তার সে কি অশান্ত আহ্বান, মা, তা না শুনলে বোঝাতে পারবো না। সে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল বৃন্দাবনের পথে। আমিও ছুটলাম, কিন্তু পারলাম না তার সাথে যেতে—আমায় সকলে ধরে নিয়ে এলো নদীয়ায়। মা, তুমি এখন যাও, বাইরে মুরারী গুপ্ত বসে আছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসছি।

অষ্টম দৃশ্য
নিমাই-এর বহির্বাটি

নিমাই : মুরারী, আমাকে চিনতে পারছ?

মুরারী : তোমাকে চিনেছি যখন তুমি তোমাকে চেননি তখন থেকে। তোমার মনে নেই? তখন আমি যোগবাশিষ্ট পড়ি। রাস্তায় সহপাঠীদের সাথে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের ঘোর নিন্দা করতে করতে চলেছি, এমন সময় তুমি ভীষণ বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলে। তখন তোমার বয়স পাঁচ বৎসরের বেশি হবে না।

নিমাই : হ্যাঁ, তারপর? আমার কিন্তু বিন্দু বিসর্গ মনে নেই।

মুরারী : এইরূপে বারবার তুমি মুখ ভ্যাঙচে আমাকে বিদ্রূপ করায় আমি রেগে গিয়েছিলাম, জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এক অকাল-কুষ্মাণ্ড জন্মগ্রহণ করেছে। তাই শুনে তুমি যেন বল্‌লে, আচ্ছা এর শাস্তি পাবে। তারপর (মুরারী অভিভূতের মত বলিতে লাগিলেন) দুপুরে যখন খেতে বসেছি তখন শঙ্খধ্বনির মত কার কণ্ঠস্বর ভেসে এল "মুরারী"! আমি চমকিত হয়ে চেয়ে দেখি, তুমি গৌরসুন্দর নবনটবর শিশুরূপে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

নিমাই : তুমি ভক্তলোক, তাই ভক্তিবলে অন্য কাউকে দেখেছ। যাক, বল।

মুরারী : তুমি আরক্ত নয়নে আমার পানে চেয়ে বললে, ভগবানকে ভক্তি ছাড়া শুষ্ক জ্ঞান চর্চায় যারা পেতে চায়, আমি তাদের থালায় প্রস্রাব করি। বলে আমার থালে প্রস্রাব করে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে। তারপর তোমায় দেখি শ্রীগঙ্গাধর পণ্ডিতের টোলে। সেখানে আমায় কেবল সিলেটি-বাঙাল বলে ক্ষেপাতে। তোমার যন্ত্রণায় যখন আমি টোল ছাড়ব ছাড়ব করছি, তখন একদিন তর্কের ছলে আমার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলালে, আর অমনি আমার সকল প্রাণ মন তোমার পায়ে যেন লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই : আজ আবার কি মনে করে এসেছ?

মুরারী : তুমি ডেকেছ, নৈলে তোমার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এমন ক্ষমতা কার আছে? আজ ভোরে স্বপ্ন দেখছিলাম, তুমি এসে আমায় ডাকছ—"মুরারী"। তুমি আমায় যে রূপে দেখতে চেয়েছিলে, আজ সেই মহাপ্রকাশের উদয়-ঊষা, দেখবে, এসো। আজ এসে তোমার কান্না-অরুণ চোখে সেই উদয়-ঊষার জবাকুসুমসঙ্কাশ দ্যুতি দেখলাম। তুমি নিজে ধরা না দিলে তোমায় ধরবে কে? তুমি নিজে দেখা না দিলে তোমায় দেখতে পাবে কার সাধ্য?

নিমাই : মুরারী! শুনছ! কে বাঁশি বাজায়, ঐ—ঐ—দেখেছ—ঐ মূর্তিই আমি দেখেছিলাম গয়া থেকে ফেরার পথে—

(সুরে)

নব কিশলয়-শ্যামল তনু ঢল ঢল অভিরাম
অপরূপ রূপ-মাধুরী হেরিয়া মূরছিত কোটি কাম।

গলে বনমালা শিরে শিখি-পাখা
পীত ধড়া-পরা ত্রিভঙ্গ বাঁকা
বাজায় মুরলী রাধা রাধা বলি
নওল কিশোর শ্যাম।।

নিমাই : ঐ পালিয়ে যায়—মুরারী—মুরারী ধর ঐ চঞ্চলকে—ধর ঐ কৃষ্ণকে—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ। (মূর্ছা)

মুরারী : ঈশান ! ঈশান ! শিগ্‌গির জল আন, প্রভু মূর্ছা গেছেন।

নবম দৃশ্য
বিষ্ণুপ্রিয়ার কক্ষ

ঈশান : দিদিলক্ষ্মী ! বলি এমনি করে পড়ে পড়ে কাঁদলে কি এর কিনারা হবে ? না, দা ঠাউরকেও ঘরে বেঁধে রাখা যাবে ? এই শালার পাঁচ ভূতে মিলে আমার সোনার ঠাকুরকে পাগল করে নেচিয়ে নিয়ে ফিরছে। দিদিলক্ষ্মী, যদি এজ্ঞে কর, তাহলে ঐ বুড়ো ঈশানই ঐ ভূতের বাপের ছেরাদ্দ করে ছাড়বে। যত সব আবাগের বেটা ভূত—এমন সোনার সংসার ছারেখারে দিলে গা !

বিষ্ণুপ্রিয়া : ঈশান, কারুর দোষ নয়। দোষ আমার অদৃষ্টের। আমার ওঁকে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলেই ওঁকে সংসারে রাখতে পারলাম না।

ঈশান : বলি, তোমার ক্ষমতাটা কিসে কম হল, দিদিলক্ষ্মী ? থাকত আমার গিন্নি বেঁচে, তাহলে তোমায় এমন বুদ্ধি বাৎলে দিয়ে যেত যে, দা ঠাউর আর একদণ্ড তোমায় ছেড়ে যেতে পারত না।

বিষ্ণুপ্রিয়া : দিদিমা বশীকরণ-মন্ত্র জানতেন নাকি, ঈশান দা ?

ঈশান : মেয়েদের আবার মন্তর-ফন্তর লাগে নাকি, দিদিলক্ষ্মী, ভগবান তোমাদের সবচেয়ে বড় তুক দিয়েছেন, মান আর চোখের জল। এই দুই তুকের জোরে ভগবান পর্যন্ত কাবু, তা ঠাউর ত কোন্ ছার ! যৈবনকালে আমি একবার রাগের মাথায় বাড়ি ছেড়ে দু'দিনের জন্য পেলিয়েছিলাম, আর তাই পাড়ার লোকে রটিয়ে দিলে আমি সন্নেসী হয়ে গিয়েছি। তারপর দিদিলক্ষ্মী রাগ পড়লে বাড়ি যখন ফিরলাম, তখন সে যা কুরুক্ষেত্রকাণ্ড বাধল তা কইবার নয়। বেড়ালের লড়ুই দেখেছ ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : দিদিমা কি আঁচড়াতে কামড়াতে পারতেন ?

ঈশান : তারও বাড়া দিদিলক্ষ্মী, তারও বাড়া। চুল ছিঁড়ে, কাপড় ছিঁড়ে, কেঁদে কেটে, মাথা কুটে—বলি তাতেও কি রাগ থামে—শেষে দিদিলক্ষ্মী আমায় ধরে দে ধনাদ্ধন দে ধনাদ্ধন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : বল কি ঈশান দা, দিদিমণি তোমায় মারতে লাগল ? সোয়ামীর গায়ে হাত তুললে ?

ঈশান : আরে দিদিলক্ষ্মী, উনাকে যে তখন ভূতে পেয়েছিল। উনার কি তখন জ্ঞানগম্মি ছিল? আর ও-বয়সে পরিবারের মার কি গায়ে লাগে? আমার মনে হতে লাগল যেন পুষ্প-বিষ্টি হচ্ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তুমি এইরকম পুরুষ মানুষ, ঈশান দা? তোমায় ধরে মারলে আর তুমি চুপ করে সয়ে গেলে?

ঈশান : দিদিলক্ষ্মী, কইলে পাপ হয়, নৈলে দা ঠাউরকে দু'একটা ঠোনাঠুনি দিয়ে দেখ দেখি ওঁর কেমন মিষ্টি লাগে। এই আশিটা বছর বয়স হল, তবু সেদিনের কথা মনে হলে সুখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। আমি বলি কি দিদিলক্ষ্মী, চোখের জলের অনুপান দিয়ে ঐ ঔষুধ অল্প মাত্রায় একটু দিয়ে দেখবে নাকি?

নিমাই : কি ঈশান? কোন্ ওষুধের কথা বলছ? মাথায় ত মধ্যম নারায়ণ তেল মাখতে শুরু করেছ, এখন বাকি হাতে পায়ে শিকল-বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা, তারই পরামর্শ আঁটছ বুঝি?

ঈশান : এজ্ঞে, দা ঠাউর! আমি দিদিলক্ষ্মীকে বলছিলাম, মধ্যম নারায়ণ তেল মাথায় না দিয়ে তোমার সঙ্গী ঐ উনাদের মাথায় দিলে কাজ দিত। কি করি, বৈষ্ণব মানুষ, দিদিলক্ষ্মীও গো-বেচারি মুখচোরা মানুষ, নৈলে ভূত তাড়াবার ওষুধ আমার কিছু জানা ছিল।

নিমাই : কি ঈশান দা! ওঁরা ভক্ত লোক, ওঁদের নিন্দা করলে পাপ হয়।

ঈশান : দা ঠাউর! তোমার তেনারা নারায়ণ বলেন, ভগবান বলেন। কিন্তু ভগবানের কি এই বিচার হল? আমি ছেলেবেলা থেকে তোমায় কোলেপিঠে নিয়ে মানুষ করলুম, তোমায় একদণ্ড না দেখলে আমার মনে হত যেন আকাশের সূয্যি নিভে গেছে।— যাক্, আমার কথা না হয় বাদই দিলাম, তোমার অমন দয়াময়ী দু:খিনী মা, এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর মত বৌ—এনারা তোমার কেউ নয়? আমরা ছাড়া বিশ্ব-সংসারের আর সবাই হল তোমার আপনার জন?

বিষ্ণুপ্রিয়া : ছিঃ ঈশান দা, ওঁকে অমন করে বোলোনা। উনি যাতে সুখী হন—আমার তাতেই সুখ।

ঈশান : তুমি থামো দিদিলক্ষ্মী, আমি জন্মে থেকে এ বাড়ির চাকর, দা ঠাউর ত দুধের ছেলে, ওঁর বাবা মা পর্যন্ত কেউ আমাকে একদিনের জন্য একটা কথা বলতে পারেনি। আজ যদি রেগে দা ঠাউর আমায় তাড়িয়ে দেয়—

নিমাই : ওকি কথা বলছ ঈশান দা! তোমার পায়ের ধুলো পেলেও যে সে পরম ভক্ত হয়ে উঠবে—আমি তোমায় তাড়িয়ে দেবো? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন কথা বলো না—।

ঈশান : হরে কিষ্ট! হরে কিষ্ট! দা ঠাউর, একি করলে তুমি? আমার পা ছুঁলে! কোটি জন্মেও যে আমার এ পাপের ক্ষয় হবে না। চিরটা কাল তুমি তোমার ধুলো মাখা পা নিয়ে আমার বুকে খেলা করেছ—ঐ রাঙা পায়ের ধুলো পেয়ে চোখের জলে বুক

ভেসে গেছে—হায় হরি—আজ তুমি এ কি করলে? যাই, দৌড়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। (যাইতে যাইতে) হরে কিষ্ট, হরে কিষ্ট!

দশম দৃশ্য

নিমাই-এর ভবন

[একজন ভিখারি দ্বারে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে—]

বিদায় দে মা, একবার দেখে আসি
(যে) বৃন্দাবনে রাখাল সনে কালো শশী বাজায় বাঁশি॥
সারাদিনের কাজের মাঝে
দেখি যে সেই রাখাল-রাজে
(ওমা) বাজে শুনি নিশীথ রাতে তারি বাঁশি মন-উদাসী॥

শচীমাতা : বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাড়িতে এসে রোজ রোজ ঐ গান গেয়ো না। তোমার যদি অন্য গান জানা না থাকে, তোমায় গান করতে হবে না, এমনি ভিক্ষা পাবে।

ভিখারি : মা গো! শ্রীকৃষ্ণ জানেন, আমি ইচ্ছা করে এ গান গাই না তোমার বাড়িতে। তোমার বাড়ির দোরে এলেই আমার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। কে যেন জোর করে আমায় এই গান গাওয়ায়।

ঈশান : দেখ বাবাজী বৈষ্ণব, অপরাধ হয় হবে, কিন্তু ফের যদি এসে ঐ গান গাও, আমি তোমার গাবগুবাগুব ভেঙ্গে, ঝোলা ছিঁড়ে, টিকি উপড়ে, ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে ছাড়ব। ত্রিসংসারের লোক কি জোট পাকিয়েছে এই সোনার সংসার ছারেখারে দেওয়ার তরে? একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। এমনেই দা ঠাউরের মুখে ঘর ছাড়ব রব লেগেই আছে—তার ওপর—

বিষ্ণুপ্রিয়া : ঈশান দা!

ঈশান : রও দিদিলক্ষ্মী। তুমি চোখ রাঙিও না, এ বাড়িতে আমি বেম্মা বিষ্ণুকে ভয় করি না। এই সোনার সংসারে আগুন লাগাবার জন্য যত হনুমান লেগে পড়েছে। সব হনুমানের আমি ল্যাজ কাটব তবে আমার নাম ঈশান।

নিমাই : মা! মা! আমার দাদা ফিরে এসেছেন। এই দেখ, আমার দাদা বিশ্বরূপ।

শচীমাতা : নিমু! কি বললি! আমার বিশ্বরূপ ফিরে এসেছে? এই কি আমার বিশ্বরূপ, আমার হারানো মানিক?

নিত্যানন্দ : হ্যাঁ মা, আমিই তোমার বিশ্বরূপ। মন্দ লোকে আমায় মাতাল অবধূত বলে, আর দুষ্ট লোকে বলে নিত্যানন্দ।

শচীমাতা : যে যা বলে বলুক তুই-ই আমার বিশ্বরূপ, আয় বাপ আমার কোলে আয়। ওরে! এত সুখ কি আমার সইবে? নারায়ণ! নারায়ণ!

নিমাই : দেখলে মা, আমি গয়ায় না গেলে কি দাদা আসতেন, না তুমিই বিশ্বরূপ দেখতে পেতে?

শচীমাতা : ওরে আমি বিশ্বরূপ দেখতে চাইনে। আমার কোল জুড়ে এমনি শিশু হয়ে, মানুষ হয়ে তোরা থাক, ঐ আমার স্বর্গ মোক্ষ সব। যাক বাবা, আমার খ্যাপা নিমাই এত দিন অসহায় ছিল, এখন তুমিই তাকে দেখো। এত দিনে নারায়ণ আমার নিমুর জন্য দুর্ভাবনা দূর করলেন।

নিত্যানন্দ : দোরের আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন আর কাঁদছেন, ওমা লক্ষ্মীটি কে মা?—ও কি মা, তোমার চোখে জল কেন? তোমার লুকিয়ে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই, মা লক্ষ্মী। এইবার যে তোমারও প্রকাশের দিন এলো। মা, এসো এসো, একবার নয়ন ভরে যুগল-মিলন দেখি।

শচীমাতা : লজ্জা কি বৌমা, এসো, এ যে আমার নিমুর দাদা, এসে প্রণাম কর।

নিত্যানন্দ : দোহাই মা লক্ষ্মী, ওটি হতে দিচ্ছিনে। আমার পায়ের ধুলো অত সস্তা নয়। ঐ পদ্মফুলের পাপড়ির মত হাতে কি এই অবধূতের পায়ের ধুলো লাগাতে আছে। যে হাত দিয়ে নারায়ণের সেবা হয়, সেই হাতে পায়ের ধূলা! একবার নদের চাঁদের বামে গিয়ে দাঁড়াও ত মা, আমার সন্ন্যাস সার্থক হোক, জীবন ধন্য হোক দেখে। ওকি, পালালে? আচ্ছা মা লক্ষ্মী, আজ পালালে পালাও, কিন্তু যুগল-মূর্তি আমি দেখবই।

শচীমাতা : ওমা! ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেই আছি, খেতে যে দিতে হবে তা মনেই নেই। আয় বাপ, তোরা দু'ভাইয়ে এসে খাবি। ঈশান!

ঈশান : (অশ্রু গদ্গদ কণ্ঠে) মা?

শচীমাতা : একি বাবা ঈশান, তুমি অমন ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে কেন? এ যে আমার বিশ্বরূপ, আমার বিশু, নিমাই ওকে ধরে এনেছে। চিনতে পারছ না? আমি দেখি গিয়ে কি আছে ঘরে।

ঈশান : চিনেছি, মা। তবে আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। তুমি যাও মা, আমি জায়গা করে দিচ্ছি।

নিত্যানন্দ : ঈশান দা, আমাকে সন্দেহ হচ্ছে বুঝি?

ঈশান : সত্যি করে বল দেখি, তুমি কে? তুমি বিশ্বরূপ না বিষ-রূপী কেউ?

নিমাই : ঈশান-দার দিবারাত্তির সন্দেহ আর ভয়। এ বাড়িতে যে আসে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে।

নিত্যানন্দ : ওর সন্দেহ ভুল নয়, কানাই—থুড়ি—প্রভু, থুড়ি নিমাই। সোনার গৌরকে চুরি করার জন্যে ত্রিভুবনের চোর যে নদীয়ায় এসে জুটবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

ঈশান : ঠিক—ঠিক বলেছ সন্ন্যাসী ঠাউর। শুধু চোর-ডাকাত বাটপার জোচ্চোরে নদীয়া ভরে উঠল—সকলের চোখ আমাদের এই সোনার গৌরাঙ্গের উপর। ডাকিনী, যোগিনী, ভূত পেরেত, পিশাচ, যক্ষী রক্ষী সব যেন জোট বেঁধে এসেছে। কি বলব, আমার হাতের খেঁটে লাঠি আমার হাতেই রইল, তা দিয়ে একটা মাথা ভাঙ্গতে

পারলেও আমার মনের জ্বালা কিছু কমতো। যাই, খাবার জায়গাটা করে দিই গিয়ে।

নিত্যানন্দ : [গান]

কানাইরে কই তোর চূড়া বাঁশরি !
তুই নাকি সেই নন্দ দুলাল
এলি নদীয়ায় ব্রজ পাশরি ?

নিমাই : [গান]

কি পুছসি আমারে ভাই
এবার চূড়া বাঁশরি নাই।
ব্রজের খেলা বাঁশির তান
নদের খেলা হরি-গান ;
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া, নদের বেশ কৌপীন পরা
ব্রজের খেলা রাখাল হয়ে, নদের খেলা ধূলি লয়ে।

নিত্যানন্দ : (গানে) নদীয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়া, ব্রজের রাই কিশোরী।।

একাদশ দৃশ্য

[নিমাই আহার করিতেছে, শচীদেবী সম্মুখে বসিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করিতেছেন।]

শচীমাতা : নিমাই, তুই খাবার সময় অন্য দিকে চেয়ে কি ভাবিস্ বল্ ত ? ভাবতে হয় খাওয়া শেষ হলে ভাবিস্।

(আড়ালে) কাঞ্চনা : মা কি কিছু বুঝতে পারেন না সই ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : কি বুঝতে পারেন না, কাঞ্চনা ?

কাঞ্চনা : তুমি যখন পরিবেশন কর, তখন উনি খাওয়া ভুলে হাঁ করে তোমাকেই গিলতে থাকেন দু'চোখ দিয়ে। এরি মধ্যে চোখের মাথা খেয়েছ ? তাও দেখতে পাও না ?

বিষ্ণুপ্রিয়া : যাঃ, তুই কি যে বলিস্ কাঞ্চনা ?

কাঞ্চনা : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার পায়ের পাঁইজোরের শব্দ শুনলেই উনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেন। দেখছ না, এর মধ্যে ত একশবার মুখের গ্রাস হাতে নিয়ে তোমাকে আড় চোখে দেখে নিলেন। মা ধমকে তাঁর এই মধুর ভাবটা নষ্ট করে দিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া : পোড়ামুখী, আস্তে, মা শুনতে পাবেন।

শচীমাতা : বাবা নিমাই, কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

নিমাই : কি স্বপ্ন, মা বল।

শচীমাতা : তুই আর নিত্যানন্দ দুইজনে যেন পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছিস বাড়িতে। এমন সময় দুইজন যেন ঠাকুর-ঘরে ঢুকলি। তুই হাতে করে বলরাম নিয়ে বেরিয়ে এলি, আর নিত্যানন্দ বেরিয়ে এল হাতে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে।

তারপর আমার সামনে চারজন মিলে মারামারি হুল্লোড় করতে লাগলি। বলরাম আর কৃষ্ণ যেন বলছেন, তোমরা এ ঘর থেকে বেরোও। এ ঘরের ক্ষীর ননী দই সন্দেশ এ-সব আমাদের। তোমরা কেন ভাগ বসাতে এসেছে এখানে? নিতাই বললে—সে কাল আর নেই ঠাকুর—যে কালে ক্ষীর ননী লুটে খেয়েছ—এখন তোমরা বেরোও—এ গোপের বাড়ি নয়, ব্রাহ্মণের বাড়ি। বলরাম বললেন,—তা হলে আমাদের দোষ নেই, আমরা কিন্তু মেরে তাড়াব তোমাদের। নিতাই বললে, তোমার শ্রীকৃষ্ণকে আমার ভয় নেই। গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর, এই বলে চারজনে কাড়াকাড়ি করে ঠাকুর-ঘরের সব খাবার খেতে লাগল। কেউ কারুর মুখের, কেউ কারুর হাতের কেড়ে নিয়ে খেতে লাগল। এমন সময় নিতাই ডেকে উঠল—'মা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও, ওরা সব কেড়ে খেয়ে নিলে।' এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।

নিমাই : মা, তুমি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছ। এ স্বপ্নের কথা কাউকে বোলো না যেন। তোমার ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত। উনি যে প্রত্যক্ষ দেবতা সে বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হল তোমার স্বপ্নের কথা শুনে। অনেকবার আমি দেখেছি মা, ঠাকুর-ঘরের নৈবেদ্যের সামগ্রীর প্রায় অর্ধেক থাকে না। কে যেন খেয়ে চলে যায়। তোমার বৌ-এর ওপর আমার সন্দেহ ছিল, আমি লজ্জায় এতদিন বলিনি। এখন দেখছি প্রত্যক্ষ ঠাকুরই নৈবেদ্য খান। যাক, ঠাকুর তোমার বৌমাকে বাঁচালেন, তোমার বৌ-এর ওপর মিথ্যা সন্দেহ এতদিনে আমার ঘুচল।

শচীমাতা : ওমা ! নিমাই বলিস্ কি? আমার বৌমা লক্ষ্মী, ওর অভাব কি যে, সে চুরি করে খাবে?

নিমাই : উনি যদি লক্ষ্মীই হন মা, তাহলে ত নারায়ণের নৈবেদ্য ওঁর ভাগ আছে। যাক--নিত্যানন্দ প্রভুকে আজই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াও, কারণ স্বপ্নে তিনি তোমার কাছে অন্নভিক্ষা করেছেন।

শচীমাতা : হায় আমার পোড়া কপাল ! ছেলেকেও নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হল?

নিমাই : সন্ন্যাসীর যে আপন ঘরে থাকতে নেই, মা। তাতে তিনি ধর্মভ্রষ্ট হন। দাদা শ্রীবাস আচার্যের বাড়িতেই আছেন। ও ত আমাদের নিজেরই ঘর।

শচীমাতা : হুঁ, মালিনী সই-এর কপাল ভাল। যাক, আমি যাই, বলে আসি পাগল ছেলেকে ওবেলা খেতে।

ঈশান : আমি তাহলে চললাম মা আজকের মত।

নিমাই : কেন ঈশান দা, তুমি যাবে কেন?

ঈশান : যাবে কেন, সে এসে ত সমস্ত ভাত ডাল বাড়িময় ছড়াবে, ন্যাংটা হয়ে নাচবে,—তারপর বাকি সক্‌ড়ি নিয়ে আমার সুখে মাথায় মাখবে। রাত্তিরে গঙ্গাচান করলে আমায় সর্দি জ্বর বিকারে ধরবে।

নিমাই : ঈশান দা, নিত্যানন্দ প্রভু যাঁকে স্পর্শ করেন তার জ্বর বিকার চিরকালের জন্য ছেড়ে যায়। তোমার ভয় নাই।

দ্বাদশ দৃশ্য

নিমাই : নিত্যানন্দ ঠাকুর ! তোমায় বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু চুপ করে সুবোধ বালকের মত খেয়ে দেয়ে সুড় সুড় করে ফিরে আসবে। উৎপাত করো না যেন।

নিত্যানন্দ : শ্রীবিষ্ণু ! শ্রীবিষ্ণু ! পাগলেই চঞ্চলতা করে। তুমি নিজে পাগল কি না, তাই সকলকেই পাগল মনে কর।

ঈশান : এই যে মাতোয়াল ঠাকুর এসেছেন। দাঁড়াও, ছিচরণ দুটো ধুইয়ে দিই, তারপর বাড়িতে ঢোক। (পা ধোয়াইতে ধোয়াইতে) ঐ পায়ের ত আর গুণের ঘাট নেই, ত্রিভুবনের বনের ময়লা কাদা পাঁক মেখে এসেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু নোংরা সব বুঝি তোমার ছিচরণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বৈতরণী পার হবার বুঝি আর কিছু পেলে না সব, এই অবধূতের চরণ-তরী ছাড়া?

শচীমাতা : এই যে দুই ভায়ে এসেছ। আমি কখন থেকে পথ চেয়ে বসে আছি। বৌমা, ভাত আন।

নিতাই : মা ! এ ভাতের থালা না পর্বত? তুমি ভুল করেছ মা, আমি ত গিরি-গোবর্ধন ধারণ করিনি, আর বিশ্বম্ভরও আমি নই, বিশ্বম্ভর ঐ নিমাই।

শচীমাতা : নে এখন ফষ্টি নষ্টি রেখে খেতে বস্ দেখি। তুই-ই বা কিসে কম বাবা? নিমাই বিশ্বম্ভর, তুইও ত আমার বিশ্বরূপ। একি ! একি ! তোদের দু'জনের অন্ন তিন ভাগ হল কেন? তোদের মাঝে কে ঐ পঞ্চম বর্ষের দিগম্বর কৃষ্ণবর্ণ শিশু। ঐ সুন্দর শিশুকেই ত কাল স্বপ্নে দেখেছিলাম। একি, কোথায় নিমাই, নিতাই কই ! চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও শুল্কবর্ণ পরম মনোহর এক শিশু—হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল—বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ, কর্ণে মকর কুণ্ডল—তাদের জায়গায় বসে আহার করছে। ঐ—ঐ—আমার পুত্র, পুত্রের হৃদয়ের আমার বধূমাতা—বিষ্ণুবক্ষে লক্ষ্মীর মত বিরাজ করছে। একি মায়া ! এ কি স্বপ্ন ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! এ কি খেলা তোমার? (মূর্ছা)

নিমাই : অবধূত ঠাকুর, মা মূর্ছা গেলেন, ধর ! ধর !

ঈশান : মাতোয়াল ঠাকুর, ধরা পড়েছ। ধরা পড়েছ ! আমি দেখেছি আমি চিনেছি তোমাদের ! একি দেখলাম—একি দেখলাম আমি ! আমি এখনও বেঁচে আছি ত? আমার জ্ঞান আছে ত? ঠাকুর ! দাও, দাও তোমার উচ্ছিষ্ট আমার মাথায় মাখ, মুখে মাখ। তোমার পা ধোওয়া জল আমি ফেলিনি—রেখে দিয়েছি ঘড়ায় করে, ওকে আমি ফেলতে পারি? এই—এই আমি তা সব খেয়ে ফেলব, এক ফোঁটাও কাউকে দিচ্ছিনে। (জল পান) আজ চতুর্দশ লোকে আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? অমৃত—অমৃত কলস পেয়েছি আমি—অমৃত কলস। (মূর্ছা)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[ভোরবেলা—কাঞ্চনা গাইতেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নকক্ষ দ্বারে]

ফিরে যাও গৌর-সুন্দর চঞ্চল মতি
(তুয়া মনে কিসের পিরীতি)
এমন সোনার দেহ পরশ করিল কে
না জানি সে কোন্ রসবতী॥
অলসে অরুণ-আঁখি ঘুমে প্রেমে মাখামাখি
(আজু) রজনীতে হলে কার পতি
বদন-কমল কেন মলিন হইল হেন
ধোঁওয়া দিয়ে করেছে কে তোমার আরতি॥
নদীয়া-নাগরী সনে নিশি যাপি নিরজনে
আসিলে হে নিলাজ কেমন করে।
সুরধুনী-তীরে গিয়া মার্জনা করগে হিয়া
তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥

নিমাই : আমি হরি-বাসর-বাসী অমিয় সাগরে ভাসি
কাহে সখি বহু কটু ভাষ
থাকি না যথায় গিয়া হৃদে মোর বিষ্ণুপ্রিয়া
সেই মোর রাস-রানী আমি তাঁরই দাস।

বিষ্ণুপ্রিয়া : তাইত বলি, কাঞ্চনা এত ভোরে কার সাথে কলহ করছে?

কাঞ্চনা : যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। এক ঘণ্টা ধরে যে দোর গোড়ায় চ্যাঁচালাম, তা একবার ফিরে দেখলে না। মনে করলাম পাশ-বালিশটাকেই বুঝি পণ্ডিতমশাই মনে করে নিশ্চিন্তে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছ। এখন ত একজনের কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভাঙ্গতে এতটুকু দেরি হল না। বলি সারারাত ঘুমিয়েছ না অমনি জেগেই কাটিয়েছ।

নিমাই : ঝড় উঠেছে, দেহ-তরী নিয়ে এই বেলা সরে পড়ি।

কাঞ্চনা : সরে পড়লে চলবে না ঠাকুর। আজ তুমি স্পষ্ট করে বল, তোমার মনে কি আছে। সারা নদীয়া আজ তোমার প্রেমে পাগল, তোমার করুণায় নাকি ত্রিভুবন ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। শুধু আমার এই সখিটিই চড়ায় ঠেকে থাকলেন কেন? তোমার প্রেম-সমুদ্রের এক বিন্দু বারি পেলে যে বেঁচে যায় তাকে এ বঞ্চনা কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া : (কাতর স্বরে) কাঞ্চনা!

কাঞ্চনা : তুমি থাম! পাপ হয় আমার হবে। উনি ভগবান, পৃথিবীর দুঃখীকে উদ্ধার করতে এসেছেন, শুধু তুমি ছাড়া। রাম পৃথিবী ত্রাণ করেছেন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে—বর্জন করে নয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে, সত্য-ভামা রুক্মিণী প্রভৃতিকে নিয়েই ভূভার হরণ করেছেন। ইনি যদি নারায়ণই হন তবে লক্ষ্মীকে এত বেদনা দেন কোন্ অপরাধে, কোন্ শাস্ত্রমতে?

নিমাই : আমি সত্যই অপরাধী, কাঞ্চনা, তাই তোমার সখির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি।

কাঞ্চনা : তা হলে বল, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

নিমাই : (সুরে) দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

নিতাই : দেখেছি ! যুগল মিলন দেখেছি—দেখেছি।

[নিত্যানন্দের গান ও নৃত্য]

এই যুগল-মিলন দেখব বলে ছিলাম আশায় বসে।
আমি নিত্যানন্দ হলাম পিয়ে মধুর ব্রজ-রসে।
রাই বিষ্ণুপ্রিয়া আর কানাই গউর
হের নদীয়ায় যুগল রূপ সুমধুর
তোরা দেখে যা দেখে যা, মধুর মধুর।
মধুর রাই আর মধুর কানাইরে দেখে যা
দেখে যা মধুর মধুর।

[তাণ্ডব নৃত্য]

ঈশান : এই হয়েছে ! মাতোয়াল ঠাকুর আবার ক্ষেপেছে। ও বাব্বা ঃ! ঠাকুর যে একেবারে দিগম্বর মূর্তিতে নেচে বেড়াচ্ছে গো ! ও দা ঠাউর ! ধর ধর ! সন্ন্যাসী ঠাউর যে ন্যাংটা হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে গো। মুখ দিয়ে ফেনা উঠেছে যে ! বুড়ো লোক আমি কি সামলাতে পারি এই পাগলা হাতিকে !

নিমাই : (হাসিয়া) একি হচ্ছে প্রভু ! ছিঃ ! ছিঃ ! ন্যাও কাপড় পর।

নিতাই : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার আমি যাব।

নিমাই : আরে, যাওয়ার কথা কে বলেছে? কাপড় পর।

নিতাই : আর খেতে পারব না। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে গেছে।

নিমাই : আরে, আমি কি বলছি আর তুমি কি উত্তর দিচ্ছ।

নিতাই : এই নিয়ে দশবার গেলুম, আর যেতে পারব না।

নিমাই : আমার মাথা আর মুণ্ড ! তাতে আমার কি দোষ ?

নিতাই : মা এখানে নেই। (উন্মত্ত হাসি ও নৃত্য)

শচীমাতা : নিতাই, ঘরে এস, সন্দেশ খাবে।

নিতাই : ?*

বসন—বসন দে। মা ডাকলেন—শিগ্‌গির কাপড় আন।

শচীমাতা : হল ভাল, ছিল এক পাগল, তার দোসর জুটল এসে উন্মাদ।

নিতাই : তোমার বাবা পাগল, তোমার মা পাগল, তোমাদের গুষ্টি পাগল মা, তা আর ছেলেরা কোন্ ভাল হবে ?

[অসমাপ্ত]

---

* তারকা-চিহ্নিত কিছু অংশ এবং নাটকের শেষ অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। —সম্পাদক

বিজয়া

[বিজয়ার ঢাক-ঢোল বাজিতেছে। নাট-মন্দির হইতে সানাই-এর করুণ সুর (মুলতানি বা পুরবী) ভাসিয়া আসিতেছে।]
[ঊর্ধ্ব হইতে দেবদেবীদের সঙ্গীত ভাসিয়া ক্রমেই নিকটে আসিতেছে।]

গান
[পুরুষ ও স্ত্রী সমবেত কণ্ঠে]

বিজয়োৎসব ফুরাইল মা গো,
ফিরে আয় ফিরে আয় !
মা আনন্দিনী গিরিনন্দিনী
শিব-লোকে অমরায়
ফিরে আয় ফিরে আয়॥
কৈলাসে শিব যাপিতেছে দিন
শব-সম, হয়ে শক্তিবিহীন ;
সপ্ত স্বর্গ দেবদেবী কাঁদে
আঁধারে মা নিরাশায়॥
(দূরে দূরে শব্দ দূরে চলিয়া গেল।)

[নিম্নে ধরণীর সন্তানের আর্ত মিনতি শোনা যাইতেছে—কণ্ঠস্বর ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।]

গান

যাসনে মা ফিরে যাসনে জননী
ধরি দুটি রাঙা পায়।
শরণাগত দীন সন্তানে
ফেলি ধরার ধূলায়॥
(মা গো) ধরি দুটি রাঙা পায়॥
(মোরা) অমর নহি মা দেবতাও নহি,
শত দুখ সহি ধরণীতে রহি ;
মোরা অসহায়, তাই অধিকারী
মা গো, তোর করুণায়॥

দিব্য শক্তি দিলি দেবতারে
মৃত্যুবিহীন প্রাণ,
তবু কেন মা গো তাহাদেরই তরে
তোর এত বেশি টান !
(আজও) মরেনি অসুর, মরেনি দানব,
ধরণীর বুকে নাচে তাণ্ডব,
সংহার নাহি করি সে-অসুরে
চলে যাস বিজয়ায়॥

(কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে)

জনৈক দেবতা : আমরা দেবতা হলে কী হবে, কথায় ও কান্নায় ধরণীর মানুষকে জিততে পারব না।

মানুষ : মা গো ! জানি আমরা দুর্বল। রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, অভাব, ঋণে নিত্য-জর্জরিত। আমাদের আয়ু শেফালি ফুলের মতো ; সন্ধ্যায় ফোটে, সকালে যায় ঝরে। তবু তারই মাঝে ডাকি তোকে, এই মায়া, এত অবিদ্যার ঊর্ধ্বে তুলে নিতে। ফুল ঝরে, তার আশা থাকে, পূজারী তাকে কুড়িয়ে স্থান দেবে দেবতার পায়ে। কিন্তু মানুষের জীবনে আজ সে-আশাও গেছে ফুরিয়ে।

দেবতা : দেখেছিস, বলছিলাম না, ওরা কান্না আর চাটুবাদের জোরেই জিতে গেল।

মানুষ : আমরা অসহায়, তাই ছেলে-ভুলানো খেলনা দিয়ে রাখিস ভুলিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে। মাতৃহীন শিশু-সন্তানকে ফেলে দিস দাসীর কোলে, কান্না ভুলাতে দিস হাতে চুষি-কাঠি !

দেবতা : এই রে, সেরেছে ! ওরা যা কান্না জুড়ে দিয়েছে, তাতে মা দয়াময়ী এতক্ষণ গলে গঙ্গাজল হয়ে গেছেন বুঝি ! দে, ওদের শিগগির রাগিয়ে দে। ওরা একবার রেগেও যদি মাকে চলে যেতে বলে, অমনি মা ছলনাময়ী পালিয়ে আসবেন।

মানুষ : ওই শোন, আমাদেরই মতো হতভাগ্য একদল সন্তান মাকে ভাসিয়ে দিয়ে গান গাইতে আসছে।

গান

মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে
কেমনে রহিব ঘরে।
শূন্য ভবন শূন্য ভুবন
কাঁদে হাহাকার করে॥
মা যে নদীর জল-তরঙ্গ প্রায়
ভরা কূলে কূলে, তবু ধরা নাহি যায় ;
রাখিতে নারিনু পাষাণীরে মোরা
পাষাণ দেউল ধরে॥

মানুষ : সত্যই যদি মা পাষাণী হয়, তবে তার সন্তানও হোক পাষাণ। তারাও হোক অনুভূতিহীন, নির্মম। হাঁ, এই আমাদের সাধনা। নিষ্ঠুর হস্তে এই পাষাণের বুক চিরে বহাব স্নেহের নির্ঝরিণী-ধারা।

(ধরার মানুষের গান)

(মোরা) মাটির ছেলে, দু-দিন পরে মাটিতে মিশাই।
(আসে) খড়ের প্রতিমা হয়ে মা আমাদের তাই॥
(সে) কয় না কথা, দেয় না স্নেহ-কোল,
মা, মা বলে যতই কেন বাজা না ঢাক-ঢোল,
(তোর) ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা মেটে হয়ে
শ্মশান-ছাই॥
(সে) দেবতাদের চিন্ময়ী মা,
অসুরও পায় দেখা
মা-র অসুরও পায় দেখা—
(মা-র) জড় পাষাণ মূর্তি হেরে
শুধু মানুষ একা
রে ভাই, শুধু মানুষ একা।
(মোরা) মরে এবার আসব অসুর হয়ে,
মুণ্ডু মোদের দুলবে, রে ভাই,
মার কণ্ঠে রয়ে।
(নাই) বিসর্জন যে জননীর,
(সেই) মাকে মোরা চাই॥

(জনৈকা ভিখারিনির গান)

খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা,
মাকে তো তোরা পূজিসনে।
প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে (ঘরে ঘরে ওরে)
হায় রে অন্ধ, বুঝিসনে॥
বছর বছর মাতৃপূজার করে যাস অভিনয়,
ভীরু সন্তানে হেরি লজ্জায় মা-ও যে পাষাণময়।
(মাকে) জিনিতে সাধন-সমরে
সাধক তো কেহ যুঝিসনে॥
মাটির প্রতিমা গলে যায় জলে,
বিজয়ায় ভেসে যায়,

আকাশ-বাতাসে মা-র স্নেহ জাগে
অতন্দ্র করুণায়।
তোরই আশে-পাশে তাঁর কৃপা হাসে
(কেন) সেই পথে তাঁরে খুঁজিসনে॥

মানুষ : কে তুমি মা, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।

ভিখারিনি : আমি ভিখারিনি। আমার দুর্বৃত্ত ছেলেরা আমায় তাড়িয়ে দিয়ে, আমায় মৃতা বলে ঘটা করে মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, তাই দেখতে এসেছি।

জনৈকা নারী : মা ! মাগো ! আমি তোকে চিনেছি। মা ছলনাময়ী !—

ভিখারিনি : চুপ ! তুই তো চিনবিই, তুই যে আমারই শক্তির অংশ। এই মাতৃশ্রাদ্ধের অভিনয়ে মা, তুইও যোগ দিসনে ; যদি পারিস, মূর্তিমতী শক্তিরূপে আমার এই সব জড় সন্তানদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার কর।

মানুষ : একি ! একি ! ভিখারিনি কোথায় গেল ! ও যেন দেবীমূর্তির মাঝে—

নারী : (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) হাঁ, ভিখারিনি দেবীমূর্তির মাঝে বিলীন হয়ে গেল ! তোমরা রাংতার ঐশ্বর্য দিয়ে যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী শ্রীদুর্গার বছর বছর পূজার অভিনয় কর, তিনি ভিখারিনি হয়ে দ্বারে দ্বারে তোমাদের জন্য শক্তি-ভিক্ষা, কল্যাণ-কামনা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁরই পূজামণ্ডপে শিব-শক্তি আসেন ভিখারি-ভিখারিনির রূপে। তোমরা মাটির প্রতিমা পূজা কর, তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না, মা-কে পাও না।

(পুরুষ ও নারীর গান)

এবার নবীন-মন্ত্রে হবে
জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে,
হবে না তোর বিসর্জন॥
সকল জাতির পুরুষ-নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদি
মা তোর পীঠস্থান।
(সেথা) শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে
পাতবো মা তোর সিংহাসন॥
(সেথা) রইবে নাকো ছোঁয়াছুঁয়ি
উচ্চ-নিচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিবে
মাতৃনামের বেদ।

(মোরা) এক জননীর সন্তান সব, জানি
ভাঙব দেয়াল, ভুলব হানাহানি,
দীন দরিদ্র রইবে না কেউ,
সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত
নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন।।

বেতার-জগৎ
১০ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা
১৬ই অক্টোবর ১৯৩৯

শ্রীমন্ত

[নাটক]

চরিত্র

পুরুষ : শ্রীমন্ত, ধনপতি, (শ্রীমন্ত'র পিতা), সিংহল-সম্রাট, মাঝিগণ
স্ত্রী : ফুল্লরা (শ্রীমন্ত'র মাতা), দীপালী (সম্রাট-কন্যা)

প্রথম দৃশ্য

এই পথটা কাটব
পাথর ছুঁড়ে মারব
এই পথটা কাটব
বটি ফেলে মারব
এই কাটলাম, চু—
বৌ পালাল বৌ পালাল
বিয়ের হাঁড়ি নিয়ে
সে বৌকে আনতে যাব
মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে।

[নেপথ্যে সংগীত]

একি রে, তুই যে আমাদের সাথে খেলছিসনে বড়? আমরা কানামাছি খেলছি, আয় তোকে কানামাছি করি।

শ্রীমন্ত : আমি এখন খেলতে পারব না ভাই, মা পুজো করছেন। আমিও পুজো দেব, তাই স্নান করতে যাচ্ছি।

: ইস! ইয়ের ছেলের আবার পুজো! দেখিস, দেখিস, ভট্‌চাজ বামুন না হয়ে যাস।

: ওরে, ও যে সত্যি সত্যি বামুন-ঠাকুরের ছেলে। ওর বাবা বাণিজ্য করতে যাবার এক বছর পরে ও হয়েছে, তা বুঝি জানিস নে?

: সত্যি ?
: মাইরি ?
: হ্যাঁ, সেদিন পণ্ডিতমশাই বলছিলেন।
শ্রীমন্ত : আমি এখুনি মাকে বড়মাকে বলছি গিয়ে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঠাকুরঘরে পূজা করিতেছেন]

ফুল্লরা : সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে॥
মা সর্বমঙ্গলা, আমার জীবনের সর্বস্ব, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে এনে দে মা।

[অঞ্জলি]

একি ! মায়ের পায়ের ফুল মাটিতে পড়ে পড়ে যায় কেন ? আমার দেওয়া পূজাগুলি কেন বারে বারে পায়ে ঠেলে দিচ্ছিস মা ? কি অপরাধ করেছি মা ও রাঙা পায়ে ? মা ! মা !—
শ্রীমন্ত : মা ! মা !—
ফুল্লরা : কে ? শ্রীমন্ত ? তুই স্নান করিসনি এখনো ? একি তুই কাঁদছিস ? কি হয়েছে তোর ?
শ্রীমন্ত : মা, তুমি পুজো সেরে নাও, তারপর বলছি।
ফুল্লরা : বাবা, মা অম্বিকা আমার পূজা নিলেন না আজ। ঐ দেখ, অঞ্জলির ফুল ধূলায় পড়ে। যতবার অঞ্জলি দিয়েছি, ততবারই গেছে পড়ে।
শ্রীমন্ত : মা, আমি অঞ্জলি দিই ?
ফুল্লরা : তুই যে এখনো স্নান করিসনি খোকা, তুই পূজার ফুল ছুঁবি ?
শ্রীমন্ত : তোমার কোলে উঠতে হলে কি স্নান করতে হয় মা ? ছেলের হাতের পুজো মা যে সবসময়ই নেন। তুমি সরো, আমি মায়ের পায়ে পুজো দিই।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
ফুল্লরা : একি ! একি তোর মায়া, মহামায়া ! এবার তো পূজার ফুল পড়ে গেল না– –ছেলের পূজা পেয়ে মা যেন হাসছেন।—বাবা শ্রীমন্ত, মা ভবানীর বরে ওরই দোর ধরে তোকে পেয়েছি, তুই যে মা ভবানীরই ছেলে। তুই কাঁদছিলি, তাই মা বুঝি আমার পূজা নেননি।
শ্রীমন্ত : মা—
ফুল্লরা : বল বাবা, বল, কেন কাঁদছিলে ? মা-ই তোমার দুঃখ দূর করবেন।

শ্রীমন্ত : মা, আমার বাবা কোথায়? বাবা কেন আসেন না?

ফুল্লরা : তোমাকে সবই বলেছি, সোনামানিক আমার! তিনি বাণিজ্যে গেছেন সিংহলে, তখন তুমি পেটে—, সে আজ এক যুগের কথা। তারপর আর কোন খবরই নেই। মা ভবানীই জানেন, উনি এখন কোথায়, কিভাবে আছেন।

শ্রীমন্ত : মা বাবাকে আমি খুঁজতে যাব, যার তার ছেলে আমায় মন্দ বলে, বলে আমার বাবা নেই। আমার কান্না পায়, আমি সইতে পারিনে। আমি যাবই যাব—আমি বাবাকে ফিরিয়ে আনব, না হয় আমিও আর ফিরব না।

[ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে প্রস্থান]

ফুল্লরা : শ্রীমন্ত! শ্রীমন্ত! ওরে শোন—শোন!

[শ্রীমন্তর পিছু পিছু প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীমন্ত : মা, বড়মা তোমরা দুজনে শোন—না না, শোন নয়, দেখবে এস, আমার সাথে এস। গঙ্গার জলে আমার সাতটা ডিঙে—জাহাজের মত বড়! ওকে কি বলে মা, ডিঙে তো?

ওমা! কি হবে গো! ছেলে আমার পাগল হয়ে গেল নাকি? ছেলে সেই যে কাল সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, সারাদিনটা তার দেখা নেই। সকালে এসে বলে কি না, ভোমরার জলে সপ্তডিঙ্গা ভাসছে! ও মাগো, ছেলেকে কে কি খাওয়ালে গো?

: তুই কী দেখেছিস খোকা? ডিঙে কোথা থেকে এল?—আচ্ছা দেখব এখন গিয়ে, এখন খেয়ে নে তো কিছু।—ষাট ষাট একদিন একরাত বাছা আমার কোথায় না জানি ছিল।

শ্রীমন্ত : মা মা, তোমরা শোন। আমি সেই যে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলাম, ছুটতে—ছুটতে—ঢুকলাম গিয়ে বনের মধ্যে। সেই বনে তিনজন বুড়ো এসে বললে, বাপু, তুমি কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি—সিংহলে। ওর মধ্যে যেটা থুরথুরো নননুরো বুড়ো, সেইটা আমাকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে বললে, আরে বাপরে! সিংহল কি এখানে? সে যে অনেক দূর, নৌকা করে যেতে হয়। তা, আমরা তো কারিগর আছি, আমরা তোমায় নৌকো তৈরি করে দেব, তুমি তাইতে চড়ে যেও। তারপর—বুড়োটা কি করলে শুনবে, বড়মা? বললে, ওর নাকি আমার মত একটা ছেলে আছে, তার নাম চামচিকে। এ রাম, কি নাম! হ্যাঁ মা, আমি কি চামচিকের মত দেখতে?

ফুল্লরা : চামচিকে? শুনেছি বিশ্বকর্মার ছেলে চামচিকে। তবে কি বিশ্বকর্মা এসেছিলেন তোর সপ্তডিঙা গড়ে দিতে? নইলে মানুষ কি রাতারাতি সাতটা ডিঙি তৈরি করে দিতে পারে? এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

: মা ইচ্ছাময়ী করলে সব হতে পারে, দিদি। তুমি খোকাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও দেখি, আমি মাকে প্রণাম করে আসি।

শ্রীমন্ত : না মা, আমার একটুও খিদে নেই। সেই তিন বুড়োর আর একটা বুড়ো, তার আবার পা পর্যন্ত দাড়ি! আমাকে তার কমণ্ডলুর মত একটা পাত্র থেকে নিয়ে কি খাওয়ালে। কি যে সুন্দর তার স্বাদ! তা তোমরা কেউ কখনো খাওনি।

ফুল্লরা : ও মা! কি হবে গো! কোন হাড়-হাভাতে বুড়ো-হাবড়া কি যেন খাইয়ে আমার ছেলেকে পাগল করে দিয়েছে গো। ও ঝি! দুব্‌বলা, বলি ও দুব্‌বলা দৌড়ে দেখে আয় তো, ভোমরার জলে নাকি সাতটা ডিঙে ভাসছে?

(গান)

ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
দুখ-পাপ-তাপ-হারিণী ভবানী॥
কলুষ-রিপু-দানব-জয়ী
জগৎ-মাতা করুণাময়ী
জয় পরমাশক্তি মাতা
ত্রিলোকধারিণী॥

চতুর্থ দৃশ্য

(মাঝির গান)

সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিলেম
গহিন সাগর জলে,
দূরে বসে কাঁদে কে রে—
(কাঁদে) আয়, ফিরে আয় বলে॥
কার আঁচলের মানিক ওরে
অকুল স্রোতে পড়লি ঝরে রে,
কোন মায়ের কোল খালি করে
এলি রে তুই চলে।

দূরে বসে কাঁদে কে রে—
(ঘরে) আয়, ফিরে আয় বলে॥

১ম মাঝি : মাইয়া আর পোলাপানটা মিল্যা কি কান্দনটাই কান্দল। ওদের চকের পানিতে দরিয়ার পানি যেন দ্বিগুণ হইয়া গেল গিয়া, দেখছনি, মামু?

২য় মাঝি : দেখছিরে বাবা দেখছি। মাঝি-মাল্লার বুক বড় শক্ত, এই জাহাজের তক্তার নাগাল শক্ত। নইলে ফাইট্ট্যা চৌচির হইয়া যাইত। মানুষের চক্ষে এত পানি, হায়!—আর কাঁদুম না, ঐ একটা পোলাপান, হেও ভাইস্যা চলল দরিয়ার মাঝে।—আমার পোলাপানটারে,—পোলাপানটারে যখন কবর দিতে লইয়া যাই, তখন উয়ার মা এইরকম কইর‍্যাই কাঁদছিল।

শ্রীমন্ত : মাঝি, সিংহল আর কত দূর? আর যে পারি না, শুধু জল আর জল! কত যুগ যেন আমার মাটির মায়ের পরশ পাইনে। তরী কবে কূলে ভিড়বে?

মাঝি : আইজ্ঞা, আর দুই-চারদিন সবুর করেন, আমরা এইবার সিংহলের কাছেই চইল্যা আসছি। ঐ যে স্যাহের লাহান কালাপানি দেখা যাইছে, হ্যারে কয় কালীদহ,—ঐডারে পারাইতে পারলেই কাম সাইর‍্যা ফেলামু।—

শ্রীমন্তর গান

মাকে আমার এলাম ছেড়ে
মা অভয়া, মাকে দেখো।
মোর তরে মা কাঁদে যদি
তুমি তাকে ভুলিয়ে রেখো।
মা অভয়া, মাকে দেখো॥
মায়ের যে বুক শূন্য করে
এলাম আমি দেশান্তরে,
শূন্য করে সেই খালি বুক
মহামায়া, তুমি থেকো।
মা অভয়া, মাকে দেখো॥

শ্রীমন্ত : একি! হঠাৎ আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ছেয়ে আসছে কেন? যেন দলে দলে কৃষ্ণ-ঐরাবত মত্ত-মাতঙ্গসম সমুদ্রগর্ভ থেকে এগিয়ে আসছে। তবে কি ঝড় উঠবে?

[ঝড়ের শব্দ]

ওরে, ও পোলা—সামাল! সামাল! হাল চাইপ্প্যা ধরবি রে। আরে তুফা[illegible] উঠছে রে, তুফান উঠছে।—

শ্রীমন্ত : একি ঘোর তাণ্ডব নর্তন ! একি ঘোর জল-কল্লোল ! আমি—(বজ্রপাত)। মেঘ-গর্জনের ঘন ঘন নিনাদে শ্রবণ যেন বধির হয়ে যায়। মধ্যাহ্নে ঘনিয়ে এল অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও ঘন অন্ধকার !

মাঝি : আরে, গেল গেল গেল রে ! আর বুঝি নাও রাখন গেল না। পীর দয়ালেরে স্মরণ কর, আরে তরী ডুবল রে, তরী ডুবল—।

শ্রীমন্ত : মাগো করুণাময়ী, সর্বমঙ্গলা, তবে আমি যে আমার পিতার দর্শন পাব না, আমি যে তোরই প্রতীক্ষা করেছিলাম বাবাকে ফিরিয়ে আনব বলে। মা ইচ্ছাময়ী, তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক—তোর নাম মাখা কালীদহে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিই—। মা—মা—।

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মা : মা জগদীশ্বরী ! তোমার চোখে জল কেন, মা ? খেলার পুতুলের মত খেলা করছ তুমি নির্বিকার তুচ্ছ লোক নিয়ে ! তবে তোমার চোখে জল কেন, শঙ্করী ?

: ওরে পদ্মা, দুঃখ দেওয়ার কি যে দুঃখ তা তো তোরা বুঝলিনে ! যে মা শাসন করার জন্য বুকের ছেলেকে আঘাত করে, সেই মা-ই জানে যে, যে আঘাত সে ছেলের বুকে হানে, সেই আঘাত শতগুণ তীব্র হয়ে এসে বাজে মায়েরই বুকে। ছেলেকে নির্মল করার জন্য মা যখন তাকে ঘষে, মাজে, ছেলে তখন কাঁদতে থাকে,—মনে করে এ মায়ের উৎপাত। সেই ছেলেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মা যখন কোলে নিয়ে চুমু দেন, তখন তার শোভা দেখেছিস ? ঐ শোন ভক্ত শ্রীমন্ত আমায় ডাকছে। ও যখন মা মা বলে ডাকে, তখন চোখের জল আর রাখা যায় না। চলো—ওকে কালীদহে কমলে-কামিনী রূপে দেখা দিই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীমন্ত : একি, মা মহামায়া। এ কি তোর মায়া ? পায়ের নিচে মাটি এল কোত্থেকে ? এ যে বালুচর। কোথায় গেল ঝড়—কোথায় গেল সেই আকাশ অন্ধকরা মেঘ ?—নির্মল আকাশে সূর্য হাসছে মায়ের কোলে হাসিমুখ ছেলের মত—। এ কি অপরূপ।—এ কি স্বপ্ন ? কোটি কোটি প্রস্ফুটিত কমলের দলে কে ও অপরূপা বামা কমলবাহিনী ? কমল-আসন, কমল-নয়ন,

কমল-বরণা ! চরণে কোটি রক্ত-কমলের শোভা !—এ কি ভীষণ খেলা— এক হস্তে হস্তী ধরে গ্রাস করে বামা, আর হস্তে—আহা ! রূপ হেরে নয়ন ভরেছে দেখ !—

সপ্তম দৃশ্য

[সিংহলে—অন্ধকার কারাগৃহ]

ধনপতি : মাগো ! মা সর্বমঙ্গলা, মা সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী চণ্ডিকে,—আর কতকাল এই অন্ধকূপে ফেলে রাখবি মা? তোকে নিশিদিন ডেকেও তো আমার মুক্তি হল না। কোথায় আমার ফুল্লরা, কোথায় ললনা? ফুল্লরা ছিল সন্তানসম্ভাবনা। তার কোল আলো করে কে এসেছে? ছেলে না মেয়ে?— আহা ! যদি ছেলে হয়ে থাকে, যে নিশ্চয়ই ফুল্লরার মতই সুন্দর হয়েছে। সে এখন কত বড় হয়েছে? সে কি তার বাবাকে স্মরণ করে? আমি এই বহুদূর কারাগারে থেকেও শুনতে পাই, কে যেন নিশিদিন ডাকছে, বাবা— বাবা—আমি আসছি তোমার বন্ধন মোচন করতে। না না না—ও আমার আত্মার আহ্বান নয়, ও বুঝি আমার আত্মার ক্রন্দন। তবু, কেন যেন আমার ধমনীতে, আমার হৃৎপিণ্ডের মাঝে শুনতে পাই সেই দুরন্ত শিশুর পায়ের ধ্বনি।—হ্যাঁ—আসছে, আসছে, ঐ যে আসছে।

দীপালী : বাবা !

ধনপতি : কে ! কে ! কে তুই, ওরে তুই কে, বাবা বলে ডাকছিস?

দীপালী : আমি দীপালী। সিংহলের মেয়ে আমি, তোমায় রোজ লুকিয়ে দেখতে আসি।

ধনপতি : হুঁ ! মা তুমি? আঃ, তুমি এখানে রোজ আস? কারাধ্যক্ষ যদি দেখে, তোমার কি শাস্তি হবে জানো?

দীপালী : জানি, তাকে আমি ভয় করি না—আসুক সে।

ধনপতি : হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, মা। ভয় কোরো না, আঁধারের প্রহরীকে ভয় কোরো না। তুমি দীপালী, আলোর মেয়ে, অন্ধকারের রক্ষীরাই করবে তোমাকে ভয়।— দীপালী—দীপালী—আলোর উৎস, মায়ের পূজায় আমরা করি দীপালী উৎসব। দীপালী এল, কিন্তু মা কই?

দীপালী : তোমায় আমি বাবা বলে ডাকব। আজ থেকে তুমি আমার ছেলে হলে।— আজকে কি হয়েছে জানো, বাবা? আমার কেবলই কান্না পাচ্ছে সেকথা মনে করে।

ধনপতি : কেন মা লক্ষ্মী? কি হয়েছে বল তো?

দীপালী : চমৎকার, সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহারার এক কিশোরকুমার সপ্তডিঙা নিয়ে আমাদের সিংহলে এসেছিল বাণিজ্য করতে। সে রাজাকে এসে বলে,

কালীদহে সে কমলে-কামিনী দেখেছে—। সম্রাটকে সে তা দেখাতে না পারায় সম্রাট তাকে বধ করার আদেশ দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় তাকে মঠে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।

ধনপতি : হায়! কার হতভাগ্য কুমার! কি সর্বনাশা ঐ কালীদহ!

দীপালী : আচ্ছা বাবা,—এক একটা লোক দেখতে এমন অপরূপ যে, তাদের দেখবার পর থেকেই মন যেন কান্নায় ভরে ওঠে। তাকে মনে করে কেবলই কাঁদতে ইচ্ছা করে। কেন এমন হয়?

(কারাগৃহের বাহিরে হঠাৎ বহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে এবং বহুলোক আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে ক্রমশঃ কারাগৃহের দ্বারপ্রান্তের নিকট আসিতেছে।)

শ্রীমন্ত : মুক্তি! মুক্তি! সমস্ত বন্দী আজ মুক্ত। সম্রাটের আদেশে সকল বন্দী আজ মুক্ত।

দীপালী : ঐ আসছেন বাবা, না না সম্রাট! সম্রাটের সাথে সেই কিশোরকুমার—আমি এখন কোথায় লুকাই?

ধনপতি : মুক্তি! মুক্তি! জয় মা দুর্গে, জয় মা চণ্ডিকে, সর্ববিপত্তারিণী নারায়ণী, মুক্তি দাও—আলো দাও।

সম্রাট : তাই দিতে এসেছি, ধনপতি! শুধু মুক্তি নয়, বন্ধু! তার সাথে এনেছি বন্ধন—তোমার সারাজীবনের বন্ধন।—এই কুমারকে চেনো, বন্ধু?—একি! একপাশে কে অমন করে দাঁড়িয়ে?—দীপালী?—তুমি এখানে কেমন করে এলে মা?—ধনপতি, এই তোমার দেবাশ্রিত পুত্র শ্রীমন্ত, আর এই আমার কন্যা, সিংহলের রাজলক্ষ্মী দীপালী। এই দুইজনকে দক্ষিণা দিয়ে তোমায় দিলাম মুক্তি।

শ্রীমন্ত : বাবা, বাবা, তুমি বাইরে এস, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না এই অন্ধকারে। বেরিয়ে এস এই অন্ধকারার বাইরে।

ধনপতি : আলো, আলো, আলো! কই মা, দীপালী? আয় মা, আয়।—চাইনে—ওরে চাইনে আর আলো,—আমার দুই চক্ষের দুই মানিক ফিরে পেয়েছি। এই আমার, আমার দীপালী—দীপালী।

সম্রাট : শোন ধনপতি, তোমার দেবাশ্রিত পুত্র শ্রীমন্তকে বধ করবার আদেশ দিয়েছিলাম তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, সে কমলে-কামিনী দেখাতে পারেনি বলে। ওকে মঞ্চের যূপকাষ্ঠে রাখা মাত্র এল ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পৃথিবী টলতে লাগল, আমার কোটাল সৈন্যসামন্ত সকলেরই হল মৃত্যু। তোমার নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয় কুমার কেবলই ডাকছিল মা মা বলে।—সহসা দেখলাম অন্তরীক্ষে কালীদহ। সেই আকাশ-গাঙে কোটি কোটি বিকশিত কমলের দলে দেখলাম, শতদল-বিহারিণী অপরূপ কামিনী মূর্তি—গনেশজননী। পরমেশ্বরীকে, যোগমায়াকে চর্মচক্ষে দেখতে পেয়ে

ধন্য হলাম, মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেলাম তোমার এই ভক্তপুত্রের প্রসাদে।—আমার মুক্তির সাথে সাথে দিলাম সকলকে মুক্তি।—আজই তোমরা যাত্রা কর তোমাদের সজল-শ্যামল বাংলাদেশে,—আর সাথে নিয়ে যাও আমার আত্মসমা কন্যা, দীপালীকে।—মুক্তি ! মুক্তি—জয় শ্রীদুর্গা, সর্বমুক্তিদায়িনী, জয় জয় শ্রীদুর্গা।

(মুক্ত বন্দীগণ ও অন্যান্য সকলের সমবেত সংগীত)

জয় দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী !
ভব বন্ধন পাপ তাপ হরা
সব শোক দুঃখ ব্যথা শীতল করা
জয় অভয়া, শুভদা, শিব-স্বয়ম্বরা॥
জয় জননীরূপা চির সুমঙ্গলা
জয় দুর্গা, জয় দুর্গা, জয় দুর্গা॥

যবনিকা

এইচ এম ভি
এন ৭৪২৪৬

পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার

(বিখ্যাত শিকারী জমিদার ললিত বাবুর বৈঠকখানা)

পণ্ডিত মশায় : বলি ও ললিত বলি, বোকেন্দ্র-গন্ধ আস্‌তিছে যেন?

ললিত : বোকেন্দ্র-গন্ধ কি পণ্ডিতমশায়?

পণ্ডিত : আরে, তাও আর বুজতি পারতিছ না? বোকেন্দ্র-গন্ধ মানে বোকা পাঁঠার খোশবাই, বুঝল্যানি?

ললিত : (হাসিয়া) বুঝেছি, পণ্ডিতমশায়! আজ বাঘ শিকারে যাব কি-না, তাই ওটা কিনে রেখেছি।

পণ্ডিত : তোমার সাথে কি এ বোকেন্দ্র-নন্দনও ব্যাঘ্র শিকারে যাবেন?

ললিত : হাঁ, পণ্ডিত মাশায়! উনি জঙ্গলের খুঁটায় বাঁধা থাকবেন আর ওঁর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাঘ্র মশায় যেই এসে উপস্থিত হবেন, অমনি মাচান থেকে তাঁকে গুলি করবো।

পণ্ডিত : আ-হা-হা, অমন পুরুষ্টু পাঁঠা কিনা ব্যাঘ্রের উদরে যাবে? তা ললিত, এক কাজ কর্‌তি পারো? আমারে বাঘ মনে করে দু'টো চণ্ডু কি চরশের গুলি ছুঁড়ে মারো না—আমি ওটাকে খাইয়া ফেলি; তা হলেই অমন পুরুষ্টু পাঁঠাটা বাঘের পেটে না যেয়ে বামুনের পেটেই যায়; ওটারও একটা সদ্‌গতি হয়।

ললিত : ওর না হয় সদ্‌গতি হলো, কিন্তু আপনাকে বাঘ মনে করি কি করে, পণ্ডিতমশায়? আপনার গায়ে অবশ্যি বাঘের মত লোমও আছে, গন্ধও আছে; কিন্তু ন্যাজ? সে যাক, আপনি বরং আমাদের সঙ্গে শিকারে চলুন না। সেখানে পাঁঠাও খেতে পাবেন, আর আপনার কুটুম্ব ব্যাঘ্রাচার্যের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।

পণ্ডিত : দেখা-সাক্ষাৎ না হয় হলো, কিন্তু ও সুমুন্দি ফিরে আস্‌তি দেবে ত? বামুন পণ্ডিত বলি রেয়াৎ করবে?

ললিত : তা আমরা পাঁচজন ত আছি, টেনে হেঁচ্‌ড়ে অন্তত আপনার খানিকটা আনতে পারবো, আর পৈতে গাছটি বের করে সোজা নাকের সামনে ধরবেন।

পণ্ডিত : ললিত, কি যে কও! আচ্ছা ললিত, বাঘের কাছে কি পাঁঠার মাংসের চাতি মানুষের মাংস অধিক সুস্বাদু?

ললিত : তা ত বাঘকে কখনো জিজ্ঞেস করি নি পণ্ডিতমশায়। তবে আপনি বামুন পণ্ডিত, আপনার কথা আলাদা।

পণ্ডিত : ললিত কতি পারো বাঘেরে মামা কইলে ছাড়ি দেয়?

ললিত : পণ্ডিতমশায় ! বাবা বল্‌লে ছাড়ে না, তা মামা !

(সকলে মিলে পণ্ডিতমশায়কে ধরে বেঁধে টেনে নিয়ে মাচানে তুলেছে। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে—দূর থেকে নানা প্রকার বন্য জন্তুর ডাক শুনা যাচ্ছে। একটু দূরেই বাঘের গর্জন শুনা গেল।)

পণ্ডিত : ললিত, বাঘ আসবার দেরি কত?

ললিত : তা ত বলতে পারি না, পণ্ডিতমশায় ! বাঘ ত আর আমায় টাইম দেয়নি।

পণ্ডিত : ললিত, বলি, মাঁচায় গামছা গাড়ু আছে?

ললিত : গামছা গাড়ু কেন পণ্ডিতমশায়—হাত মুখ ধোবেন?

পণ্ডিত : তা আর বুঝ্‌তে পারতিছ্ না? আমার পেটের মধ্যি কেমন যেন হাঁচড়-পাঁচড় করতিছে। বাঘটা কি আমার পেটেই আসি সান্ধাইল।

ললিত : (অন্যমনস্কভাবে) ডাক ত অনেক ক্ষণ থেকে শুনতে পাচ্ছি। এই বার বাঘ এলো বলে।

[হঠাৎ বাঘের ডাক]

পণ্ডিত : অ ললিত, ওটা কি ডাকি উঠলো? ওর ডাক ত সুশ্রাব্য নয়।

ললিত : উনি ত আর কীর্তন গাইতে আসছেন না, পণ্ডিতমশায়, যে ওর গলাটা সুশ্রাব্য হবে।

পণ্ডিত : অ ললিত, ঐ উৎকট গন্ধটা আস্‌তিছে কোনখ্যান থাকি? পাঁঠার গায়ের খোশবাইটা যে নষ্ট করি দিলে !

ললিত : (অসহিষ্ণুভাবে) চুপ করুন পণ্ডিতমশায় ! এবার বাঘ কাছিয়ে এসেছে। ওটা বাঘের গায়ের গন্ধ।

পণ্ডিত : কি যে কও ললিত, ব্যাঘ্রের দেহে কখনো অমন বদ্ গন্ধ হতে পারে? ব্যাঘ্ররে যে একটি ভদ্র জানোয়ার বলেই জানি ; মা জগদম্বার কি নাক নাই? সে বেটি বদ্ গন্ধ জানোয়ারের পিঠে চড়ি ঘুরে বেড়ায়? তুমি তোমার টর্চো লাইট দিয়ে দ্যাখো—নিশ্চয়ই কোন কাবুলিওয়ালা পাঁঠা চুরি করতে আস্‌ছে। ও কাবলিওয়ালার গায়ের গন্ধ। আর ও যদি ব্যাঘ্রই হয়, তবে কাবুলি বাঘ, ও গন্ধ বাংলাদেশের জানোয়ারের গায়ে হয় না।

ললিত : এতো ভাল বিপদ হলো দেখছি। পণ্ডিতমশায়, এবার যদি চুপ না করেন তবে কাপড় দিয়ে আপনার মুখ বাঁধতে হবে।

[অতি নিকটে মাচানের কাছে দু'তিনটে বাঘের ডাক শুনা গেল]

পণ্ডিত : (কাঁপিতে কাঁপিতে) ন-অ-লিত-অ—অ-অ-অ-নলিত, আমারে বাঁধি ফেল—বাঁধি ফেল আমারে—আমারে মা বসুমতী টানিতেছে-আমি অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি অনুভব করত্যাছি !

[ইত্যবসরে একটি বাঘ ভীষণ শব্দ করে ছাগলের উপর লাফিয়ে পড়লো। ছাগলটি আর্তনাদ করে উঠলো ; পণ্ডিতমশায় আর্তনাদ করে মাচান থেকে পড়ে গেলেন। টর্চলাইট, বন্দুকের শব্দ ও মাচান থেকে একজন মানুষ লাফিয়ে পড়তে দেখে বাঘ ত দিলেন চম্পট। সকলে তাড়াতাড়ি মাচান থেকে নেমে এসে দেখলে পণ্ডিতমশায় পাঁঠার গলা জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অনেক কষ্টে পণ্ডিত মশায়ের জ্ঞান ফিরে এলো।]

পণ্ডিত : অ—ললিত, বাঘ চলে গেল? বাঘে আমায় খাইয়া ফ্যালায় নি ত? আর, পাইছি-পাইছি, শ্রীমান বোকেন্দ্র-নন্দনেরে পাইছি। বাঘ নিয়ে যাতি পারে নি—দ্যাখলে ললিত, আমার ভয়ে বাঘ ত বাঘ, কাবুলি বাঘও ছুটি পলাইল। এখন কও দি, পাঁঠাটা কার?

ললিত : আজ্ঞে, বামুন পণ্ডিতের নজর লেগেছিল, ও কি আর বাঘে খেতে পারে?

পণ্ডিত : (মাথায় হাত বুলাইয়া) ললিত—আমার টিকি গেল কোনে? গুলি করে আমার টিকি উড়াইয়া দিলে ! দুর্গা? শ্রীহরি, এ আর কি ব্যাঘ্র শিকার করা? এরে কয় কষ্ট স্বীকার।

ছায়াবীথি
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

কবি 'মোহাম্মদ লোক-হাসান' ছদ্মনামে এই কৌতুক-নাটিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৩ ডিসেম্বরে এটি স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির এন. ৭১৮০ সংখ্যক রেকর্ডে বিধৃত হয়।

'ঈদল্ ফেতর'

রেকর্ড নাটিকা এন ৯৮২৩-৯৮২৪

(গান)

ফকির : ফুরিয়ে এল রমজানেরই মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস।
রোজা রেখেছিলি হে পরহেজগার মোমিন
ভুলেছিলি দুনিয়াদারি রোজার তিরিশ দিন।
তরক্ করেছিলি তোরা কে কে ভোগ বিলাস।
সারা বছর গোনাহ্ যত ছিল রে জমা
রোজা রেখে খোদার কাছে পেলি কে ক্ষমা
ফেরেশ্‌তা সব সালাম করে কহিছে সাবাশ॥

জমিদার : ইমতাজ। ইমতাজ রে।

ইমতাজ : হুজু-হুজু-হুজুর।

জমিদার : কোন্ বেতমিজ এসে দলিজের সামনে গোলমাল করছে রে? রোজা রেখে ভুখ-পিয়াসে একে আমার জান ফেটে যাচ্ছে, তার উপর কানের গোড়ায় এই চিৎকার!

ইমতাজ : হ্যাঁ, হুজুর, মোস-মোস্-মোস্-মুসাফির হুজুর। কান ধইর‍্যা খ্যাদ-খ্যাদ-খাদাইয়া দিমু।

ফকির : হুজুর ত প্রাণ ধরে কিছুই দিলেন না। তুমি আবার তার উপর কান ধরতে এলে বাবা।

ইমতাজ : হুজু-হুজু-হুজুর! বলাদর সেই ফকিরটা আইছে।

জমিদার : আরে, ও কি চায় জিজ্ঞাস কর্ না বেটা তোতলার ডিম।

ফকির : বাবা! আসছে কাল ঈদ্; তাই আমি আগাম আরজি পেশ করে গেলাম। তুমি হরিব পারোয়ার জমিদার, কাল ঈদের দিনে যে ফেতরা দেবে—তাতে যেন এই ফকিরের কিছুটা থাকে!

জমিদার : শা সাহেব, তুমি এ দেশে নতুন এসেছ। তাই তুমি জান না যে আমি ফেতরা, সাদ্‌কা বা জাকাত দিই না, নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, ব্যস্।

ফকির : সে কি বাবা! তুমি ফিত্‌রা দাও না? এ যে নামাজ পড়া রোজা রাখার মতই খোদার হুকুম, নবীজির আদেশ বাবা! ঈদের দিনে দান না করলে যে রোজাই কবুল হয় না।

জমিদার : শা শাহেব ! আমি জুনিয়র মাদ্রাসায় তিন বছর পড়লুম—আর তুমি পথের ভিখিরি, এসেছ আমায় হাদিস বতলাতে ? খোদার আর নবীর সব হুকুম পালন করতে হলে আমাকে আর জমিদারি চালাতে হত না। তোমাদের সাথে ভিখ মাঙ্গা ফকির হয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হত—জান ? ইমতাজ।

ইমতাজ : হুজু–হুজু–হুজুর।

জমিদার : শা সাহেবকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দে।

ফকির : আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি বাবা। কিন্তু খোদার পাওনা খোদা আদায় করে নেবেনই এ জেনে রেখো।

জমিদার : আচ্ছা, তা খোদার পাওনা খোদাই নেবেন—তুমি কেন তা আদায় করতে এসেছ বাবা ? তুমি কি খোদার গোমস্তা ?

ফকির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাঁর হুকুমেই বলছি বাবা । তা তুমি তাহলে গরিবদের জাকাত দেবে না ?

জমিদার : যেদিন আমার ধন দৌলত জমা হয়ে এত উঁচু হবে যে তার উপর দাঁড়িয়ে আমি মক্কা মদিনা পাব, সেইদিনই দেব দান খয়রাত—তার আগে না, বুঝছ ?

ফকির : আচ্ছা বাবা, তা এক কাজ করা না—আমি আমার এক ঝুলি থেকে এক মুষ্টি চাল তোমায় দিচ্ছি, তুমি তাই হাতে করে কাল কোন গরিবকে দিও।

জমিদার : তাতে কি হবে ?

ফকির : তাতে এই হবে, যে তোমার কঞ্জুষ হাত দরাজ হবে, এই ভিক্ষা দিয়ে তুমি নেবে খয়রাত দেওয়ার প্রথম সোবদ।

জমিদার : আচ্ছা বাবা, আচ্ছা যাও। তুমি এখন ভাগো, ভাগো, ভাগো।

ফকির : আচ্ছা বাবা আচ্ছা ; আমি ভাগছি, আমি ভাগছি। কিন্তু দীনদরিদ্রকে তোমার দৌলতের ভাগ দিতেই হবে—এ যে খোদার হুকুম। (প্রস্থান)

জমিদার : ব্যাটা ধড়িবাজ ! তুমি এমনি করে আমায় খয়রাতের অভ্যেস করিয়ে দিতে চাও ? বাঁধা হাত ছাড়া পেলে কি আর কিছু থাকবে ? মোল্লার দাড়ি তাবিজ বাঁধতেই ফুরিয়ে যাবে। ওরে ইমতাজ ! ইমতাজ !

ইমতাজ : হু–হুজু–হুজুর !

জমিদার : ব্যাটা গেছে ? একে রোজার আখরি ওয়াক্তে আধমরা হয়ে আছি ভুখে পিয়াসে—তার উপর ব্যাটা আধঘণ্টা ধরে বকিয়ে গেল। হে–আল্লা ! কী রোদ—ইমতাজ, রোজার এই শেষ দিনটা যে আর যেতে চায় না রে ! দেখে আয় না, সুরযটা আর ডুবতে কত বাকি ?

ইমতাজ : হু–হু–হুজুর, এই ত আষ্টবার দেইখ্যা আইলাম। সুরযটা হৈ–ই–ই–ইমলি গাছের ডগায় রইছে।

জমিদার : ব্যাটা কুঁড়ের বাদ্‌শা। ঘর থেকেই বলছেন ইমলি গাছের ডগায় রইছে। যা—আর একবার দেখে আয়, সুরযটা কি তোর মত কুঁড়ে যে এক জায়গায় বসে থাকবে?

ইমতাজ : আ-আচ্ছা, যা-যাও-যাইতাছি।

জমিদার : হে আল্লা সুরযটাকে তাড়াতাড়ি ডোবাও।

ইমতাজ : হু-হুজুর, সুরযটা অহনও ইমলি গাছের ড-ডগায় *ঠেই-ঠেই-ঠেই*ক্যা রইছে।

জমিদার : বলিস্ কি রে? আজ সুরযটার হল কি? যা যা, গাছে উঠে দ্যাখ দিকিনি। গাছের ডালে আটকে-মাটকে যায় নি ত?

ইমতাজ : হু-হুজুর ! মুই ল্যাং-ল্যাং-ল্যাংড়া ; গাছে উঠুম কেমন ক-ক-কইর‍্যা?

জমিদার : আরে ব্যাটা, একটা বাঁশ নিয়ে খুঁচিয়ে দ্যাখ্ না।

ইমতাজ : অ ব-বদ্-বদ্‌নার মাইয়ো—ও বদ্‌নার মাইয়ো আরে একটা বঁ-বাঁশ লইয়া আয় তো। আজ সুরযটারে খোঁচ-খোঁচ্-খোঁচাইমু।

(দৃশ্যান্তর)

পথচারীরা : ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক

(গান)

(সমবেত কণ্ঠে গীত)

ঈদের খুশির তুফানে আজ ডাকল কোটাল বান।
এই তুফানে ডুবুডুবু জমিন ও আসমান।
ঈদের চাঁদের পানসি ছেড়ে বেহেস্ত হতে
কে পাঠাল এত খুশি দুখের জগতে
(শোন) ঈদগাহ্ হতে ভেসে আসে তাহারি আজান॥

ইমতাজ : ঐ ঐ পোলাপান ! তোরা আমাগোর হুজুরের পোলা—ঐ যে শাহাজাদারে দেখছস্?

একটি বালক : শাহাজাদা? হুজুরের ছেলে? তাকে ঐ পীরপুকুরে গোসল করতে দেখেছি। আমরা উঠে এলাম—তারপর আর জানি নে।

ইমতাজ : অ্যাঁ ! স-স-সর্বনাশ হইছে। সর্বনাশ হইছে। হায়, হায় হায়, আমি কিসের লাইগ্যা তারে ঐখানে রাইখ্যা চইল্যা আসলাম? আমি কিসের লাইগ্যা চইল্যা আসলাম? এখন আমি কি কইমু? হুজুরের কি কইমু? এ-এই যে বদ্‌নার মাইয়ো, বদনার মাইয়ো—ঐ শাহাজাদা বাড়িতে ফিরছে? দেখছস্ তারে?

বদনার মা : শাহাজাদা বাড়ি ফিরবে কি করে রে মুখপোড়া? তুই যে তাকে গোসল করাতে নিয়ে এলি—তোদের ফিরতে দেরি দেখে বেগম সাহেব পাঠিয়ে দিলেন দেখতে।

ইমতাজ : অ্যাঁ! ব-বদনার মাইয়ো, কি হইব? আরে তারে যে আমি পা-পা-পাইতেছি না। আরে তারে আমি পুকুরঘাটে বসাইয় বাড়িতে গেছিলাম। আ-আ-আইসা দেখি সে আর নাই।

বদনার মা : হায় আল্লা! এ কি হল? আমি দৌড়ে গিয়ে হুজুরকে খবর দি। ঐ যে হুজুর আসছেন। হুজুর! হুজুর! শাহাজাদা পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে গ্যাছে।

জমিদার : অ্যাঁ! কি-কি-কি বললি? খোকা ডুবে গ্যাছে? ওরে, ওরে কে কেথায় আছিস ছুটে আয়! ওরে ঝাঁপিয়ে পড় পুকুরের পানিতে, ওরে জেলেদের খবর দে জাল আন্‌তে; হে আল্লা। ঈদের দিনে তুমি এ কী করলে? খোকা! খোকা একবার উঠে আয়। ঐ শোন্ ঈদের তক্‌বির!

(ফকিরের গান)

প্রাণের প্রিয়তম যাহা কিছু তোমার খোদার রাহে ফিতরা দে আজিকে ঈদের চাঁদে॥

জমিদার : শা সাহেব! শা সাহেব! তোমারই বরদোয়ায় বুঝি আমার মানিক হারিয়েছি এই পুকুরের পানিতে। ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার শাহাজাদাকে, আমার খোকাকে, আমার খানদানের ঐ একটিমাত্র চেরাগ, আমার একমাত্র সন্তান—

ফকির : আহা-হা-হা! কি কর, কি কর। পা ছাড় বাবা পা ছাড়। খোদার কাছে চাও, তিনি ছাড়া কেউ কিছুই ত দিতে পারে না বাবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাল দেখছিলাম বটে—তোমারই দেয়ালদির সামনে গোলাপ ফুলের মত টুকটুকে একটি ছেলে। সেইটিই কি—

জমিদার : হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা, সেই; শা সাহেব, আমি খোদাকে কোনদিন ডাকিনি, শুধু ডাকবার ভান করেছি মাত্র, তবু খোদা আমায় সকল নিয়ামৎ দিয়েছেন। আমি পাপী, তাই বুঝি তিনি সব ফিরিয়ে নিলেন। তুমি আউলিয়া, সত্যকার খোদার বান্দা—তুমি দোয়া কর, তাহলেই আমি আমার হারানো মানিক ফিরে পাব।

ফকির : বাবা তুমি খোদার দানের মর্যাদা রাখতে পারনি। শুধু গ্রহণই করেছ, তাঁর নামে রহেলিল্লাহ্ কখনও একটা কানাকড়িও দাওনি। তাই খোদা তাঁর পাওনা তিনি আদায় করে নিলেন। তোমার ধনদৌলত যা তুমি জিনের মত দিনরাত আগলে পড়ে আছ—তার ত এক কণাও খোকা সাথে নিয়ে যায়নি। এখন বরং তোমার খরচ অনেক কমে গেল। ধন,

দৌলত তোমার আরও বেড়ে যাবে। আর হয়ত তার উপর দাঁড়িয়ে তুমি মক্কা-মদিনাও দেখতে পাবে।

জমিদার : ফকির, রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! আজ ঈদের দিনে আমার বাড়িতে কারবালার মাতম উঠেছে—আমি মাপ চাচ্ছি খোদার কাছে, তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি। আমি আল্লাতালার পাক নাম নিয়ে আজ এই ঈদের দিনে কসম করে বলছি, আমার সমস্ত জমিদারি রহেলিল্লা গরিবদের জন্য ওয়াকফ্ করে গেলাম। আমার শাহ্জাদাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তাকে নিয়ে ভিক্ষে করে খাব।

ফকির : আচ্ছা বাবা যাও ; বাড়িতে গিয়ে দেখবে তোমার খোকা ফিরে এসেছে। কিন্তু বাবা, আর কোনদিন খোদাকে ফাঁকি দিতে চেও না—তাহলে এর চেয়েও ভীষণ শাস্তি পেতে হবে।

জমিদার : শাহ্জাদা ! খোকা ! ফিরে আয়, ফিরে আয়।

বদনার মা : হুজুর ! হুজুর ! দৌড়ে আসুন—শাহাজাদা ফিরে এসেছে। এক ফকির তাকে বাড়ি দিয়ে গেল।

জমিদার : ওরে না, না, বাড়িতে নয়, বাড়িতে নয়—ঈদ্‌গাহে ! ঐ শোন ঐ শোন তকবিরের আওয়াজ ; ওরে খোকাকে নিয়ে আয় ঈদগাহে, খোদায় রাহে ওরে আমি সাদকা দেব, সাদকা দেব।

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন খানের তালিকা ও এইচ.এম.ভি কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার।]

বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা

(রেকর্ড নাটিকা ; এন ২৭২৯৪)

স্বামী : অ গিন্নি ! বলি ও গ্যাদারের মা ! আরে হুনছনি? চিঁহি চিঁহি, চিঁহি চিঁহি, চিঁহি।

স্ত্রী : গ্যাদাইয়্যা রে। ছুইট্যা আয়রে, ছুইট্যা আয়। আরে ঘরে ঘোড়া ঢুকছে ! হেই, হেই।

স্বামী : আরে, আরে,—ঘোড়া না, ঘোড়া না। আরে আমি, আমি। তা দ্যাখ, হে হে ! আজক্যা বাড়িতে আসনের সময় দুইটা টাকা দিয়া একটা লটারির টিকিট কিন্‌ছি।

স্ত্রী : কি কও? লেখার চিঠি? লেখার চিঠি কিইন্যা দুইটা টাকা জলে দিছ?

স্বামী : না রে আমার পোড়া কপাল ! আরে লেখার চিঠি না, লটারির টিকিট। বিলাতের ময়দানে ঘোড়দৌড় হইব। এই টিকিটের যেই ঘোড়া, হেয় যদি ফাস্ট হয় তবে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পামু।

স্ত্রী : পঞ্চাশ হাজার টাকা?

স্বামী : হ্যাঁ।

স্ত্রী : কয় দামে পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় গো? আর ঘোড়া ফাস্ট হইব? অ ! বিলাতের ঘোড়া বুঝি ইস্কুলে পড়ে

স্বামী : আ আমার পোড়া কপাল। আরে ঘোড়ায় ইস্কুলে পড়ব ক্যান্? দৌড় দিয়া যদি আমার ঘোড়া হগ্‌গলের আগে যায় তবেই হেই ঘোড়া ফাস্ট হইবে।

স্ত্রী : ও সে জানি বুঝলাম ; তা তোমার ঘোড়া ফাস্ট হইব কেমন কইরা, তুমি রইলা এই দ্যাশে, ঘোড়া রইল বিলাতে—আরে খেদাইয়া লইয়া যাইব কেডা?

স্বামী : আ আমার পোড়া কপাল ! আরে হেই দেশে সাহেব ঘোড়ার সব সাহেব সহিস আছে, হেরাই ঘোড়া খেদাইয়া লইয়া যাইব। দ্যাখ, আজকে অফিসে বইসা বইসা একটা ঘোড়া পূজার গান লিখছি। শোন্‌বা, শোন্‌বা নাকি? তা শোন। দ্যাখ, এই প্রথমে গাই ঘোড়া পূজার মন্ত্র, দ্যাখ :

ওঁ নমস্তে শ্রী বিলাতি অশ্ব সায়েব হর্স নমোনমঃ
চতুষ্পদ একপুচ্ছ শৃঙ্গহীন জীব আদর্শ
সায়েব হর্স নমোনমঃ ॥

এ্যাই, আরে পক্ষিরাজের বাচ্চা আমার ঘোড়া ছুইট্যা যাও।
ক্যাৎরাইয়া দুই চক্ষুরে ঘোড়া ছ্যাৎরাইয়া তাজ পাও॥

স্বর্গপানে ল্যাজ উঠাইয়া, (ছোট) চিঁহি চুঁহু চিঁহি চুঁহু ডাইক্যা
আমরা দুজন রাত্র জাগুম ছোলা ভিজাইয়া রাইখ্যা (রে)
ফার্স্ট যদি না হও ঘোড়া, (তোমার) ঘোড়ানির মাথা খাও
(হালা) পট পটাইয়া খাও॥

স্ত্রী : দ্যাখ, ঘোড়ার টাকা পাইলে আমি একশ ভরি সোনা দিয়া গহনা গড়ামু।

স্বামী : কি কও? না, না তা হইব না, তা হইব না! আগে আমি জমি কিনুম, জায়গা কিনুম, বাড়ি করুম, ঘর করুম, তারপর সব।

স্ত্রী : কিছুতেই না, আমি যদি একবাপের বিটি হই, তবে আমার গয়না আগে হইব। তারপর অন্য কিছু।

স্বামী : কিছুতেই না, কিছুতেই না। আমি যদি একবাপের ব্যাটা হই তবে এক লাঠি দিয়া তোমার মাথা ভাইঙ্গ্যা...

স্ত্রী : অ! আর একটা বউ ঘরে আন্‌বা না? এই তোমার লেখার চিঠি রইল আমার আঁচলে বান্ধা—ওরে উনানে দিয়া পুড়াইয়া ছাই ভস্ম কইর‍্যা দুই পা দিয়া মাড়াইয়া...

স্বামী : দ্যাক, দ্যাক, দ্যাক—ভালো হইব না, ভালো হইব না। টিকিট দাও টিকিট দাও, শিগ্‌গির টিকিট দাও।

স্ত্রী : না দিব না।

স্বামী : দিবা না? দিবা না? তবে—(প্রহারের শব্দ)

স্ত্রী : মা গো! বাবা গো! গেছি গো! ওগো কে কোথায় আছ গো! দৌড় দিয়া আহ গো! বাবা গো! গেছি গো! ওরে, গ্যাদাইরা রে, ছুইট্যা আয় রে, ছুইট্যা আয়। ওরে তোর বাপের বিলাতি ঘোড়ার ভূতে পাইছে রে, বিলাতি ঘোড়ার ভূতে পাইছে।

স্বামী : কেডা রে? কেডা রে? বাইরে কান্দে কেডা রে? বাইরে কেডা পোলারে।

একটি বাচ্ছা ছেলে : আমি। আমি বিলাতি বাচ্চা—গ্যাদাইরা।

স্বামী : ও? ঘোড়ার বাচ্চা!

বাঙালি ঘরে হিন্দি গান

(রেকর্ড নাটিকা ; এন–২৭২৯৪)

সঙ্গীত শিক্ষক : 'গহরী গহরী নদীয়া'...কও।

ছাত্রী : 'গহড়ী গহড়ী'

সঙ্গীত শিক্ষক : আরে আরে ! 'ড়' না, 'গহড়ী' না 'গহরী' ! 'ব' এ বিন্দু 'র'।

ছাত্রী : ও ! বুঝতে পেরেছি।

শিক্ষক : হ্যাঁ কও দেহি।

(গান)

গহরী গহরী নদীয়া

ছাত্রীর ঠাকুরমা : আহা–হা–হা ! কী গানই গাইতাছে বিমলী ! নদীয়ায়, নবদ্বীপের গান ! বিমলী কি গান গাইতাছে মাস্টার ? গৌর নিতাই নদীয়ায় না ?

শিক্ষক : আইজ্ঞা হাঁ। এইটা হইল হিন্দি গান। গহরী গহরী নদীয়ায়।

ঠাকুরমা : অর মানেডা কি হইল ?

শিক্ষক : আইজ্ঞা, ঐ যে গহরজান বাঈজী, গহরজান বাঈজী নদীয়া যাইতেছেন, গানে তাই কইতাছেন।

ঠাকুরমা : কি কও ? নদীয়ায় বাঈজী নাচব ? গৌর নিতাই যেহানে নাচছে সেহানে কি না বাঈজী নাচব ? অরে পিঠ্‌ঠার বারি মাইরা খেদাইমু।

ছাত্রী : আঃ কি কর ঠাকুরমা ? ও কি সত্য সত্যই নদীয়ায় যাইতেছে নাকি ? গানে কইতাছে।

ঠাকুরমা : তুই র ! তুই কি বুঝস ? ধর্ম নষ্ট হইব না ?

শিক্ষক : অ ! আচ্ছা, তবে থাক, তবে থাক্। এই গানটা থাক্। ধর্ম যদি নষ্ট হয় তবে এই গানটা থাক। আচ্ছা এই গানটা শোনেন দেহি :

(গান)

এ্যাই, সাঁইয়া নাহি বোলুঙ্গি

কও দেহি ;

(ছাত্রী ও শিক্ষক উভয়ের গান)

সাঁইয়া নাহি বোলুঙ্গি

ঠাকুরমা : এ আবার কোন্ ছাতার গান গাইতে আছ? অডার মানে কি?

শিক্ষক : আইজ্ঞা, এইডার মানে হইল গিয়া এই, সাঁইয়ারে কইতাছে যে আমি নামু, একটা লুঙ্গি লইয়া আসি। সাঁইয়া নাহিব লুঙ্গি, সাঁইয়ার কাছে লুঙ্গি চাইতাছে।

ঠাকুরমা : কি কও! বামুনের বাড়ি লুঙ্গি কও! এই গান তুমি মিঞা সাহেবদের বাড়ি গিয়া শিখাও গিয়া। আরে কাপড় না চাইয়া চাও কি না লুঙ্গি! কি ছাতার লুঙ্গির গান শিখাও? বাংলা গান শিখাইবার পার না? কীর্তন, ভাইট্যালি।

শিক্ষক : আঃ! আচ্ছা মুস্কিলে পড়ছি এই বুড়িটারে লইয়া। আচ্ছা, আচ্ছা, এই গানটা শোনেন দেহি—আমার মনে হয় এই গানটা আপনার ভালো লাগবই, এইটা শোনেন দেহি, এই দেখেন :

(গান)

বিছুনানা মোরি গাজে ঝনন।
সাসহুঁ জাগে, ননদহুঁ জাগে,
আউর জাগে সব কুটুমকে লোগুয়া
মহম্মদ শা সাথ সদারঙ্গ জাগে,
ক্যায়সে মিলুঁ ম্যায় হরিকে চরণ॥

ঠাকুরমা : আহা-হা-হা! এই না কয় গান! হরির চরণ বাতলাইবার চায়। অর মানেডা তাই না মাস্টর? হরির চরণ বাতলাইবার চায় না?

শিক্ষক : আজ্ঞে না, তা ঠিক না, আজ্ঞে হাঁ—আজ্ঞে হ হ—ঠিক তাই-ই তাই-ই, তবে কি না—আমাদের শ্রীরাধিকা, আমাদের শ্রীরাধিকা কইতাছেন যে বিছুনানা বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ অর্থাৎ কি না বিছানা ঝন্ ঝন্ কইরা বাজতাছে।

ঠাকুরমা : আরে হ হ, বাত হইলে ঐ রকম বাজে।

শিক্ষক : আজ্ঞে হ, আজ্ঞে হ, বাত হইলে ওই রকম বাজে ; আর কইতাছেন কি—কইতাছে শাশুড়ি জাগে, ননদিনী জাগে, কুটুমে জাগে, হগ্‌গলে জাগে।

ঠাকুরমা : জাগ্‌ব না? ঘরের বউ হইয়া পরের কাছে যায় : নিশ্চয় জাগব। হাজার বার জাগব।

শিক্ষক : আজ্ঞে হ, এরা ত জাগতেই আছেন ; আর জাগতে আছেন কে? জাগতে আছেন মহম্মদ শা, জাগতে আছে সদারঙ্গ মিঞা ; সদারঙ্গ মিঞারে লইয়া মহম্মদ শা জাগতে আছে। তাই রাধিকা কইতাছেন যে কেমন কইরা হরির কাছে যাইমু?

ঠাকুরমা : কি কও? সদারঙ্গ মিঞা আইল কোন থাইক্যা? মিঞা সাহেবেরে উইঠ্যা যাইবার কও। আমাগো রাধা শ্রীহরির কাছে যাইবার পথ পাইছে না।

শিক্ষক : আজ্ঞে, উনি যাইবেন কেমন কইর্‌যা? গানটা যে ওঁরই লেখা।

ঠাকুরমা : আচ্ছা, আচ্ছা, মিঞা সাহেবেরে মুরগি কিনে খাইবার পয়সা দিমু। ওঁরে এখনই উইঠ্যা যাইবার কও।

শিক্ষক : আমি কি ওনারে উঠাইতে পারি ?

ঠাকুরমা : তুমি না পার পুলিশে খবর দাও, চৌকিদারে খবর দাও, থানায় খবর দাও, আমাগো দারোয়ান ডাকতে হইব মাস্টার, আমাগো দারোয়ান ডাকতে হইব।

শিক্ষক : কি কপালই করছি রে বাবা গান শিখাইতে আইসা।

'জন্মাষ্টমী' রেকর্ড নাটিকা (হিন্দি)

এন ১৭১৬৯

(প্রথম ভাগ)

মায়ার গান

সোজা সোজা সোজা জাগ ন্যরনারী
বাদল গ্যার্‌্যজো বিজলি চ্যম্যকা
র‍্যজ্যনী ঘোর অঁধিয়ারী।।

দেবকী : নাথ। দেখো ক্যয়সা সুন্দর ব্যচ্চা হ্যয়।

দেবকন্যাদের গীত

আও আও স্যজনী
ম্যঙ্গল গাও শঙ্খ বাজাও
স্যফ্যল মানো র‍্যজনী।।
অ্যম্যর লোক্ সে কুসুম গিরাও
তীন্ লোক মে ম্যর‍্যব ম্যনাও
হঁস্যতী আজ ধরণী।।

দেবদেবীগণ : ধ্যন্য হো ব্যসুদেও।
ধ্যন্য হো দেওকী।

দেবকী : সোয়ামী, ইস্ ব্যচ্চেকা জন্ম হোনে প্যর দেওয়া যাঁ গীত গা র‍্যহী হ্যঁয়, দেওতা খুশি ম্যনা র‍্যহে হ্যঁয় ! ইসে ব্যচাও, ইসে ক্যন্স্‌কে হাথ্‌মে ন্য দো। মাতা হোক্যর ম্যয় ইসে ম্যওৎ কো স্যঁওপ ন্য স্যকঙ্গী।

বসুদেব : দেওকী, দেবী, ইস্ ব্যচ্চে কী ম্যমতা ছোড় দো, ইস্‌কে বিনাশকে লিয়ে হী হ্যম কারাগার মে র‍্যাখ্যে গ্যায়ে হ্যয়।

দেবকী : কেয়া কোই উপায় ন্যহী হ্যয়। হে আকাশমে র‍্যহনেওয়ালে দেবী দেওতা, মেরি প্রার্থনা সুনো, মেরে ব্যচ্চে কো বাঁচাও, মেরি ব্যচ্চো কো রক্ষা ক্যরো।

দৈববাণী : দেওকী ! ন্য ঘ্যবড়াও। বসুদেও, তুম ইস্ ব্যচ্চেকো লেক্যর অভী গোকুলমে চ্যলে যাও, অ্যওর নন্দকে ঘ্যরমে এক ল্যড়কিকা জন্ম হুয়া হ্যয় উসে য়হাঁ লাক্যর

র‍্যখ দো, মায়াকে প্রভাওসে সারা জাগৎ সো র‍্যহা হ্যয়, কোই বাধা তুম্‌হারে সামনে ন্যহি আয়েগি।

দেবকী : নাথ, ভ্যগওয়ান আকাশবাণী দোয়ারা হামে রাহ্ দিখা র‍্যহে হ্যঁয়, তুম ইস্ ব্যচ্চেকো লেক্যর অভি গোকুলমে চ্যলে যাও, মেরে ব্যচ্চেকো ব্যচাও।

বসুদেব : ওফ্, ক্যয়সী অঁধিয়ারী হ্যয়! ম্যয় ইয়ে ন্যদী পার হোক্যর ক্যয়সে যাঁউ, ক্যয়সে ভয়ানক বাদল গ্যার‍্যজ র‍্যহে হ্যঁয়, বিজলি চ্যম্যক্ র‍্যহী হ্যায়, ইফ্, ইয়ে কেয়া, ইয়েহ্ কাল স্যর্প মেরী ত্যর‍্যফ কেঁউ দৌড়াআ র‍্যাহা হ্যয়, ম্যয় কিধ্যর যাউ, কিধ্যর যাউ—প্যরেমের্সওয়র মেরী রক্ষা ক্যরো।

দৈববাণী : ব্যসুদেও। ন্য ঘ্যবড়াও, ইয়ে মায়া—স্যর্প, ব্যর‍্যসতে হুয়ে পানীসে তুম্‌হে ব্যচানেকে লিয়ে আয়া হ্যয়! বিজলি চ্যম্যক র‍্যহী হ্যয় তুম্‌হে রাহ্ দিখানে কে কিয়ে, মায়া এক জানওর কা রূপ ধ্যর ক্যর ন্যদী পার হো র‍্যহী হ্যয়, তুম উস্‌কে সাথ লো, কোই বিপ্যত্তি তুম্‌হারে সামনে ন্যহী আয়েগী।

বসুদেব : মুঝে রাহ্ দিখানেওয়ালে আকাশকে দেওতা, তুম্‌হে অসঙ্খ প্রণাম।

(দ্বিতীয় ভাগ)

ব্রজের রাজপথ

বস্যন্ত ও সুন্দ্যর

বস্যন্ত : আজী আজ ইয়ে সারী বৃজভূমি কিধ্যরকো জা র‍্যহী হ্যয়?

সুন্দ্যর : ক্যয়সী উল্‌টি বাতেঁ ক্যরতে হো, বৃজভূমি ন্যহি, বৃজ গোরিয়াঁ ক্যহো।

বস্যন্ত : আচ্ছা ওহি স্যহি, আখির ইয়ে যাতি কি ধ্যরকো হ্যঁয়?

সুন্দ্যর : তুমহে প্যতাহি ন্যহি, ওয়াহ, অজী ন্যনদকে ঘ্যরমে এক ব্যড়া হী সুন্দ্যর বালক প্যয়দা হুদা হ্যায়, ইয়ে স্যব উসীকো দেখ্‌নে যা র‍্যহি হ্যঁয়, উও দেখো, গীতগাতা হুয়া গোরিও কা অ্যওর এক ঝুণ্ড ইধ্যর হী, আ র‍্যহা হ্যয়।

বস্যন্ত : তো চ্যলো হ্যম্ ভী উন্‌কে সাথ হোলেঁ।

ব্রজবালাগণের গীত

বৃজমে আজ স্যখী ধূম ম্যচাও
আওরী বৃজবালা ম্যঙ্গল গাও॥
গুঁথো স্যখীরী স্যব কুসুম-মালা
দেখান কো চ্যলো নন্দকে লালা,
বৃজকে ঘ্যর ঘ্যর হর‍্যষ ম্যনাও॥

(কারাগার)

দ্বারী : মাহারাজ ক্যন্সকী জ্যয় !

বসুদেব : দেওকী দেওকী, ক্যন্স আ র্যহা হ্যয় অভী ইস্ ব্যচ্চেকা অ্যন্ত ক্যর দেগা।

ক্যন্স : কিধ্যর হ্যয় ব্যচ্চা, হাঁ, মুঝে স্যঁওপ দো, ম্যয় আপনে হাথোঁসে ইস্‌কী হত্যা করুঙ্গা।

দেবকী : ন্যহী ন্যহী, ম্যয় ইসে ন্য দুঙ্গী মেরে প্রাণ র্যহতে হুয়ে, ম্যয় ইয়ে ন্য দুঙ্গী, ইসে ছোড় দো, ছোড় দো !

ক্যন্স : অচ্ছা, দেখতা হুঁ, তুম ক্যয়সে ইসে ব্যচাতী হো।

দেবকী : ওফ্ !

ক্যন্স : হা, হা, হা, হা, হা, হা, ইয়ে কেয়া ক্যা, অচ্ছা ইয়েহী স্যহী, ইয়ে কেয়া বিজলি হো গ্যয়ী।

দৈববাণী : পূরা হুয়া হ্যয় কাল তুমহারা, ম্যহাকাল অ্যব আয়া হ্যয়। গোকুলকে আজ ঘ্যর ঘরমে উও স্যবকে ম্যনকো ভায়া হ্যয়।

দেবদেবীগণের স্তুতি

পতিত উধারণ জয় নারায়ণ
কমলাপ্‌তে জয় ভ্যও–ভ্যয়–হার্যণ
জয় জ্যগদীশ হ্যরে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও আজাহারউদ্দীন খানের তালিকা। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—'কথা : কাজী নজরুল' আগস্ট, ১৯৩৮।]

'প্ল্যানচেট' রেকর্ড নাটিকা

(এন ৯৭৬০)

কলেজের ছাত্র প্রথমনাথ পরলোকতত্ত্বের গবেষণা করেন। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে এই গবেষণার বৈঠক বসে।

প্রমথনাথের মেজ বৌদি : কি গো শ্রীমান, একলা একলা যে? প্রমথনাথের আর সব প্রমথগুলি কোথায় আজ? আচ্ছা? ঠাকুরপো, রোজ সন্ধ্যের সময় তোমরা তিন–চারটি বন্ধু মিলে চিলে ঘরটাতে চিৎকার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি কর বল ত?

প্রমথনাথ : ও তুমি বুঝি প্ল্যানচেটের কথা বলছ বৌদি?

মেজ বৌদি : প্ল্যানচিট : ও–ত ইংরেজি কথা। প্ল্যান মানে মতলব আর চিট মানে ঠকানো। ও? তোমরা লোক–ঠকানোর মতলব করেছ?

প্রমথনাথ : (ঈষৎ হাসিয়া) না গো না, তা নয়। প্ল্যানচিট নয়, প্ল্যানচেট। সেটা কি জানো? একখানা তেপায়া টেবিল সামনে নিয়ে তিন–চারজনে মিলে অন্ধকার ঘরে বসে কোন মৃত আত্মাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে হয়। বেশ একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে পারলে সেই মৃত আত্মার আবির্ভাব দিব্য অনুভব করা যায়। তাঁদের আরোহন করে তাঁদের সঙ্গে আমরা কথা কই। এইভাবে বহু মৃত মহাত্মা এসে আমাদের সঙ্গে কথা কয়ে যান।

মেজ বৌদি : তোমাদের কল্যাণে মহাত্মারা বর্তমানেই তাহলে ভূত হয়েছেন? তা এই মহাত্মাদের কি আমরা একদিন দেখতে পাই না ঠাকুরপো? হায় হায়, ঠাকুরপো—কলেজে পড়ে তোমাদের বিদ্যে শেষ পর্যন্ত ভূতেদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তা বেশ হয়েছে। আমাদের একদিন দেখাবে না ভাই?

প্রমথনাথ : বেশ ত! কালই দেখাতে পারি। কাল অমাবস্যা আছে ; ভূত–পেত্নীদের অভিসার রাত্রি। তুমি তাহলে আর সব বৌদিদের বলে ঠিক করে রেখো। আগামীকাল অমাবস্যার রাত্রে—কেমন, মনে থাকবে তো?

মেজ বৌদি : হুঁ।

প্রমথনাথ : হা, হা। কাল রাত্রি আসবার আগেই হয়ত তোমরা যে যার বাবার বাড়ি গিয়ে উঠবে।

মেজ বৌদি : না গো না! সে ভয় তোমার করতে হবে না। তোমাদের ভূতের দলই না উধাও হয় তাদের প্ল্যান কি চিটের রহস্য ধরা পড়ার ভয়ে! দেখ ঠাকুরপো, এক কাজ করি।

প্রমথনাথ : বল?

মেজ বৌদি : তোমার বোনেদেরও খবর দিয়ে রাখি। তারাও এসে তাদের ভাইয়ের সাহস দেখে যাবে।

প্রমথনাথ : লক্ষ্মীটি বৌদি ! ঐটি করো না ভাই। তারা মাটির মানুষ ; মানুষের মত এইভাবে ভূতের ঝগড়ঝাঁটি—হুঃ পেত্নীরা নাকি তাদের স্বজাতি মানুষ—পেত্নীদের ভয় করে না।

মেজ বৌদি : আচ্ছা গো আচ্ছা ! তোমার বোনেদের না হয় রেহাই দিলাম। তুমি কিন্তু তোমার সঙ্গী ভূতদের Infomation করে রেখো। তারা যেন আসতে ভুল না করে।

প্রমথনাথ : আচ্ছা গো আচ্ছা ! আমি এখন থেকেই প্রমথনাথের সাধনায় প্রবৃত্ত হই—

(গান)

জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ঙ্কর ;
ভৈরব শ্মশানচারী শিব প্রমথনাথ শঙ্কর।
ভয়াল করাল দানব এস পরিহার মানব
ধূর্জটি রুদ্র মহেশ, জয় জয় শিব শঙ্কর॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বিতীয় দিন ; অমাবস্যার রাত্রি। চিলের ছাদে নির্জন অন্ধকার কক্ষে তিন বৌদি তিনটি চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছোট তেপায়া টেবিল। পুরুষ-প্রকৃতির অসীম সাহসিকা মেজ বৌদি তাদের লিডার॥

প্রমথনাথ : আচ্ছা বৌদিরা, তোমরা এবার চোখ বুজে সামনের টেবিলে বেশ করে হাত ঘষতে থাক। হ্যাঁ, আর আমি যে যে ভূতদের ডাকব তাদের কথা মনে মনে ভাবতে থাক, কেমন? প্রস্তুত?

মেজ বৌদি : হ্যাঁ, প্রস্তুত।

ছোট বৌদি : ছোট্‌দি, আমার কিন্তু ভয় করছে। সত্যি সত্যি ভূত আছে তাহলে?

মেজ বৌদি : তুই চুপ কর ছোট বৌ। ভয় পেয়ে তুই আমাদের নাম ডোবাবি দেখছি। আমার আঁচল ধরে থাক্।

বড় বৌদি : তা যাই বল মেজ বৌ ! আমারও কিন্তু গা ছম্‌ছম্ করছে।

প্রমথনাথ : এবার তাহলে আমি ভূতেদের ডাকি। সব প্রস্তুত হও আর হাত ঘষ। ঘষ, বেশ করে ঘষ। আমি ডাকছি—

(ছড়ায়)

কই বাবা ভূত পেত্নী এসো
চোখে দেখা দাও হে ;
শুটকো, মুটকা, বিকট, ভীষণ
নানান্ মূর্তি লয়ে।

নাকি সুরে কও কথা যে
থাক শেওড়া গাছে ;
সেই পেত্নীর রগ্ ঘেঁষে সব
বস বৌদিদের কাছে।
শাল বৃক্ষে একানর—নর বঙ্গে এসো
বেল বৃক্ষের ব্রহ্মদৈত্য–একানরের মেশো
তুমিও সাথে এসো।
ডাকিনী যোগিনী এস—উড়ে শ্মশান থেকে
দাও তোমাদের রং বৌদিদের
ঐ চাঁদ বদনে মেখে !
ভূত পেত্নী সবাই মিলে বৌদিদের ধরে
বেশি নয় তোমরা এসো গোটা বারো তেরো॥

ছোট বৌদি : দ্যাখ দ্যাখ, আমার ভয় করছে বড়দি।

বড় বৌদি : মেজ বৌ ! আমারও ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে।

মেজ বৌদি : কই ঠাকুরপো ! তুমি ছাড়া তোমার কোন ভূতই ত দেখলাম না। হ্যাঁ, তবে বাইরে তোমার জন কয়েক ভূত বন্ধুদের নাকি সুরে Chorus শুনছি বটে।

প্রমথনাথ : ব্যস, আমার মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। এবার ভূত দেখবে। তোমরা সবাই হাত ঘষেছিলে ত টেবিলে ?

বড় বৌদি : ঘষে ঘষে ফোস্কা পড়ে গেল ঠাকুরপো।

প্রমথনাথ : আচ্ছা, আর ঘষতে হবে না। এবার শোন ! দু'হাতে বেশ করে যে যার মুখ চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে। এসো—আচ্ছা এইবার আয়নার সামনে দাঁড়াও। আচ্ছা, আমি ওয়ান, টু, থ্রি—বললে একসঙ্গে চোখ চাইবে। ওয়ান–টু–থ্রি।

ছোট বৌদি : ও মাগো ! ঐ আয়নার ভেতরে কে গো ?

বড় বৌদি : ও মেজ, বৌ !

মেজ বৌদি : হুঁ, ঠাকুরপো আমাদের চোখেই দেখিয়েছে। তবে এসব ভূত আর কেউ নয়, আমরাই তিন জন

বড় বৌদি : তার মানে ?

মেজ বৌদি : ঘরের আলোটা জ্বাল—তাহলেই বুঝতে পারবে। ওগো, যে, টেবিলে আমরা হাত ঘষছিলাম সে টেবিলে শ্রীমান বেশ করে ভুষো মাখিয়ে রেখেছিল। আমরা অন্ধকার তাতেই হাত ঘষে যে যার মুখে বেশ করে মেখে বেরিয়েছি।

বড় বৌদি : ওমা ! ঠাকুরপো আমাদের মুখে কালি দিলে

প্রমথনাথ : শুধু কালি নয় বৌদি—চুন–কালি। দ্যাখ না মেজ বৌদির কালি মাখা মুখ কি রকম চুন করে আছে।

মেজ বৌদি : আচ্ছা—দেখো, মজা টের পাবে এখন।

ঈদজ্জোহা

[প্রথমে দূরাগত আজানের ধ্বনি—fade in আজান fade out—]

(গান)

ঈদজ্জোহার তকবির[১] শোন ঈদগাহে[২]।
(তার) কোরবানিরই সামান নিয়ে চল রাহে॥
কোরবানির রঙে রঙিন পর লেবাস[৩]
পিরাহানে[৪] মাখ রে ত্যাগের গুল-সুবাস
হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে
ঈদগাহেরই পথে যেতে
দে মোবারকবাদ দীনের বাদশাহে॥
খোদারে দে প্রাণের প্রিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা,[৫]
যেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে হাজেরা,
ওরে কৃপণ, দিসনে ফাঁকি আল্লাহে॥
তোর পাশের ঘরে গরিব কাঙাল কাঁদছে যে,
তুই তারে ফেলে ঈদগাহে যাস সঙ সেজে,
তাই চাঁদ উঠল, এল না ঈদ
নাই হিম্মত নাই উম্মিদ
শোন কেঁদে কেঁদে বেহেশত হতে
হজরত আজ কী চাহে॥

আজ ঈদজ্জোহা—বকরীদ। আজ পরম ত্যাগের পরম উৎসব। হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস্‌সালামের আবির্ভাবের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে হজরত ইব্রাহিম আলায়হিস্‌সালাম নবুয়ত[৬] পান—অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নবি রূপে প্রেরিত হন। আল্লাহর নামে তিনি তাঁর অন্তরের বাইরের সব-কিছু সমর্থন করেন বলে তাঁকে খলিলুল্লাহ বা আল্লার বন্ধু সখা বলা হয়। তাঁকে এই পরম গৌরবে গৌরবান্বিত করা হয় দেখে বেহেশতের ফেরেশতারা আল্লাহকে নিবেদন করেন—হে পরম প্রভু, ইব্রাহিম এমন কী পুণ্য অর্জন করেছেন যে, তোমার সখা বলে তিনি অভিনন্দিত হলেন? আল্লাহ বললেন—তার আমার উপরে কী নির্ভরতা, কত পরম ত্যাগী সে তোমরা দেখো। এই

---

১. আল্লার মাহাত্ম্য ঘোষণা। ২. ঈদের নামাজ পড়ার ময়দান। ৩. দামী পোশাক। ৪. ঢিলা কুর্তা। ৫. মহিমা, বিভূতি। ৬. নবির দায়িত্ব।

বলে ইব্রাহিমকে স্বপ্নে বললেন, 'ইব্রাহিম, আল্লাহর নামে কোরবানি দাও!' হজরত ইব্রাহিম তার পরদিবস তাঁর উটগুলি কোরবানি দিয়ে গরিব-দুঃখিদের বিলিয়ে দিলেন। আল্লাহ আবার স্বপ্নে বললেন, 'ইব্রাহিম উৎসর্গ করো!' ইব্রাহিম আবার উট কোরবানি দিলেন। আল্লাহ আবার স্বপ্নে ইব্রাহিমকে বললেন 'ইব্রাহিম! তোমার সবচেয়ে প্রিয় যে তাকে আল্লার নামে কোরবানি দাও!' ইব্রাহিম বুঝলেন—তাঁর একমাত্র পুত্রই এই দুনিয়ায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ইসমাইল তখন তাঁর মাতা হাজেরার সাথে বর্তমান কাবার কাছে প্রায় বনবাসীর জীবনযাপন করছেন। ইব্রাহিম গিয়ে তাঁর পুত্রকে আল্লাহর আদেশ শোনাতেই ইসমাইল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তাঁর এই বান্দাকে তাঁর পবিত্র নামে কোরবান হওয়ার জন্য কবুল করেছেন।' ইসমাইলের মাতা বিবি হাজেরাও অশ্রুসজল নেত্রে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'আমিও সত্যই পরম সৌভাগ্যবতী, নইলে আল্লাহ তাঁর এই বাঁদির পুত্রকে কেন তাঁর নামে উৎসর্গ করার জন্য মঞ্জুর করলেন?' মা কাঁদতে কাঁদতে পুত্রকে তার পিতার হাতে দিলেন। ইব্রাহিম ইসমাইলকে আল্লার রাহে কোরবানি দেওয়ার জন্য পর্বত-শিখরে উঠে তার হাত পা বেঁধে বিসমিল্লাহ্ বলে কণ্ঠদেশে ছুরি চালালেন। আল্লার আরশ কুরসি লওহ কলম কেঁপে উঠল। ফেরেশতা হুর-পরি-গেলেমান মারহাবা-মারহাবা[১] করে কেঁদে উঠল—সাত আসমান টলতে লাগল। সূর্য মেঘের নেকাবে[২] মুখ ঢাকল। মহামৌনী মহাধ্যানী ইসরাফিলের ধ্যান ভেঙে গেল। ইব্রহিম ছুরি যত চালান ইসমাইলের কণ্ঠের একটি লোমকূপও ভেদ করতে পারেন না। তখন ইসমাইল তাঁর পিতাকে বললেন, 'পিতঃ বোধ হয় স্নেহবশত আপনার হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই হাত চলছে না। আপনি কাপড় দিয়ে আপনার চোখ বন্ধ করে ছুরি চালান।' ইব্রাহিম পুত্রের কথায় আনন্দিত হয়ে নিজের চোখ বেঁধে ছুরি চালালেন। এইবার ছুরি কণ্ঠ ভেদ করল। আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে চোখের কাপড় খুলে ইব্রাহিম দেখলেন—যাকে কোরবানি করেছেন—যার কণ্ঠ ভেদ করে ছুরি চলেছে—সে ইসমাইল নয়—সে একটি দুম্বা মেষ। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন বন্ধন-মুক্ত ইসমাইল ও হজরত জিবরাইল। আল্লার বাণীবাহক ফেরেশতা হজরত জিবরাইল বললেন—'আল্লাহ তোমার কোরবানি কবুল করেছেন—'ওই দেখো সাত আকাশ জুড়ে সমস্ত ফেরেশতা হুর-পরি তোমায় মোবারকবাদ দিচ্ছেন। আজ থেকে তোমার পুত্রের নাম হল ইসমাইল জবিহুল্লাহ্— !' এমনই বকরীদের চাঁদে এমনই দিনে হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে আল্লার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ এই বকরীদে কে আছে মুসলমান—যে মুসলমান আল্লার নামে তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন—উৎসর্গ করেছেন—কোথা সেই আত্মত্যাগী মুসলমান যিনি তাঁর সবকিছু রাহে ফিল্লাহ বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন? ঘরে ঘরে আজ গরিব কাঙাল নিরন্ন বস্ত্রহীন আশ্রয়হারা। তাদেরই পাশে আমার দালান বাড়ি, খেত-খামার শস্যে-ফসলে পূর্ণ, উদ্‌বৃত্ত অর্থে আমার বাক্স প্যাঁটরা পূর্ণ! জেওরে[৩]

১. ধন্য ধন্য। ২. চাদর। ৩. অলংকারে।

লেবাসে আমার পুত্র কন্যার অঙ্গ ঝলমল করছে—আর পাশের বাড়িতে কাঙালিনি মেয়ে কাঁদছে—

(গান)

নাই হল মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার।
(আছে) আল্লা আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি
ওতেই আমায় মানায় ভারি
কলমা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার॥
হেরা গুহারই হিরার তাবিজ কোরান বুকে দোলে
হাদিস ফেকা[৪] বাজুবন্দ, দেখে পরান ভোলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাতেমা
মোর অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি মা, নবির চার ইয়ার॥

এই ঈদজ্জোহার চাঁদে যে পশু কোরবানি দেওয়ার কথা আল্লাহ বলেছেন—সে পশু কেমন কোরআন মজিদের সুরা বকরায় অষ্টম রুকুতে[১] তার ইঙ্গিত আছে। যে গোরু বা পশু উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, সে গোরু কখনো ভূমি কর্ষণ করে না, জল সেচন করে না—ইত্যাদি। এই পশু কোরবানি দিলে পুলসেরাত[২] পার হয়ে আল্লাহর দিদার[৩] হয়। এই গো অর্থে ঐশ্বর্য, বিভূতি, জ্ঞান। এই দুনিয়ায় গো কোরবানি করে পুণ্য অর্জন হয়, কিন্তু আল্লাহর দিদার মেলে না। এই দুনিয়াতেই যাঁরা আল্লাহর দিদার চান, সেই সুফিরা জানেন, সুরা বকরার এই গো—সুফি বা সাধক যে যোগৈশ্বর্য পান, এবং তাঁর দেহে স্বর্ণ জ্যোতির আভাস ফুটে ওঠে, যে শক্তি-বলে তিনি বহু মাজেজা দেখাতে পারেন সেই জ্যোতি ও শক্তি বা বিভূতি তাকেই আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয় তা হলে পুলসেরাত বা সেরাতুল মোস্তাকিমের[৪] শেষ বাধা পার হয়ে আল্লাহর দিদার পাওয়া যায়। এই দুনিয়ার কাবায় হজ করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কারণ ইহা ফরজ কিন্তু—যেখানে গেলে আল্লাহর দিদার হয়—সেই আসল কাবা শরিফের ঊর্ধ্বতম দেশে—ব্রহ্মরন্ধ্রে ছয় লতিফার ঊর্ধ্বে !—তার নাম ফানাফির রসুল, ফানাফিল্লাহ।

(গান)

ছয় লতিফার ঊর্ধ্বে আমার আরফাত ময়দান।
তারই মাঝে কাবা—জানেন বুজর্গান॥
যবে হজরতের নাম জপি ভাই—
হাজার হজের আনন্দ পাই,
মোর জীবন মরণ দুই উটে ভাই দিই সেথা কোরবান॥

---

১. পরিচ্ছেদ। ২. স্বর্গের প্রবেশপথের দুর্গম সাঁকো। ৩. দর্শন। ৪. আল্লার নির্ধারিত পথ।

আমি তুর পাহাড়ে সুর শুনে ভাই প্রেমানন্দে গলি
ফানাফির রসুলে আমি হেরার পথে চলি।
হজরতেরি কদম চুমি হিজরে আসওয়াদ
ইব্রাহিমের কোলে চড়ে দেখি ঈদের চাঁদ।
মোরে খোৎবা শোনান ইমাম হয়ে
জিব্রাইল কোরআন॥

যাদের সম্বল দেননি হজে যাবার—তাদের দীন আত্মা ভিখারিনির মতো আজ আল্লার না-দেখা কাবার দুয়ার ধরে যেন কাঁদছে—

(গান)

আমি হজে যেতে পাইনি বলে কেঁদেছিলাম রাতে।
তাই হজরত এসে স্বপ্নে মাগো ধরেছিলেন হাতে॥
যেদিন বাবা গেলেন কাবার হজে, বলেছিলাম কাঁদি—
ধরে নবির কবর, বলো, কি দোষ করেছে এ বাঁদি
মোর মদিনা-মোহন হঠাৎ শুনলেন কি সেই মুনাজাত[১]—
তাই খা'বে[২] এসে বলেছিলেন, 'যাবে কি মোর সাথ !'
যেন জয়তুন গাছের ডাল ধরে মা বললেন আঁখি-জলে—
'দেখবে কাবা আমায় পাবে, (এই) কল্পতরুতলে।'
মা হঠাৎ এল শুভ্রজ্যোতি, আঁধার হল আলা,
যেন নীল সাগরের ঢেউয়ে দোলে লাখো মোতির মালা।
মোর সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল সেই কাবা আরফাতে॥

এই কাবায় গেলে আজো হজরতের দিদার পাওয়া যায়—এবং হজরতের শাফায়ত[৩] পেলে আল্লাহর দিদার পাওয়া যায়। এই আরফাতে নিত্য মিলন, নিত্য আনন্দ, সেখানে মৃত্যু নাই, কেবল অমৃত। দুনিয়ার আরফাতের ময়দানে সে মহামিলনের আভাস পাই, তা সেই পরম কাবা ঘরের পরমানন্দের ঈষৎ ছায়া মাত্র। আমরা আজ ঈদে যেন ভাইয়ে ভাইয়ে সকল বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি ভুলে—সকল কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর সেই ঈদগাহে গলাগলি করে গাইতে পারি :

(গান)

[কোরাস]

ঈদ মোবারক হো—ঈদ মোবারক ঈদ, ঈদ মোবারক ঈদ !
রাহে লিল্লাহ যে আপনাকে বিলিয়ে দিল, কে হল শহিদ॥
যে কোরবানি আজ দিল খোদায় দৌলত ও হাশমত[৪]
যার নিজের বলে রইলো শুধু আল্লা ও হজরত
যে রিক্ত হয়ে পেল আজি অমৃত তৌহিদ[৫]॥

---

১. প্রার্থনা। ২. স্বপ্নে। ৩. সুপারিশ। ৪. বধ্যভূমি। ৫. আড়ম্বর। ৬. আল্লার একত্ববাদ।

যে খোদার রাহে বিলিয়ে দিল পুত্র ও কন্যায়
যে আমি নয়, আমি না বলে মিলল আমিনায়।
ওরে তারই কোলে আসার লাগি নাই নবিজির নিঁদ॥
যে আপন পুত্র আল্লারে দেয় শহীদ হওয়ার তরে
কাবাতে সে যায় না রে ভাই, নিজেই কাবা গড়ে
সে যেখানে যায় জাগে সেথায় কাবার উম্মিদ॥

(তকবির-ধ্বনি ও ঈদ মোবারক ধ্বনি)

পঞ্চাঙ্গনা

১

মোমতাজ ! মোমতাজ ! তোমার তাজমহল
(যেন) ফিরদৌসের এক মুঠো প্রেম
বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম আজো করে ঝলমল ॥
কত সম্রাট হল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহজাহানে
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন মর্মর
গুঞ্জরে অবিরল।
কেমনে জানিল শাহজাহান ? প্রেম পৃথিবীতে মরে যায়,
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায় !
(যেন) তাজের পাষাণ অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী-আত্মা আজো অভিযোগ হানে
(বুঝি) সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায়
শীর্ণা-যমুনা-জল ॥

২

নূরজাহান ! নূরজাহান !
সিন্ধু নদীতে ভেসে (এলে) মেঘলা-মতির দেশে
ইরানি গুলিস্তান ॥
নার্গিস-লালা-গোলাপ-আঙুর-লতা
শিরি-ফরহাদ-শিরাজের উপকথা
এনেছিলে তুমি তনুর পেয়ালা ভরি
বুলবুলি, দিলরুবা রবাবের গান ॥
তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম, সে যে রাজাধিরাজ
চন্দন সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।
যে-কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীলাকাশে
(যাহা) লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে
দেবে চিরদিন নন্দন লোক-চারী
তব সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান ॥

৩

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কী শক্তিমতী
শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি
না রহিত অবরোধের দুর্গ, হত না এ দুর্গতি ॥
তুমি দেখালে নারীর শক্তি স্বরূপ
চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত–জয়ীর দর্প নাশিয়া
মুছালে নারীর গ্লানি ;
তুমি গোলকুণ্ডার কোহিনুর হীরা সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম
রণরঙ্গিণী ফিরে এসো, ফিরে এসো
তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে
লক্ষ্মী–সরস্বতী ॥

৪

আনার কলি ! আনার কলি !
স্বপ্নে দেখে কোন ডালিমকুমারে
এসেছিলে রেবা ঝিলামের পারে
দিতে তব রাঙা হৃদয়ের অঞ্জলি ॥
মরুর মণিকা বাদশাহি নওরোজে
এসেছিলে কোন হারানো হিয়ার খোঁজে
তব রূপ হেরি হেরেমের দীপমালা
উঠেছিল চঞ্চলি ॥
পতঙ্গ সম পাপড়ির পাখা মেলি
আনার কলি গো
সেলিমের অনুরাগে–মোমের প্রদীপে
পড়িলে ঢলি গো
মিলায়েছে মাটিতে মোগলের মসনদ,
আনার কলি ॥
তুমি আজো দুলিতেছ ফুলের হাসিতে

বিরহীর বাঁশিতে, আনার কলি
তব, জীবন্ত সমাধির বিগলিত পাষাণে
আজো প্রেম যমুনার ঢেউ
ওঠে উথলি ॥
আনার কলি আনার কলি ॥

৫

লুকায়ে রহিলে চিরদিন তুমি শিশমহলের শার্সিতে
তব রূপ শুধু রূপায়িত হল হেরেমের আরশিতে॥
অমৃত অশ্রুমেশা—
পিঞ্জরে চিরবন্দিনী চিরযোগিনী—জেবুন্নিসা,
তোমার দিওয়ানে, ওগো শাহজাদি কবি
আঁকিলে যে তব বিরহ-বিষাদ ছবি,
লাজ পায় তাজমহলও তাহার সকরুণ সঙ্গীতে॥
কোন সে তরুণ কবি
তোমারে তোমার কবিতার চেয়ে সুন্দর দেখেছিল
গোলাপ ফুলের পাপড়িতে তব ছবি
প্রেম চন্দনে এঁকেছিল
প্রিয়ার আদেশে আগুনের দাহ সহি
পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি
সেই মৌন প্রেমের মহিমা আজিও জাগে
ঝরা গোলাপের সুরভিতে॥

৬

রাজার দুলালি জুলেখা আজিও কাঁদে
কাঁদে ইউসুফ তরে।
অশ্রু তাহার দূর নভ হতে
রাতের শিশিরে ঝরে॥
আসে বসন্ত, ফোটে কুসুম
কিংশুকের আজিও ভাঙে না তো ঘুম,
যার এত রূপ সে কীগো পাষাণ
প্রিয়ারে না মনে পড়ে॥
যুগ-যুগান্ত কাঁদে জুলেখা
বিরহ-সিন্ধু কূলে
চোখে লয়ে জল আসে ইউসুফ
বুঝি আজ পথ ভুলে।
মাধবী নিশীথ ডাকে বুলবুল
ফাল্গুন সমীরণ হয়েছে আকুল,
মিলন পরশে দু-জনার মন
ক্ষণে ক্ষণে শিহরে॥

দেবীস্তুতি

প্রস্তাবনা

প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি
গৌরি শিবে সিদ্ধিবিধায়িনী
মহামায়া অম্বিকা আদ্যাশক্তি
ধর্ম–অর্থ–কাম–মোক্ষ–প্রদায়িনী॥

শুম্ভ–নিশুম্ভ–বিমর্দিনি চণ্ডি
নমো নমঃ দশ–প্রহরণধারিণী॥
দেবি সৃষ্টি–স্থিতি–প্রলয়–বিধাত্রি
জয় মহিষাসুর সংহারিণী জয় দুর্গে॥

যুগে যুগে দনুজ–দলনি মহাশক্তি
যোগ–নিদ্রা মধুকৈটভ–নাশিনী
বেদ–উদ্ধারিণি মণি–দ্বীপ–বাসিনী
শ্রীরাম অবতারে বরাভয়–দায়িনী জয় দুর্গে॥

তন্ত্রে শ্রীমহাকাল বলিতেছেন : 'মা ব্রহ্মময়ী! তুমি চিন্তার অতীত হইয়াও সাকার শক্তিস্বরূপা। তুমি প্রতি জীবে একমাত্র সত্ত্বমূর্তিতে অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমি সত্ত্বাদি গুণের অতীতা—নির্গুণা ; রাগাদি দ্বন্দ্বরহিতা—কেবলমাত্র অনুভবের সামগ্রী। মা! তুমি পরব্রহ্মরূপিণী!

যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, জল ও তাহার শীতলতা যেমন অভিন্ন, পরমাত্মা ও আদ্যাশক্তিও তেমনি অভিন্ন।

আদিঅন্তহীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলিয়া তিনি কালী। বিশ্বের সকল কিছুকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। তিনিই শিব, তিনিই রাম, তিনিই হ্লাদিনী শক্তি রাধা। বিশ্বের সকল জড়–জীব বিভিন্ন নামে তাঁহাকেই উপাসনা করে। সকল নামের নদী–-ঐ পরমাত্মারূপিণি মহাসাগরে গিয়া মিলিয়াছে—এক কথায় তিনি সর্বনাম। যিনি নির্গুণা, নিরাকারা, চৈতন্যরূপিণি, কেবল অনুভব–সিদ্ধা, তাঁহাকে কোন নামে ডাকিব? তিনিই আদি পিতা, তিনিই আদি মাতা, অথচ তিনি পুরুষও নন, নারীও নন।

জীব যখন তাঁহাকে পিতা, স্বামী, সখা পুত্র-রূপে উপাসনা করে, তখন তিনি পুরুষরূপে দেখা দেন। যখন মাতা বলিয়া, কন্যা বলিয়া স্তুতি করে, তখন তিনি নারীরূপে আবির্ভূতা হন। যে যোগী অরূপের পিয়াসী, তাহাকে তিনি দেখা দেন জ্যোতিঃরূপে, চিন্ময়রূপে। রূপ অরূপে লয় হইতেছে, আবার অরূপ রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে—ইহাই তাহার সৃষ্টি-প্রলয়-লীলা। বরফ গলিয়া জল হইতেছে, জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে—বাষ্প মেঘ হইয়া বৃষ্টিধারায় গলিয়া পড়িতেছে, আবার সেই বৃষ্টিধারার জলরাশি বরফে পরিণত হইতেছে। যোগদৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ণজ্ঞানীর কাছে যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। তাঁহার কাছে বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্করাচার্যের পরিপূর্ণবাদ দুই-ই সত্য। এই আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্মা, যখন পালন করেন তখন তিনি বিষ্ণু, যখন সংহার করেন তখন তিনি রুদ্র। আবার যখন তিনি নিত্য রাস-লীলা করেন, তখন তিনি কৃষ্ণ। যখন তিনি কিছুই করেন না, তখন তিনি নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম।

অগ্নি অন্য জিনিসকে প্রকাশ করে, আলো ও উত্তাপ দান করে, আবার সেই অগ্নি দগ্ধ করে, অথচ অগ্নির কাহারও উপর প্রেম বা বিদ্বেষবুদ্ধি আছে এমন কথা কেহ বলিবেন না। আগুন যেমন নির্বিকার, তিনিও তেমনি অগ্নির মতোই বিকারহীন। যে যে-প্রয়োজনে তাঁহাকে ডাকে তিনি তাহার সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করেন। আগুনকে প্রদীপ করিয়া জ্বালাও, সে আলো দান করিবে ; তাহাকে ভাত তরকারি রান্না বা অন্য যে কোনো কাজে নিযুক্ত কর, সে তাহাই করিয়া দিবে ; আবার তাহাকে দিয়া ঘর জ্বালাও, সে নির্বিকারভাবে দগ্ধ করিবে। ভালো কাজে লাগাইলে অগ্নি মঙ্গলরূপে তোমার মঙ্গল সাধন করিবে, ঘর জ্বালাইলে তাহার শাস্তিও তোমায় ভোগ করিতে হইবে, লোকে ধরিয়া উত্তম-মধ্যম দিবে, উপরন্তু কারাগারে দিয়া ঘানি টানাইবে। আমরা সেই আনন্দরূপিণী মহাশক্তিকে এইরূপে আত্মারামের ঘর জ্বালাইবার কাজে লাগাইয়া সংসার কারার ঘানি টানিয়া মরিতেছি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া। বিষয়-বুদ্ধি-দোষ-দুষ্ট সাংসারিক লাভালাভের জন্য যাহারা তাঁহার তপস্যা করে, তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ-শোকাদিও ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানিগণ দেখিলেন, অর্থ যশঃ সম্মান প্রতিষ্ঠা পুত্রাদি লাভে নিত্য আনন্দ বা শান্তি লাভ করা যায় না, তাই তাঁহারা কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই এক হইয়া যাওয়াই মোক্ষ বা মুক্তি।

তিনি সকল জাতির উপাস্য প্রভু। বিশ্বের সকল জড়-জীব, প্রাণী, এই পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল জাতি, তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহারই লীলার প্রকাশ। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি তাঁহারই বৈচিত্র্যের প্রকাশ মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে সকল মানুষ একদিনেই এক-ধর্মাবলম্বী হইয়া যাইত। তিনি নানা রঙের ফুলে এই ধরণীর বাগান সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর এই বহু ধর্ম, জাতি সেই রঙের খেলা মাত্র। পৃথিবীতে যখন তুফান, বন্যা, ঝড়, মহামারি, ভূমিকম্প আসে তখন সকল জাতি, সকল মানুষ একসাথেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; আবার তাঁহার বিগলিত করুণারূপে যখন শীতল বৃষ্টিধারা ঝরে তাহা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ঘরে ঘরে, সকল জাতির শিরে শিরে, সকল

মানুষের মাঠে-ঘাটে বর্ষিত হয়। তাঁহার কাছে ভেদ-জ্ঞান নাই। সকলেই যে তাঁহারই সৃষ্ট-জীব ! ঐকান্তিক আগ্রহে, একনিষ্ঠ তপস্যা দিয়া যে তাঁহাকে যেই নামে ডাকে তিনি তাহার কাছে সেই নামে সাড়া দেন। তিনিই পরমাত্মা, পরব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি।

আদ্যাশক্তি

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা।
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক-পালিকা॥
মহাকালী মহাসরস্বতী
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা॥
কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মা মহামায়া, তব মায়ায়
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয় সমুদ্রে জলবিম্ব-প্রায়।
অচিন্ত্য পরমাত্মারূপিণী
সুর-নর-চরাচর-প্রসবিনী ;
নমস্তে শিবে অশুভনাশিনী, তারা মঙ্গল (চণ্ডিকা) সাধিকা॥

বিভিন্ন অবতারে জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহারই অংশ-শক্তি আবির্ভূতা হন। তাঁহার সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেন দেবদেবী, যোগী, মুনিঋষি প্রভৃতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নর-নারী। অন্যে দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করে না। কারণ তাহারা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায় না, তাহাদের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়। তাহাদের ঐ দেখা ভুল দেখা। তিনি নিত্যা, তিনি উৎপন্না হন না ; যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উৎপীড়ন চলে, তাহার সৃষ্ট জীব দানব-শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হয়, নির্জিত হয়, তখনই তাঁহার শক্তি অবতাররূপে প্রকাশিত হয়। এই পৃথিবীতে তখনই সেই পীড়নকারী অসুর-শক্তির সংহার করিয়া তিনি জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা সৎ, যাহা মঙ্গলময়, যাহা জীবের শুভদ, তাহারই সন্ধান দিয়া সেই অবতাররূপিণী শক্তি ধ্রুবজ্যোতি অনন্ত শক্তিতে বিলীন হন। নারীরূপে পরমাত্মার যে অবতাররূপে প্রকাশ, আমরা আজ তাঁহারই বন্দনা-গান গাহিব। তাঁহার প্রথম অবতার মহাকালী-রূপে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন পৃথিবী কারণ-সলিলে নিমগ্ন ছিল সেই সময় মধু কৈটভ নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মধ্যানরত ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, কিন্তু যোগ-নিদ্রাভিভূত বিষ্ণুকে জাগাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা যোগ-নিদ্রারূপিণী শক্তির স্তব করেন। যিনি যোগনিদ্রা হইয়া বিষ্ণুকেও অচেতন করিয়া রাখেন, সেই সকল শক্তির শক্তি, ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া গেলে, বিষ্ণুও জাগ্রত হইয়া মধু-কৈটভকে নিহত করেন। ইহাই হইল মধু-কৈটভ-বধ উপাখ্যানের সারাংশ।

আমার স্বল্প-পরিসর জ্ঞানে, এই মধু কৈটভ-বধের যে অর্থ প্রতিভাত হইয়াছে তাহা বলিতেছি :

এই মধু-কৈটভ আর কেহ নয়, অধৈর্য ও অবিশ্বাস নামক দুই দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু-কৈটভের উৎপত্তি। বিষ্ণু অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার কর্ণমল অর্থে আমি মনে করি, দিবারাত্রি আমরা পণ্ডিতগণের নিকট যে বিচার-তর্ক ইত্যাদি শুনি—তাহাই। এই ব্রহ্মজ্ঞান-পণ্ডকারী পণ্ডিতদের কূটতর্ক বিচার প্রভৃতিই আমাদের বিশ্বাস স্থিত হইতে দেয় না। এই কর্ণমল হইতেই অধৈর্য ও অবিশ্বাসরূপী মধু-কৈটভের জন্ম। দেবী-ভগবতে আছে, এই মধু-কৈটভ আবার বাগ্‌বীজসিদ্ধ। কাজেই বাগ্‌বিতণ্ডাই যে মধু-কৈটভের পিতামাতা, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অধৈর্য ও অবিশ্বাস, এই দুই ভাই, ব্রহ্মা অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থির থাকিতে দেয় না। সর্বদাই তাহাকে তাড়না করে। তখনই রজোগুণসম্পন্ন অর্থাৎ তপস্যার অহংজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শরণাপন্ন হয় ; কিন্তু সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেও এই দুই দৈত্যের অর্থাৎ অধৈর্য ও অবিশ্বাসের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। তখন পরমাত্মারূপিণী আদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হইলে তাঁহার করুণায় বিষ্ণু বা সত্ত্বগুণ অধৈর্য ও অবিশ্বাসীরূপিণী দুই দৈত্যকে নিহত করেন। তখনই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিতি হয়। এই জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের আগে 'ব্রহ্মারন্ধ্রে মধু-কৈটভবধ মাহাত্ম্যায় নমঃ' বলিয়া মহাত্ম্যন্যাস করিতে হয়। যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী ব্রহ্মরন্ধ্রে এই দুই দৈত্যকে নিহত করেন। দেবীর প্রথম অবতার মহাকালীরূপে। এইরূপে তিনি মধুকৈটভকে সম্মোহিত করেন এবং বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করেন।

মহাকালী

জয় মহাকালী, জয় মধুকৈটভ বিনাশিনী
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া
ধর্ম প্রদায়িনী॥
ভয়াতুর ব্রহ্মা অসুর-আশঙ্কায়,
রাজসিক সাত্ত্বিক দুই মহাদেবতায়
রক্ষা কর মা তুমি মহাভয়হারিণী॥
নীলজ্যোতির্ময়ী অসীম তিমির-কুন্তলা মা গো,
আসন্ন প্রলয়-পয়োধির ঊর্ধ্বে দেখা দাও জাগো !
দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো,
দশ হাতে দশবিধ আয়ুধ আনো,
দশ-মুখকমলে অভয়বাণী
শোনাও আর্তজনে বিপদ-বারিণী॥

পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মীরূপে। এইরূপে তিনি মহিষাসুরবধ করেন। আমাদের দেশে শ্রীদুর্গারূপে ইনি পূজিতা হন। প্রথম অবতার মহাকালীরূপা পরমাত্মার সংহার-শক্তি, দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মী রাষ্ট্রীয় শক্তি। এই মহাভারত যখনই তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়াছে তখনই মহালক্ষ্মীরূপিণী শ্রীদুর্গার শরণাপন্ন হইয়া সে তাহার বিলুপ্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপেই পূজান্তে বর লাভ করিয়া রাবণকে নিহিত করিয়া ভারতের ধর্ম-অর্থ-শ্রী-সম্পদরূপিণী সীতার উদ্ধার করেন। দেবশক্তি এই ক্রোধরূপী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হন তখন তাঁহাদের ও অন্যান্য দেববৃন্দের তেজ হইতে সমুৎপন্না হন এই মহাশক্তি। অতএব ইনি সমস্ত দেবতার একীভূতা শক্তিস্বরূপা। অর্থাৎ সমস্ত দেবশক্তি একত্রীকৃত হইলে অবলুপ্ত স্বর্গ বা রাষ্ট্রীয় শক্তি উদ্ধার হয়। ইহাই এই অবতারের ইঙ্গিত। ইনি জীবকে, জগৎকে শ্রী-সম্পদরূপ যশঃ, খ্যাতি, জ্ঞান, মোক্ষ, মুক্তি, শান্তি দান করেন। মহিষাসুর ক্রোধের প্রতীক। ক্রোধই অশান্তি, অতৃপ্তি, বিরোধ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতি অকল্যাণের হেতু। অক্রোধ অর্থাৎ প্রেম ব্যতীত সাম্য আসিতে পারে না। এই ক্রোধরূপী মহিষাসুর নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অতৃপ্তি, অশান্তি, বিরোধ, হিংসা, কলহ প্রভৃতি জগতের সমস্ত অকল্যাণ বিদূরিত হয়। উহারাই মহিষাসুরের সেনাবৃন্দ। ক্রোধরূপী পশুকে হত্যা করেন বলিয়া দেবী পশুরাজ-বাহিনী। অর্থাৎ পশুশক্তি দেবশক্তির বাহন মাত্র। পশুকে হত্যা করিতে পশু হইবার প্রয়োজন নাই। পশুশক্তির সাহায্য অতীব প্রয়োজনীয়, তবু সে পশুশক্তি থাকিবে দেবশক্তির পায়ের তলায়।

ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতির জীবনে, নিখিল-মনুষ্যসমাজে যখন অধৈর্য ও অবিশ্বাস বড় হইয়া ওঠে, তখন পরমাত্মার মহাকালী শক্তির শরণ লইলে, অধৈর্য অবিশ্বাস নিহত হয়, তাহারা ব্রাহ্মীস্থিতির মতো আনন্দে, শান্তিতে এই পৃথিবীতেই অমৃতভোগ করে। যোগী-মুনি-ঋষিরা সেই অমৃতের অধিকারী।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মনুষ্য সমাজে যখন অশান্তি, নিরাশা, সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রোধরূপী মহিষাসুরের সেনাদল উৎপাত করে তখন পরমাত্মার শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মীর শক্তির শরণ লইলে এইসব উৎপাত দূর হয় ; তখন শ্রী-সম্পদসম্পন্ন হইয়া আবার স্বর্গ-সুখ ভোগ করে।

মহালক্ষ্মী

হ্রীঙ্কাররূপিণী মহালক্ষ্মী
নমো অনন্ত কল্যাণদাত্রী
পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী চরাচর-বিশ্ববিধাত্রী ॥

সর্ব দেব-দেবী তেজোময়ী
অশিব-অকল্যাণ-অসুর জয়ী,
সহস্রভুজা ভীতজনতারিণী জননী জগৎ-ধাত্রী॥
দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও
দলন কর মা লোভ-দানবে।
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মান দাও,
দেবতা কর ভীরু মানবে।
শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক,
দুঃখ দারিদ্র্য অপগত হোক,
জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক
পোহাক এ দুর্যোগ রাত্রি॥

আদ্যাশক্তির তৃতীয় অবতার মহাসরস্বতীরূপী। এইরূপে তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দুই মহাদৈত্যকে হত্যা করিয়া ত্রিলোকে শান্তি স্থাপন করেন।

জীবের কামনার অবসান না হইলে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ বা উপলব্ধি হয় না। শুম্ভ-নিশুম্ভ তাহারই নিদর্শন। তাহারা ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াও নিষ্কাম হইতে পারিল না। তাহাদের কামনা ভগবদশক্তিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের তপস্যা, তাহাদের শক্তি ত্রিলোকের দুঃখের কারণ, পীড়নের হেতু হইয়া উঠিল। আবার দেবতারা পরমাত্মারূপিণী মহাশক্তির তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের আর্ত-প্রার্থনায় মূর্তি ধরিয়া আসিলেন মহাশক্তি—মহাসরস্বতীরূপে ; অর্থাৎ পরাজ্ঞানের শুদ্ধা কৌষিকীমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। পরাজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত কামনার অবসান হয় না। তাই শুদ্ধজ্ঞানরূপিণী মহাসরস্বতী জগতের কল্যাণের জন্য, জীবের আর্তি নিবারণের জন্য কাম ও লোভের প্রতীক শুম্ভ নিশুম্ভকে অর্থাৎ বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তিকে নিহত করিলেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাকালীর শরণ লইলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মস্থিতি হয় ; সত্বগুণ তাহার ধর্ম। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীর শরণ লইলে দেবশক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় হয়। শ্রীশ্রীমহাসরস্বতীর শরণ লইলে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। এই তিন শক্তির ত্রিবেণীতীর্থে জন্মগ্রহণ করেন সত্যকার ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মর্ষি।

মহাকালী দেন তেজ বা ব্রাহ্মণের তপস্যা, মহালক্ষ্মী দেন প্রেম, মহাসরস্বতী দেন জ্ঞান। এই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপিণী ত্রিধারা শক্তিই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

মহাসরস্বতী

মায়ের আমার রূপ দেখে যা
মা যে আমার কেবল জ্যোতি।

(মার) কৌশিকীরূপ দেখ রে চেয়ে
মা, শুদ্ধা মহাসরস্বতী॥
পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।
কোটি শ্বেত-শতদলে
বিরাজে মা বেদবতী॥
সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল শুদ্ধ হয়ে উঠল নেয়ে
সাত্ত্বিকী মোর জগন্মাতার জ্যোতিঃসুধার প্রসাদ পেয়ে।
নৃত্যময়ী শব্দময়ী কালী
এলো শান্তি-কল্যাণ-দীপ জ্বালি।
দেখ রে পরমাত্মায় সব
জননী সে জ্যোতিষ্মতী॥

[ইহার পরে দেবীর অংশরূপে আবির্ভূতা হন সতী ও উমা।]

সতী

ঘরছাড়াকে বাঁধতে এলি
কে মা অশ্রুমতী?
লীলাময়ী মহামায়া
দাক্ষায়ণী সতী॥
কে মা গো তুই কার দুলালী
যোগীন্দ্রেরও যোগ ভুলালি
তোর ছোঁওয়াতে স্নিগ্ধ হলো
শিবের তপের জ্যোতি॥
সৃষ্টিরে তোর বাঁচাতে মা করিস কতই রঙ্গ;
তোর মায়াতে শঙ্করেরও ধ্যান হল ভঙ্গ।
শুদ্ধ শিবে মুগ্ধ করে
চঞ্চলা তুই গেলি সরে।
হরের যদি জ্ঞান হরিস মা
মোদের কোথায় গতি?
আমরা যে তোর মায়ায় অন্ধ
জীব দুর্বল মতি।
ওমা, কোথায় মোদের গতি?

উমা

সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে।
শ্মশানবাসী হরের গলায় বরণ-মালা দুলাতে॥
সতীর শোকে ভৈরব-বেশে
প্রলয়-ধ্যানে মগ্ন মহেশ,
(তাই) নেমে এলি হিমালয়ে অটল শিবে টলাতে॥
তোর মায়াকে করবে মা জয়
নেই হেন কেউ ত্রিলোকে,
অনন্ত দেবদেবীরে তুই
ভুলাস মায়ায় পলকে।
কৈলাস তুই শিবালয়ে
রইলি এবার নিত্যা হয়ে,
প্রেমের কাছে হার মেনে তুই নেমে এলি ধূলাতে॥

পুরাকালের সেই ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রশক্তি কলিতে আবার ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে—তাই দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছেন

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভ নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
(শ্রী শ্রীচণ্ডী—১১।৪১॥)

অর্থাৎ দেবী বলিলেন—

বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে অষ্টাবিংশতিতম যুগে (কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে।

তাহার পরেই বলিতেছেন—

... ...
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥
(শ্রীশ্রী চণ্ডী-১১,৪১॥)

অর্থাৎ—আমি বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্বক এই অসুরদ্বয়কে নিহত করিব।

সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অষ্টাবিংশ যুগের শেষ-কলিযুগ চলিতেছে। এই যুগেই শুম্ভ-নিশুম্ভের উৎপত্তি হইবে এবং দেবী তাহাদিগকে হত্যা করিবেন। ইহাই দেবীর উক্তি। আর্তপীড়িত জনগণ আজ ব্যাকুল চিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে আর প্রার্থনা করিতেছে :

'জাগো চণ্ডিকা মহাকালী'

চণ্ডিকা মহাকালী

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী॥
প্রাণহীন শবে শিব-শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ-নিদ্রা ভাঙাও
অগ্নিশিখায় দশদিক্ রাঙাও
বরাভয়দায়িনী নৃমুণ্ডমালী॥
শ্রীচণ্ডীতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী।
এসেছে কলি, কালিকা এলি কই !
শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মেছে পুন ঐ,
অভয়বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মা গো খর-করতালি॥

দেববৃন্দের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের হত্যার পর বরদানকালে দেবী বলিলেন—

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥ (শ্রী শ্রীচণ্ডী ১১/৪৩)
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্নহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী কুসুমোপমাঃ॥ (ঐ, ১১,/৪৪)
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকেচ মানবাঃ।
স্তুবতো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্॥ (ঐ, ১/৪৫)

অর্থাৎ—পুনরায় আমি অতি ভীষণ মূর্তিতে এই পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইয়া বিপ্রচিত্তি বংশসম্ভূত দানবগণকে সংহার করিব। তখন ঐ ভীষণ বৈপ্রচিত্তদানবগণকে ভক্ষণ করায় আমার দন্তসমূহ দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তজ্জন্য স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্যে মানবগণ সতত আমার স্তব করিবে ও আমাকে রক্ত-দন্তিকা বলিয়া কীর্তন করিবে।

কেহ কেহ বলেন, বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রসভার এক নর্তকী। এই উক্তিতে মনে হয়, কোনো নর্তকী-গর্ভজাত মানব পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া উৎপীড়ন করিবে এবং দেবী রক্তদন্তিকা রূপ ধরিয়া তাহাকেও হত্যা করিবেন।

রক্তদন্তিকা

জয়, রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা।
নমো রক্তযুধা রক্তনেত্রা ভীষণা উগ্রচণ্ডিকা॥
রক্ত-কেশা, রক্ত-ভূষণা,
রক্ত-রসনা, রক্ত-দশনা
জয় দাড়িম্বকুসুমোপমা দনুজ-দলনী অম্বিকা॥
জয় সর্বভয় অপহারিণী জয়,
জয় অতি রৌদ্রা, নিস্তারিণী জয়।
জয় মা পৃথিবীপালিনী।
ভক্তের তুমি জননীরূপিণী
করুণাময়ী অভয়দায়িনী (মাগো)
জয় অসুর-মুণ্ডমালিনী।
অখিল ব্যাপ্ত যোগেশ্বরী
আমি দেখি রূপ একি মরি মরি
চেলী-পরা লাল টুকটুকে মেয়ে আনন্দিনী বাসন্তিকা॥

তাহার পরে দেবী বলিতেছেন—আবার শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিবশত পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণ আমাকে স্তব করিবেন। তখন আমি সেই জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনিজা রূপে প্রাদুর্ভূতা হইব। তৎকালে শতনেত্রে আমি মুনিগণকে দর্শন করিব ; তজ্জন্য দেব ও মানবগণ আমাকে 'শতাক্ষী' বলিয়া কীর্তন করিবে। অনন্তর আমি স্বদেহজাত প্রাণরক্ষক শাক দ্বারা যত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত লোকগণকে পালন করিব। এই জন্য তৎকালে আমি 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হইব এবং এই অবতারে দুর্গম নামক এক মহাসুরকে বিনাশ করিব।

বৈবস্বত মন্বন্তরের চত্বারিশৎ যুগ শতাক্ষী ও শাকম্ভরীর অবতার কাল। সে কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। ইহাই লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শতাক্ষী

নীলোৎপল-নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী।
শত চোখে শতনীল পদ্ম ফুটিয়াছে মরি মরি॥
দয়াময়ী মার কর-পল্লবে
ফুলমূল ফুল পল্লব শোভে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জরানাশিনী
মহাদেবী বিষহরি॥

দারুণ দৈন্য দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কালে
(এই) জননী আমার শতাক্ষীরূপে শস্যে বৃষ্টি ঢালে।
নাশি দুর্গম দৈত্যে জননী
হলেন দুর্গা দুষ্টদমনী,
ইনিই পার্বতী বিশোকা চণ্ডী কালী পরমেশ্বরী॥

দেবী পুনরায় বলিতেছেন :

যখন অরুণ নামক অসুর ত্রিলোকের অতিশয় পীড়া উৎপাদন করিবে, তখন আমি ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য অসংখ্য ষটপদ্‌বিশিষ্ট ভ্রমর মূর্তি ধারণ করিয়া ঐ মহাসুর নিহত করিব—তৎকালে সকলেই আমাকে 'ভ্রামরী' বলিয়া স্তব করিবে।

ভ্রামরী

মা গো তুই, কার নন্দিনী
ভ্রমর লয়ে মা করিস খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্ত বর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা॥
একি অপরূপ চিত্রকান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে
আকাশে ছড়াস সারাটি বেলা॥
ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই
তেজোমণ্ডল-বিমণ্ডিতা,
কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী
ভ্রামরীরূপা আনন্দিতা।
কোন্ সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছাড়িস আকাশে বাতাসে,
সব উৎপাতবিনাশিনী শিরে
দে মা আমারে চরণ-ভেলা॥

এইরূপে পরব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আশার বাণী শুনাইয়া বলিতেছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী—১১/৫৫

অর্থাৎ, যখন যখন দানবকৃত উৎপাত সংঘটিত হইবে তৎকালেই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুগণকে নিহত করিব।

মাভৈঃ

॥ওম্ তৎ সৎ॥

হরপ্রিয়া

কোরাস গান

(শিবরঞ্জনী)

(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী।
শিব-জটা হতে সুরধুনী-স্রোতে
ঝরি' শতধারে ভাসাও অবনী॥
দিবা দ্বিপ্রহরে প্রথম বেলা
কাফি-সিন্ধুর তীরে কর খেলা,
দীপ্ত নিদাঘে সারঙ্গ রাগে
অগ্নি ছড়ায় তব জটার ফণী॥
কভু ধানশ্রীতে মায়া-রূপ ধর,
জ্ঞানী শিবের তেজ কোমল কর,
পিলু বারোঁয়ায় বিষাদ-ভোলানো
নূপুরের চটুল ছন্দ আনো॥
বাগীশ্বরী হয়ে মহিমা শান্তি লয়ে
আসো গভীর যবে হয় রজনী॥
বরষার মল্লারে মেঘে তুমি আসো,
অশনিতে চমকাও, বিদ্যুতে হাসো,
সপ্তসুরের রঙে সুরঞ্জিতা
ইন্দ্রধনু-বরণী॥

সৈন্ধবী। কথা কও হরপ্রিয়া শিব-সীমন্তনী
দিবা দ্বিপ্রহরের প্রথমার্ধ বেলা
তোমার তনুর জ্যোতি চুরি করি যেন
ঝলমল করে স্বর্ণ-রাগে। কথা রাখ,
তুমি না কহিলে কথা, না হাসিলে তুমি
রবির কনক-ছটা ম্লান হয়ে যায়!
হরপ্রিয়া। সৈন্ধবী! তুই ত জানিস্—
দেখি নাই কতদিন মনোহর হরে।

ধ্যানমগ্ন কোন লোকে কোন রূপ ধরি
কি লীলা যে করিছেন তিনি—
আমি মহামায়া হয়ে জানিতে না পারি।
বল সহচরী। কেন এলি ফিরি
দেবাদিদেব মোর শিব শম্ভুর
পেয়েছিস কোনো সন্ধান?

সৈন্ধবী। মহাদেবী! সেই কথা এসেছি জানাতে—
যে লীলা করেন তব শিব সুন্দর
শ্যাম-সুন্দর সাজে, রস-বৃন্দাবনে।
নওল কিশোর রূপ নব ঘন-শ্যাম—
মেঘ-অনুলিপ্ত যেন তুষার কৈলাস।
গলে ফনী-হার নাই দোলে বনমালা
জটাজুট হইয়াছে চাঁচর চিকুর,
শশীলেখা হইয়াছে বাঁকা শিখী-পাখা
বিষাণ হয়েছে বাঁশি, বাঘ-ছাল তাঁর
হইয়াছে পীত-ধরা, মুনি-মনোহর।
শনি সেই চপলের ঘর-ছাড়া সুর
গোপিনীরা ধেয়ে আসে পাগলিনী হয়ে।

গান

সৈন্ধবী-সাদ্রা

মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা-তটে আসিল ছুটে
কুল-মান-যৌবন দিল চরণে ডারি॥
পবন গতিহীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরি শুনি বিসরে গীত
ময়ূর-ময়ূরী শুক-সারি॥
সচকিত ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে;
পুবালী-হাওয়া কানন-পথে
নীপ-কেশর বরষে।
বেভুল আহিরিণী
চেয়ে থাকে উদাসিনী,

বাঁশরি শুনি বিসরি গেল
নিতে গাগরিতে বারি॥

হরপ্রিয়া। সাবন্তী!
তাপ-দগ্ধ শ্রান্ত তনু-লতা
নিদারুণ তৃষ্ণা লয়ে কোথা হতে এলি?
কঠোর তপস্বী মহাযোগী শিব শঙ্কর
কি কহিলেন তোরে?

সাবন্তী। বিস্ময়-বিমূঢ়া আমি; দেবী হরপ্রিয়া!
হিম-গিরি শিরে তোমারে দেখিয়া এনু
বালিকার বেশে, তপস্বিনী উমা-রূপে।
শঙ্কর সেথা উমাপতি-রূপে
করিছেন লীলা।
কৈলাসে পার্বতী তুমি শিব-সোহাগিনী।
হিমালয়ে উমা তুমি শিব-বিরহিণী
তপস্বিনী মহাভাবে নিমগ্না!
উমার তপস্যা-তেজে ধরা দগ্ধপ্রায়,
তৃষ্ণায় কাতর জড়জীব।

গান

সাবন্তী সারং—তেতালা

মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে
তৃষ্ণায় কাতর চাতকী ডাকে॥
সমাধি-মগ্না উমা তপতী
রৌদ্র যেন তাঁর তেজ : জ্যোতি
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্তা কপোতী
কপোত-পাখায় শুষ্ক-শাখে॥
শীর্ণা তটিনী বালুচর জড়ায়ে
তীর্থে চলে যেন শ্রান্ত পায়ে।
দগ্ধ ধরণী যুক্ত পাণি
চাহে আষাঢ়ের আশিস-বাণী।
যাপিয়া নির্জলা একাদশীর তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে॥

হরপ্রিয়া। কি লো নীলাম্বরী!
একদৃষ্টে মোর পানে চেয়ে

মৃদুমন্দ হাসি—কি হেরিস অমন করিয়া?
দেখেছিস তুই বুঝি পিনাক-পাণিরে?

নীলাম্বরী। হুঁ! দেখিয়াছি শিবে শিবানীর সাথে।

হরপ্রিয়া। শিবানীর সাথে? সে কোন শিবানী?

নীলাম্বরী। যে শিবানীর একরূপ হ্লাদিনী রাধিকা।
যে শিবানী গোলোকে রাধিকা,
শিবলোকে হরপ্রিয়া
বৈকুণ্ঠে কমলা
বৃন্দাবনে তিনিই শ্রীমতী হয়ে নীল শাড়ি পরি
নীল যমুনার তীরে করিছেন লীলা!

গান

নীলাম্বরী-ত্রিতাল

নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায়?
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়॥

কলসে কঙ্কণে রিনিঝিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা-বনকে।
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥

অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরি উলসিয়া ওঠে।
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এলো বুঝি পথ ভুলি।
তাহার অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে
কূল কূলে নদী-জল উথলায়॥

হরপ্রিয়া। সাহানা!
পাগলিনী-প্রায় কোথা হতে এলি?

সাহানা। হরপ্রিয়া!
কুমার কিশোর রূপ দেখেছ শিবের?
রেবা-নদী-তীরে আমি দেখিয়াছি।

সে কি স্বপ্ন? সে কি ভুল?
হোক ভুল। সেই ভুল ফুল হয়ে ফুটিয়াছে মনে।
সুগন্ধে ভরপুর সারা অন্তর।

হরপ্রিয়া। কোথায়, কি হেরিলি সাহানা?

সাহানা। হেরিনু স্বপনে—না, না, স্বপ্ন নয়
দিব্য আঁখি পেয়ে আমি হেরিয়াছি—
নিবিড় অরণ্যে এক সুরম্য প্রাসাদে
আমি যেন গাহিতেছি গান।
সহসা দুয়ারে,
আসিল তরুণ শিব ভিখারির বেশে।
কি যেন চাহিল ভিক্ষা।
তখনো সুরের ঘোর কাটেনি আমার।
কি বলিয়া দিয়াছিনু তাহারে বিদায়—
শুনিবে সে গান?

গান

সাহানা-ত্রিতাল

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে।
ভাঙবে সভা বসব একা রেবা নদীর তীরে।
গীত শেষে গগন-তলে
শ্রান্ত তনু পড়বে ঢলে
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারঙ্গিরে॥

মোর কণ্ঠের জয়ের মালা তোমার গলায় নিও।
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিও প্রিয়, হে মোর প্রিয়!
ঘুমাই যদি কাছে থেকো
হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজব তোমায় আকুল অশ্রুনীরে
তখন এসো ফিরে॥

হরপ্রিয়া। মোর অনুবর্তিনীরা একে একে সবে
আসিল ফিরিয়া মোর কাছে।

কোথায় মেঘলা–মতী? সে ত ফিরিল না?
জান হে সন্ধান তাহার?
তার–ই শুধু হল নাকি শিব দর্শন?
কে তুমি তরুণ?

মল্লার। চরণে প্রণাম লহ দেবী হরপ্রিয়া!
আমি মেঘ–মল্লার তব কিঙ্কর।
মেঘলামতীরে লয়ে আমি গিয়াছিনু
যোগীন্দ্র শিবের সন্ধানে।
সরযূর তীরে।
হেরিয়া শ্রীরামচন্দ্রে ছদ্মবেশি শিবে,
মেঘবর্ণা তব সহচরী আর ফিরিল না।

রামদাসী মল্লার–রূপে
নব জন্ম, নব দেব লয়ে
নব দূর্বাদলশ্যাম–রামের অর্চনা
করিছে সে অযোধ্যায়, ভারতে, ধরায়।
আজো মোর মনে পড়ে—
তাঁর সেই সকরুণ গান।

গান

রামদাসী মল্লার—ত্রিতাল

ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা।
ভবনে এলো সে মোর কে পথহারা॥
বিরহ–রজনী একলা যাপি
সঘনে বহে ঝড় সভয়ে কাঁপি।
উথলি ওঠে ঢেউ কুটিরে নাহি কেউ
গগনে নাহি মোর চন্দ্রতারা॥

নিভেছে গৃহদীপ নয়নে বারি,
আঁধারে তব মুখ নাহি নেহারি।
তোমার আকুল কুন্তল–বাসে
চেনা দিনের স্মৃতি স্মরণে আসে।
আজি কি এলে মোর প্রলয় সুন্দর
ঝলকে বিদ্যুতে আঁখি ইশারা॥

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৩১।

দশমহাবিদ্যা

১

নন্দলোক হতে আমি এনেছি রে মহামায়ায়।
বন্ধ যেথায় বন্দি যত কংস রাজার অন্ধ কারায়।।
বন্দি জাগো! ভাঙো আগল
ফেল রে ছিঁড়ে পায়ের শিকল
বুকের পাষাণ ছুঁড়ে ফেলে
মুক্তলোকে বেরিয়ে আয়।।
আমার বুকের গোপালকে রে
রেখে এলাম নন্দালয়ে,
সেইখানে সে বংশী বাজায়
আনন্দে গোপ-দুলাল হয়ে।
মার আদেশে বাজাবে সে
অভয় শঙ্খ দেশে দেশে
তোরা, নারায়ণী-সেনা হবি
এবার নারায়ণীর কৃপায়।।

২

ভারত শ্মশান হল মা, তুই শ্মশানবাসিনী বলে।
জীবন্ত শব নিত্য মোরা চিতাগ্নিতে মরি জ্বলে।।
আজ হিমালয় হিমে ভরা
দারিদ্র্য-শোক—ব্যাধি-জরা,
নাই যৌবন, যেদিন হতে শক্তিময়ী গেছিস চলে।।
(তুই) ছিন্নমস্তা হয়েছিস তাই হানাহানি হয় ভারতে,
নিত্য-আনন্দিনী, কেন টানিস নিরানন্দ পথে?
শিব-সীমন্তিনী বেশে
খেল মা আবার হেসে হেসে
ভারত মহাভারত হবে, আয় মা ফিরে মায়ের কোলে।।

৩

(মা) ব্রহ্মময়ী জননী মোর
(মোরে) অব্রাহ্মণ কে বলে?
শ্যামা নামের জঠরে মোর
নব জন্ম ভূতলে॥
মোরে অব্রাহ্মণ কে বলে॥
(স্ত্রী) চণ্ডিকারে মা বলে রে
আমি হলাম দ্বিজ।
(আমি দ্বিতীয়বার জনম নিলাম
(স্ত্রী) চণ্ডিকারে মা বলে
দ্বিজ,
আমি দ্বিতীয়বার জন্ম নিলাম
(মা) আদর করে নাম দিয়েছেন
পুত্র মনসিজ।
রুদ্রাক্ষ মালার যজ্ঞোপবীত
মা পরালেন মোর গলে॥
মোরে অব্রাহ্মণে কে বলে॥

(মোরে) কে কবে অস্পৃশ্য বলে
দিয়েছিল গালি।
(আমি) কেঁদেছিলাম 'মা' বলে
(তাই) মা হলেন মোর কালী।
(মা) হলেন ভদ্রকালী
যারা আমায় ঘৃণা
করেছিল আগে,
(আজ) মায়ের কোলে তাহাদেরই
ডাকি অনুরাগে।
(ওরে আয় তোরা আয় রে
জগৎ-জননীর কোলে তোরা সবাই আয় রে॥)

(সেই) চণ্ডাল আজ কমল হয়ে
ফুটল মা-র চরণ-তলে।
(মা-র) রাঙা চরণ-কমল ছুঁয়ে
ফুটল মা-র চরণ-তলে॥

৪

তুমিই দিলে দুঃখ অভাব তুমিই কর ত্রাণ।
দীনের বন্ধু, মঙ্গলময় শরণাগত প্রাণ॥
যখন পরম নির্ভরতায়
শরণ যাচি তোমারি পায়
(তুমি) আপন হাতে বিনাশ কর সকল অকল্যাণ॥
দীনের বন্ধু মঙ্গলময় শরণাগত প্রাণ।
(আমি) অহঙ্কারে রাখতে যাহা
চাই হে আমার বলে
হরণ করে লও তুমি তা
ভাসিয়ে চোখের জলে।
তাই তো আমার সংসার–ভার
প্রভু তোমায় দিলাম এবার,
আমার বলে রইল শুধু তোমার নাম গান॥

৫

(ওরা) আমার কেহ নয়।
আজ এসেছে রইবে না কাল, আমার কেহ নয়।
মা গো ওরা তোরে শুধু আড়াল করে রয়॥
(ওরা) মোর ইচ্ছায় আসেনি কো কেহ
(ওরা) মোর ইচ্ছায় যায় না ছেড়ে গেহ।
এ সংসারের পান্থশালায় ক্ষণিক পরিচয়
মা, ওদের সাথে ক্ষণিক পরিচয়॥
যারা কেবল আছে মা গো
মা–ভোলাবার তরে,
নে তাদের মায়া হরে।
(তোর) পূজারই ভোগ খায় কেড়ে মা
পাঁচ ভূতে আর চোরে
(ওরা) সবাই যাবে রইবে নাকো কেউ,
মিথ্যা ওরা ক্ষণিক মায়ার ঢেউ,
ওদের মায়ায় তোকে ভোলার
ভুল যেন না হয়॥

৬

শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে
কাল-নদীতে দুলি।
(ও মা) ঘাটে ঘাটে ঘটে ঘটে
সুরের লহর তুলি।
কাল-তরঙ্গে ভাসিয়ে অঙ্গ
(মা) দেখে বেড়াই কত রঙ্গ ;
কায়ায় কায়ায় রঙ-বেরঙের
শত মায়ার ঠুলি॥
জন্মান্তর ঘাটে ঘাটে
ভাসি, উঠি, ডুবি ;
কেবলই মা ডাকে আমায়—
(ওরে) "আয় আমারে ছুঁবি।"
(মোরে) কাল-স্রোতে ভাসাবার ছলে
(মা) লীলা দেখান নাট-মহলে,
খেলার শেষে আপনি এসে
বক্ষে লবে তুলি॥

৭

কে তোরে কি বলেছে মা—ঘুরে বেড়াস কালি মেখে।
(ও মা) বরাভয়া, ভয়ঙ্করীর সাজ পেলি তুই কোথা থেকে॥
(তোর) এলোকেশে প্রলয়-দোলে
(আমি) চিনতে নারি গৌরী বলে, (মা)
(ওমা) চাঁদ লুকালো মেঘের কোলে
তোর মুখে না হাসি দেখে॥
(ও মা) আমার দেব-লোকে কেন
খেলিস এমন নিঠুর খেলা ?
আনন্দেরই হাটে মাগো
বসালি পাঁচ ভূতের মেলা।
শঙ্কর কি গঙ্গা নিয়ে
কাঁদায় তোরে দুঃখ দিয়ে (মা)
(ও মা) শিবানী তোর চরণ-তলে
এনেছি তাই শিবকে ডেকে॥

৮

(তুই) কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
পারবি না মা ফাঁকি দিতে।
(ঐ) অসীম আঁধার হয় যে উজল
মা তোর ঈষৎ চাহনিতে॥

মায়ের কালি-মাখা কোলে
শিশু কি মা যেতে ভোলে?
(আমি) দেখেছি যে,
বিপুল স্নেহের সাগর দোলে তোর আঁখিতে॥

কেন আমায় দেখাস মা ভয়
খড়্গ নিয়ে, মুণ্ড নিয়ে?
আমি কি তোর সেই সন্তান
ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে?
তোর সংসার-কাজে শ্যামা
বাধা আমি হব না মা,
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা
ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে॥

৯

মা মেয়েতে খেলব পুতুল
আয় মা আমার খেলা-ঘরে।
(আমি) মা হয়ে মা শিখিয়ে দেব
পুতুল খেলে কেমন করে॥

কাঙাল অবোধ করবি যারে
বুকের কাছে রাখিস তারে, মা
(নইলে কে তার দুখ ভোলাবে—যারে রত্ন-মানিক
দিবি না মা উচিত সে তার মাকে পাবে)
(আবার) কেউ বা ভীষণ দামাল হবে
(কেউ) থাকবে গৃহকোণে পড়ে॥

মৃত্যু সেথায় থাকবে না মা
থাকবে লুকোচুরি খেলা।
[illegible] বেলায় কাঁদিয়ে যাবে
আসবে ফিরে সকাল বেলা।

কাঁদিয়ে খোকায় ভয় দেখিয়ে
ভয় ভোলাবি আদর দিয়ে (মা)
(বেশি তারে কাঁদাস না মা
মা ছেড়ে যে পালিয়ে যাবে)
(সে) খেলে যখন শ্রান্ত হবে
ঘুম পাড়াবি বক্ষে ধরে॥

১০

তোমার পূজার ফুল ফুটেছে
মা গো আমার মনে।
তুমিই এসে লহ সে ফুল
তোমার শ্রীচরণে॥

কখন তুমি মনের ভুলে
চরণ দিয়ে হৃদয় ছুঁলে,
কমল হয়ে ফুটলো হিয়া
তোমার পরশনে॥

মা গো, সে ফুল ঠাঁই পাবে কি
তোমার গলার মালায়?
সে ফুল কবে রাখব তোমার
নিবেদনের থালায়?

তোমার চলার পথের ধূলি
ছেয়ে দিলাম সে ফুল তুলি,
কবে তারে দলবে পায়ে
চলতে আনমনে॥

১৪

গঙ্গা-বন্দনা

(জয়) বিগলিত করুণা-রূপিণী গঙ্গে।
(জয়) কলুষ-হারিণী
পতিত-পাবনী
নিত্যা-পবিত্রা যোগী-ঋষী-সঙ্গে॥
হরি-শ্রীচরণ ছুঁয়ে আপনহারা
পরম প্রেমে হলে দ্রবীভূত-ধারা।
ত্রিলোকের ত্রি-তাপ-পাপ তুমি নিলে মা
নির্মলে ! তোমার পবিত্র অঙ্গে॥

১৫

আগমনি

আয় মা উমা, রাখব এবার
ছেলের সাজে সাজিয়ে তোরে।
(ও মা) মার কাছে তুই রইবি নিতুই,
যাবি না আর শ্বশুর-ঘরে।

মা হওয়ার মা কী যে জ্বালা
বুঝবি না তুই গিরিবালা,
(তোরে) না দেখলে শূন্য এ বুক
কী যে হাহাকার করে॥

তোর টানে মা শঙ্কর শিব
আসবে নেমে জীব-জগতে,
আনন্দেরই হাট বসাব
নিরানন্দ ভূ-ভারতে।

না দেখে যে মা, তোর লীলা,
হয়ে আছি পাষাণ-শিলা
(আয়) কৈলাসে তুই ফিরবি নেচে
বৃন্দাবনের নূপুর পরে॥

(মা) সেই পায়ে প্রেম-কুসুম ফোটায়
নূপুর-পরা যে চরণ।
(মার) সেই পায়ে রয় সর্প-বলয়
যে পায়ে প্রলয়-মরণ।
মার আধ-ললাটে অগ্নি-তিলক জ্বলে,
চন্দ্রলেখা আধেক ললাট-তলে।
শক্তিতে আর ভক্তিতে মা
আছেন যুগল রূপ ধরি॥
আমার মা যে গোপাল সুন্দরী॥

১৩

শঙ্কর-অঙ্কলীনা-যোগমায়া
শঙ্করী শিবানী।
বালিকা-সম লীলাময়ী
নীল-উৎপল-পাণি॥

সজল-কাজল-বর্ণা
মুক্তকেশী অপর্ণা
তিমির-বিভাবরী স্নিগ্ধা
শ্যামা কালিকা ভবানী॥

প্রলয়-ছন্দময়ী চণ্ডী
শব্দ-নূপুর-চরণা
শাম্ভবী শিব-সীমন্তিনী
শঙ্করাভরণা।
অম্বিকা দুঃখহারিণী
শরণাগত-তারিণী
জগদ্ধাত্রী শান্তি-দাত্রী
প্রসীদ মা ঈশানী॥

১১

তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা
আমার প্রথম পূজার ফুল।
ভজন-পূজন জানি না মা
হয়ত হবে কতই ভুল॥

দাঁড়িয়ে দ্বারে 'মা মা' বলে
ভাসি আমি নয়ন-জলে,
ভয় হয় মা ছুঁই কেমনে
মা তোর পূজার বেদীমূল।

আশ্রয় মোর নাই জননী
ত্রিভুবনে কোথাও হায়!
দাঁড়াই মা গো কাহার কাছে
তুইও যদি ঠেলিস পায়।
হানে হেলা সবাই যারে
তুই যদি কোল দিস মা তারে
(আমি) সেই আশাতে এসেছি মা
অকূলে তুই দে মা কূল॥

১২

(আমার) মা যে গোপাল সুন্দরী।
(যেন) এক বৃন্তে কৃষ্ণকলি
অপরাজিতার মঞ্জরি॥
(মা) আধেক পুরুষ অর্ধ অঙ্গে নারী
আধেক কালী আধেক বংশীধারী
অর্ধ অঙ্গে পীতাম্বর
আর অর্ধ অঙ্গে দিগম্বরী॥
আমার মা যে গোপাল সুন্দরী।

১৬

আগমনী

কী দশা হয়েছে মোদের
দেখ মা উমা আনন্দিনী।
(তোর) বাপ হয়েছে পাষাণ গিরি
মা হয়েছে পাগলিনী॥

(মা) এদেশে আর ফুল ফোটে না,
গঙ্গাতে আর ঢেউ ওঠে না,
(তোর) হাসি মুখ না দেখলে যে মা
পোহায় না মোর নিশীথিনী॥

আর যাবি না ছেড়ে মোদের
বল মা আমার কণ্ঠ ধরি
সুর যেন তার না থামে আর
বাজালি তুই যে বাঁশরি।

না পেলে তুই শিবের দেখা
রইতে যদি নারিস একা
(আমি) শিবকে বেঁধে রাখব মা গো
হয়ে শিব-পূজারিণী॥

কলির কেষ্ট

[বাঁশির সুর]
কেডা রে-? কেডা? উ—কেলিকদম্ব গাছের এই ডাল ঐ ডাল কইরা লাফ দিয়া বেড়াইত্যাছ? ও-ঘোষ পাড়ার হেই বখাইটা পোলাটা না? উ-হুঁ —, আবার পিরুক পিরুক কইরা বাঁশি বাজান হইত্যাছে—ন্যাম্যা আইস—নাম্যা আইস ভদ্-দুপুর বেলা মাইয়াগো ছান ঘাটের কাছে—অ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, আবার কেষ্ট সাজছেন? যিনি কেষ্ট সাজছেন, নামো শিগ্‌গির নামো—পোড়া কপাইল্যা নামো—

তুমি নামো হে নামো
শ্যাম হে শ্যাম!
কদম্ব-ডাল ছাইড়া নামো
দুপুরি রৌদ্রে বৃথাই ঘামো
ব্যস্ত রাধা কাজে
শ্যাম হে শ্যাম॥

আ রে, তোমার ললিতা দেবী কি করতেয়াছে জাননি? তোমার ললিতা দেবী?
আরে ললিতা দেবী সলিতা পাকায়,
বিশাখা ঝোলে হিজল-শাখায়;
আর বৃন্দা দূতী কি করছে জান? বৃন্দা দূতী?
বৃন্দা দুতী পিন্দা ধুতি
গোষ্ঠে গেছেন তোমার 'পোস্টে'
সাজিয়া রাখাল সাজে
আর চন্দ্রা গেছেন অন্ধ্র দেশে
মান্দ্রাজী জাহাজে।

আবার ইতি উতি চাও ক্যা? ইতি উতি চাইবার লাগছ ক্যা? অ্যাঁ?
আমি কমু না, কোন্‌খানে তোমার যমুনা তা আমি কমু না?

আরে ইতি উতি চাও বৃথাই
আমি কমু না কোথায় তোমার যমুনা,
কইলকাতা আর ঢাকা রমনার
লেকে পাবে তার নমুনা।

আরে, তোমার যমুনা ল্যাক্ হইয়া গ্যাছে গিয়া ! বুঝলা ?
হালার যমুনা ল্যাক হইয়া গ্যাছে গিয়া।
কলেজে ফিরিছে শ্রীদাম সুদাম।

শ্রীদাম সুদাম কলেজে যাইতেয়াছে আর তুমি এখানে বাঁশিবাজাইত্যাছ অ্যাঁ ? পোরা কপাইল্যা—

কলেজে ফিরিছে শ্রীদাম সুদাম
মেরে মাল-কোঁচা খুলিয়া বোতাম,
লাঙল ছাড়িয়া বলরাম
ডাম্বেল মুদ্গর ভাঁজে ;
ওহে শ্যাম হে শ্যাম
আরে তুমি নামো
পোড়া কপাইল্যা নামো॥

এন. ৯৮১৪

কালোয়াতি কসরৎ

গাব্বুসের বাপ : অইগ্যা পেন্নাম ওই পতিতুণ্ডী ঠাউর ! আইগ্যা, তুমি আপনি যাইবার লাগছে কই? আহা হাহা ! ওদিক পানে যাইও না ঠাউর ! ময়লা আছেন—ময়লা আছেন—মানুষের ময়লা !

পতিতুণ্ডী : কে ও? গাব্বুসের বাপ? হল্লারে বিল্লা। নক্কুরে খাইছিল ! রামচন্দ্র ! বাবা গাব্বুসের বাপ। বাইচ্যা থাহ বাবা বাইচ্যা থাহ বাবা। তুমি না কইলে এহনি আমি ঐ ময়লাতে পারা দিচ্ছিলাম। তা হেরে কি কয়, মুই যাইত্যাচি বৈকুণ্টু তলাপাত্রের বাড়িত। তলাপত্র বুঝলি? বেডপ্যান, বেডপ্যান। কলা বুঝছ? হেই তলাপাত্রের বাড়িত কালোয়াতি গান হইব,—হেরে হুনবার যাইতেছি।

গাব্বুসের বাপ : কালো হাতির গান? আইগ্যা কি যে কন। মুই ত বাপের জন্মেও কালো হাতির গান ত হুনছি না। সার্কসে কালো হাতির নাচ দেখছি—গান ত হুনছি না। মো গো গরিব গ কি যাইবার দিব?

পতিতুণ্ডী : (হাসিয়া) আরে, কালো হাতির গান নয় ; কালোয়াতি গান। আইও মোর লগে, যাইবার দিন না কিসের লাইগ্যা।

গাব্বুসের বাপ : আইগ্যা ওই ওইল। আপনার যারে আতি কন, আমারাও হিরে আতি কই। চলেন আইগ্যা।

[ওস্তাদের গান হচ্ছে—ওস্তাদজী তখন বাঙলা গান ধরেছেন]

গান

(আরে হাঁ) ভক্ত তব ডাকে মেনকা-নন্দিনী।
সব কুছু হামার হারাইয়া মা গো
তোমার নাম জপি জগদম্বা গো.
মহামাইয়্যা আইস্যা সন্ধ্যা আঁধিয়ারা
নাইশো আনন্দিনী॥

[গানের মাঝে গাব্বুসের বাপের হাউ হাউ রবে ক্রন্দন]

পতিতুণ্ডী : এরি ও গাব্বুসের বাপ ! কাঁদবার লাগছস্ কিসের লাইগ্যা। চুপ দাও।

গাব্বুসের বাপ : আইগ্যা, ওস্তাদজীর দাড়ি দেইখ্যা আমার পাঠাডার কথা মনে পইর‍্যা গেছে গো। কাল থনে আমার পাঠাটারে বিছরাইয়্যা পাইতেছি না। তেনার মুখে ওস্তাদজীর মুখের লাহান দাড়ি আছিল। হেও ঐহুন ম্যা ম্যা কইরা ডাকত। [নৃত্যাদি]

কবির লড়াই

[পল্লীগ্রামে এক রকম লড়াই আছে, তাকে বলে কবির লড়াই। এতে একজন দেয় চাপান আর একজন দেয় কাটান। আমাদের এই লড়াই-এর প্রথম কবিয়ালকে যে লোকটি আসর থেকে Prompt করছিল, সে ছিল কয়ালী অর্থাৎ সে ধান মাপত, সে ভুল করে কবিয়ালের খাতার বদলে ধানের হিসাবের খাতা এনে বলে,যাচ্ছে, আর কবিয়ালও তাই গেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ঢুলির বাজনা হচ্ছে।]

কবি—বড় সঙ্কটে পড়েছি মা গো, দাও মা পদতরী
তরে যাই
প্র—১৩২৫ শে পৌষ গুজরতে খোদ খেদু মোড়ল,
সাড়ে সতের আড়ি ধান—
কবি—১৩২৫ শে পৌষ গুজরতে খোদ খেদু মোড়ল
সাড়ে সতের আড়ি ধান—

ওরে নারে নারে ওরে নারে নারে
কয়ালী কি কওয়ালি, ধানের খাতার হিসাব বলে
কূল মান মোর সব খোয়ালি, কয়ালী কি কওয়ালি।
ষাঁড়ের মাথায় ঢুস মারতে এসেছে ঐ ভেড়া,
পাহাড়ে মাথা ঠুক্‌তে এলো টেকো মাথা নেড়া।
(লাগাও চাঁটি টাক ভেঙে যাক)
পেরথম ভাথ পড়েননি কো, এলেন কবি-গান গাইতে,
নামতে নারে ডোবায়, এলো সমুদ্দুরে নাইতে।
(নাকানি চোপানি নাকানি চোপানি)

চাপান দিয়ে বাবুরা সব শুন অতঃপর,
এই চাপানেই কাঁপন দিয়ে আসবে বাছার জ্বর।
(ধর ধর লেপ ঠেসে ধর, ধর লেপ ঠেসে ধর মালোয়ারি জ্বর)
বলি ভূতের বাপের নাম কি, আর ডিম দেয় কোন্ ঘোড়ায়,
দশটা মুণ্ড নিয়ে রাবণ কেমন করে ঘুমায়?
শিবের মাথায় গঙ্গা, হয় না কেন সর্দি,
বলতে পারলে বলব কবি, নয় একদম রদ্দি।

(মুড়ি কুড় কুড় কাঁকুড় কাঁকুড়
মুড়ি কুড় কুড় কাঁকুড় কাঁকুড়
ঝিনেদা চলে যা ঝাঁ।
ঝিনেদা চলে যা ঝাঁ
ঝিনেদা চলে যা ঝাঁ)
(যার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল, তার নাম গুমানি)
কবি—বলি গুমানি নাম নিয়ে তুই গুমান করি এত,
ঐ নামের প্রথম অক্ষর কি, জানে সকলে তো।
(হায় হায় মরি মরি গুমানি কবি রে)
গুমানি তোর মানি গেলে রইবে বাকি কি,
পায়ে মাড়ালে নাইতে যে হয়; বলব না নাম ছিঃ

(ধর্ ধর্ ল্যাজ ঠেসে ধর্—
ধর্ ধর্ ল্যাজ ঠেসে ধর্—
নাক টেনে ধর ল্যাজ ঠেসে ধর ;
মিন্‌সে জবরজং মিন্‌সে জবরজং
মিন্‌সে কেমন সং।।)
(গুমানি এসে চাপানের কাটান দিচ্ছে)
নেই কো ডানা উড়ে এলি সাবাস, জীবন উড়ে।
আমার ভয়ে জীবন এবার যায় বুঝে তোর উড়ে।।
আমার ভয় জীবন এবার যায় বুঝে তোর উড়ে।।
(উড়ে উড়ে যাক, উড়ে উড়ে যাক,
জীবন উড়ে উড়ে যাক,
উড়ে কটকে পুরীতে উড়ে যাক্
উড়ে যাক্ উড়ে যাক্ উড়ে যাক্।।)
বুড়ো বলদ লড়তে আসে এঁড়ে দামড়ার সাথে,
আর ব্যাং বলে আজ চিৎ করব হাতিকে এক লাথে।।
ভূতের বাপের নাম? আবাগে, আর তাইতে মহাশয়
আবাগের বেটা ভূত, গাল দিয়ে লোকে কয়।
ভেবেছিলি ঘোড়ার ডিমের প্রশ্নে করবি ঠাণ্ডা,
ঘোড়ার মধ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়াতে দেয় আণ্ডা।।
(হলি ঠাণ্ডা, গণ্ডা গণ্ডা ঘোড়ার আণ্ডা দেখে যা
দেখে যা দেখে যা দেখে যা
দেখে যা দেখে যা দেখে যা।।)

বেলের আঠায় শিবের জটায় ওয়াটার প্রুফ হয়ে
ওরে, বেলেস্তারা হয়ে—
সর্দি হয় না শিব ঠাকুরের গঙ্গা মাথায় লয়ে
শিবের গঙ্গা মাথায় লয়ে।
(আর) রাবণ রাজার দশ মুণ্ডের নয়টা ছিল শোলার,
ভয় দেখাতে এই মতলব ঐ রাক্ষসেরই পোলার॥
শোবার সময় শোলার মুখোস–মাথা রাখত খুলে
এবার আমি যদি চাপান দিই তুই ছুটবি রে লেজ তুলে
(ছোট্ ছোট্ লেজ তুলে ছোট্ কাছা খুলে ছোট্
বনে ও বাদাড়ে, পগারে পাহাড়ে ছুটে যা
ছুটে যা, ছুটে যা, ছুটে যা।)
মোর গুমানি নামের প্রথম আখর নিয়ে—
বাহাদুরি করলি তো খুব একবার আমি শোনাই ইয়ে।
তোর গুরুর গোড়ায় কি, তোর গুরুর গোড়ায় কি,
তোর সাগুর শেষে কি? আর মাগুর মাছের মাঝে কি খাস?
তুই জ্বর হলে খাস গুলঞ্চ রস, তার প্রথমে কি?
বেগুনের মাঝখানে খাস, তারে কি কয় ছি:
ওরে ছি, গুড়ের প্রথম অক্ষর কি, ছি: ওরে ছি:—
তোর গুরুর গোড়ার কি রে তোর গুরুর গোড়ায় কি?
(খাস্ খাস্ পাতি হাঁস্, খাস্ খাস্
যাবা বাপ দিল্লী যাবা, দিল্লীকা ওই লাড্ডু খাবা
কুমড়ো ছাঁচি কুমড়ো, কুমড়ো চাল কুমড়ো
বজ্রযোগিনী যাবা না ভগিনী
যাবিনে যাবিনে যা, যাবিনে যাবিনে যা॥)

পুরনো বলদ নতুন বৌ

১ম খণ্ড

[বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। গ্রামের পথে পাখিরা ডাকে। দূরে গরুর গাড়ি হাঁকাইয়া গান গাহিতে গাহিতে গাড়োয়ান আসিতেছে।]

গান

গাড়োয়ান।। বাপের বাড়ির থনে নতুন বৌ ফিরছে বাড়ি বলদ, চল্ রে তাড়াতাড়ি।।

আরে, আরে, আরে, বেডা শাম্লা ! তুই বেডা চোখে দেখস্ না ? হালা, রাতকানা হইছস ? টাইনা এক্কেরে গর্তের মধ্যে ফেলায় দিছিলি ! সিদা অইয়া চল্ ! (গরুর ডাক)

গান

বৌ তৈরি করছে আমার লাইগা নতুন গুড়ের পিঠা,
সেই পুলি-পিঠার চাইতে তার আঙ্গুল আরো মিঠা।
তার মুখ দেইখ্যা ফেইল্যা রাখি খেজুর রসের হাঁড়ি
বলদ, চল্ রে তাড়াতাড়ি।।

ও হালার বল্দা, খারাইয়া খারাইয়া গান শুনবার লাগছস ? দৌড়াইয়া চ’ নতুন বৌ তোর গায় হাত বুলাইয়া দিব।

(গরুর ডাক)

গান

তোরে খাইবার দিব ছানি
কচি ঘাস আর পানি,
বৌ আদর কইরা বল্দা রে
তোর লেজুড় দিব টানি।

শাম্লা ! কইতে পারস্ আমার বৌ এখন কি করছে ? বেড়ার ফাঁক দিয়া ফুচ্কি দিয়া দেখতাছে, তাঁর সুন্দর সোয়ামী কহন ঘরে ফিরব—না ? (গরুর ডাক)

আর, বিছানা করতাছে, আর ফিক ফিকাইয়া হাসতাছে—না ? দেখ পক্ষীরাজ, হালার মশারা বৌরে ঘির্যা পুন্ পুন্ কইর‍্যা গান শুনাইতেছে ! বৌ যেই তারে তাড়াইবার

লাইগা হাত নাড়তাছে, অমনি তার হাতের চুড়ি ঠুনঠুন কইরা বাইজা উঠ্তাছে। সেই হাতে বৌতোর পিঠ খাউজাইয়া দিব—দৌড় পইরা চল্ হালায়—

(গরুর ডাক)

২য় খণ্ড

[বলদ লইয়া গাড়ায়ান ঘরে ফিরিতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বলদ গোয়ালের পথ ভুল করিয়া রান্না ঘরের দিকে যাইতেছে।]

গাড়োয়ান।। আরে, আরে, অইচে, ওই দিকে যাস্ ক্যান্? রান্না ঘরের দিকে যাস্ ক্যা? ও বেডা শামলা,আরে থাম্ থাম্, বাড়িতে আইস্যা রান্নাঘরের দিকে যাস্ ক্যান্? ও বৌরে দেইখ্যা রান্না ঘরের দিকে হাঁদাইতেছ্স? আরে বেডা, গোয়াল ঘরে গিয়া জিরাইয়া ল, তারপর নতুন বৌ আইসা, গা খাউজাইয়া দিব। (গরুর ডাক)

হে,হে,হে! (উচ্চৈঃস্বরে) মা, মা, বলি অ মা! বলি, সারাদিন যে খাইটা খুইটা আইলাম, তা বাড়িতে মানুষ–জন নাই না কি? সব মরছে? আলো–বাত্তি ধরবারে পারে না?

মা।। কেডা? বাবা পুঁইটা আইছস্? অ গুইলা, গুইলা, ছ্যামড়া গেল কই? আলো বাত্তিডা ধর—

গাড়োয়ান।। গুইল্যা ক্যান্? বাড়ির কি আর মানুষ–জন নাই, সব মরছে? সবাইরে দেখবার পাইতেছি, কাউকে দেখ্বার পাইতেছি না ক্যান?

মা ।। আচ্ছা বাবা, তুই খাড়া হ, আমিই গিয়া আলো–বাত্তিটা লইয়া আস্তেছি।

গাড়োয়ান।। তুমি বুড়া মানুষ, তুমিই বা আন্বে কিসের লাইগ্যা? বাড়িতে কি আর মানুষ জন নাই, সব মরছে? সবাইরে দেখ্ছি মানুষের দেখবার পাইতেছি না যে!

মা।। (হাসিয়া) অ, তুই বৌমারে খুজ্ত্যাছস্। বৌমা, অ বৌমা, আলো–বাত্তিডা ধর গো, আমাগো পুঁইটা আইত্যাছে!

(পায়ের মলের শব্দ)

গাড়োয়ান।। আরে, ঐ না আইত্যাছে! আরে হ, হ!

গান

কাজলা বিলের শাপলা তুইলা আন্ছি গামছা বাইন্দা,
আউলা কেশী কই রে আমার, আমি বেরাই কাইন্দা।
বাঁধত্যাছ কি চুল,
(তুমি) তুলত্যাছ কি ফুল,
না নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত্যাছ সাত ব্যঞ্জন রাইন্দা?

বৌ।। দেখছনি, এই রকম চিক্কুর পার ক্যান্। আমার শরম লাগে! মা দাওয়াতে বইস্যা বইস্যা হাস্তাছে তোমার কাণ্ড দেইখা!

গাড়োয়ান॥ হাসতাছে? আরে, পোলার কাছে তার বৌ আসছে; মা হাস্‌ব না ত কি কান্‌ব? তা তুমি ছিলে কোহানে? তুমি কি ডুমুরের ফুল হইছ? ইস্‌ দেখ, আলোবাত্তি তোমার মুখের পানে চাইয়া, চাইয়া, চাইয়া নিব্যা গেল গিয়া। তা যাউক্‌ গিয়া, আলো-বাত্তির দরকার কি? তোহার মুখ দেইখা আমার দুনিয়া আলো হইয়া যাইব!

বৌ॥ যাও—আমার শরম লাগে!

গাড়োয়ান॥ দেখ্‌ তোমার চিকন গলার কথা শুইন্যা আমার পরানডা জুরাইয়া গেল গিয়া।...দেখ, সারাদিন খাইটা-খুইটা আমার পাও দুইটা এক্কেরে ব্যথা হৈয়া গেছে গিয়া! তুমি এট্টু মালিশ কইরা দিবা? দেও না, দেও না, সোনা আমার, মানিক আমার লক্ষ্মী আমার! আহ্‌ আহ্‌, আহ্‌!

বৌ॥ কি যে কও, আমার শরম লাগে!

গাড়োয়ান॥ আরে, হালার শরম তুমি পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া থোও গিয়া। আমার ব্যথা করত্যাছে, আর তোমার কিনা শরম লাগে, শরম লাগে!

বৌ॥ না, না, তুমি রাগ কইরো না! তুমি ঘরে যাও, আমি আইতে আছি। কিন্তু দেখ, আমার বড় শরম লাগে।

গাড়োয়ান॥ শরম লাগে! শরম লাগে!

গান

তোর যত শরম লাগে রে বৌ
তোরে তত লাগে মিঠা।
ও লো, যে বৌ-ঝির শরম নাই,
সে চিটাগুড়ের পিঠা॥
হালায় চিটাগুড়ের পিঠা॥
বৌ॥ যাও! যাও!
গাড়োয়ান॥ আরে, হ, হ, সত্যই!

'সিরাজুদ্দৌলা'

১

আমি আলোর শিখা,
ফুটাই আঁধার ভবনে দীপ-কলিকা॥

নিশ্চল পথে আমি আনন্দ-ছন্দ,
অন্ধ আকাশে জ্বলে রবি-তারা-চন্দ ;
আমি ম্লান মুখে আনি রূপ-কণিকা॥

২

[আলেয়া নাচিতেছে ও গাহিতেছে]

ম্যয় প্রেম নগরকো জাউঙ্গি।
সুন্দর দিলবর দেখন কো
ফুল চড়াউ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গুঙ্গি পিয়া-রঙ্গ মে
পিয়া নাম মেরি গলে কি হার কর
পীতম মম বাহ লাউঙ্গি॥

৩

কেন প্রেম-যমুনা আজি হলো অধীর ?
দোলে টলমল রহে না স্থির।
মানে না বারণ উথলে বারি
ভাসাল কুললাজ রুধিতে নারি
সখি ডাক শুনেছে সে কার মুরলীর॥

৪

পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা
আমার ভুবনে শুধু আঁধারের লেখা॥

বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে
আশ্রয় যাচি হায় কাহার কাছে
বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর
ফুটিবে না আশার আলোকরেখা॥

৫

এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা।
সকালবেলা আমির রে ভাই,
ফকির সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
ঘুমিয়ে ছিলি, ওরে বেভুল,
ঘুমিয়ে ছিলি সুখের আশায়?
যখন ধরল ভাঙন পেলিনে তুই
পারে যাবার ভেলা॥

৬

পলাশি! হায় পলাশি!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে
কলঙ্ক-কালিমারাশি
হায় পলাশি॥

আত্মঘাতী স্বজাতির
মাখিয়া রুধির-কুমকুম
তোরি প্রান্তরে ফুটে
ঝরে গেল পলাশ-কুসুম।
তোর গঙ্গার তীরে পলাশসঙ্কাশ
সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি॥

'অন্নপূর্ণা'

১

(ভজন দাদরা)

শোনো, ডাকে রে ঐ ডাকে মোরে ডাকে।
কাতর ক্ষুধাতুর জনগণ বিশ্বের বিধাতাকে
—ঐ ডাকে।
ওরা আসন আমার টলাল
মোর পূর্ণ রসে ভুলাল—
আসন আমার টলাল।
ওরা ডাকলে আমি থাকতে নারি
(ওরা আমার চরণে শরণ নিলে)-২ বার
আমি যে হরি—আমিও হারি ;
ওদের কাঁদন নিবিড় বাঁধন,
মন্দিরে বেঁধে রাখে।
মোরে মন্দিরে বেঁধে রাখে॥

২

যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে।
মাটির পৃথিবী তাই এত ভাল লাগে॥

হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক, সাধে অবসাদ ;
হেথা প্রেমে আছে গুরুগঞ্জনা, অপবাদ ;
আছে মান-অভিমান পিরিতি-সোহাগে॥
হেথা হারাই হারাই ভয়, প্রিয়তমে তাই
বক্ষে জড়ায়ে কাঁদি, ছাড়িতে না চাই।
স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ-অনল,
সুন্দর আঁখি আছে, নাই আঁখিজল ;
রাধার অশ্রু নাই কুসুম-ফাগে॥

'লায়লি-মজনু'

১

(লায়লি)

তোমার সজল চোখে লেখা মধুর গজল গান।
চেয়ে চেয়ে তাই দেখে গো আমার দু'নয়ান॥

(মজনু)

আমার পুঁথির আখর যত
তোমার মালার মোতির মতো
তাই দেখি আর পাঠ ভুলে যাই, আকুল করে প্রাণ॥

(ছাত্রছাত্রীগণ)

যেমন বুলবুলি আর রঙিন গোলাব
লায়লি–মজনু দুইজনে ভাব
ওদের প্রেমে ধূলির ধরা হলো গুলিস্তান॥

(জনৈক ছাত্রী)

এই, এই উট আসছে রে... উট আসছে !

(দ্বিতীয় ছাত্র)

তুমি, মৌলভি সাহেবকে উট বললে ! আমি বলে দিচ্ছি—

(প্রথম ছাত্র)

তাহলে আমিও বলে দেবো তুমি সেদিন ওঁকে বলেছিলে পেঁচা—

(মৌলভি)

পড় পড় পড়।

২

(হায়) তুমি চলে যাবে দূরে লায়লি
তব মজনু কাঁদিবে একা।
বুঝি পাব না তোমায় জীবনে
বুঝি এই নিয়তির লেখা॥

৩

আবার কেন বাতায়নে দীপ জ্বালিলে, হায় !
আমার এ প্রাণ-পতঙ্গ ঐ প্রদীপ পানেই ধায়॥

(লায়লি প্রত্যুত্তরে গাহিল)

আমার প্রেম যে অনলশিখা জ্বলে তিমির রাতে।
পতঙ্গেরে পোড়াই আমি, নিজেও পুড়ি সাথে॥

(মজনু গাহিল)

একি ব্যথা, একি নেশা
এই কি গো প্রেম গরল মেশা !

(লায়লি প্রত্যুত্তরে গাহিল)

তত আলো দান করে প্রেম
যত সে জ্বালায়॥

৪

রূপের কুমার জাগো ! নিশি হয় অবসান।
গাহিছে আলোককুমারীরা, শোনো ঘুম-ভাঙানিয়া গান।
তুমি জাগিছ না বলি
ফোটে না আলোর কলি,
তব ঘুমন্ত আঁখির পাতায় ঘুমায় আলোর প্রাণ॥

৫

বনের হরিণ, বনের হরিণ !
ওরে কপট-চোর।
কেমন করে করলি চুরি
প্রিয়ার আঁখি মোর॥

লায়লিরে তুই দেখ্‌লি কখন
করলি বদল তোদের নয়ন
বন হয়েছে স্বর্গ আমার
হেরি নয়ন তোর॥

৬

তোমার বিবাহে আপনার হাতে
আমি দেবো হার পরায়ে।
মোর চোখে যদি জল করে টলমল
আমি দু'হাতে দেবো তা সরায়ে॥

৭

বরের বেশে আসবে জানি আজ মম সুন্দর।
পার হয়ে দূর বিরহলোক বহু যুগের পর॥

আসে সে ঐ চুপে চুপে
আমার মধুর মরণরূপে.
আর সে ছেড়ে যাবে না গো আমার বাসর-ঘর॥

৮

তোমার কবরে প্রিয়, মোর তরে
একটু রাখিও ঠাঁই।

মরণে যেন সে পরশ পাই গো
জীবনে যা পাই নাই॥

তোমারে চাহিয়া ওগো প্রিয়তম
কাঁদিয়া আমার কাটিল জনম,
কেঁদেছি বিরহে, এবার যেন গো মিলনে কাঁদিতে পাই॥

ঐ কবরের বাসর-ঘরে গো তোমার বুকের কাছে
কাঁদিবে লায়লি, মজনু তোমার যদিন ধরণী আছে।
যে যাহারে চায় কেন নাহি পায়
কেন হেথা প্রেম ফুল ঝরে যায়,
প্রেমের বিধাতা থাকে যদি কেউ
শুধুইব তারে অই,
একটু রাখিও ঠাঁই॥

‘মহুয়ার গান’

১

(বেদে ও বেদেনিদের গান)

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো।
খোঁপা খুলে কেশ হলো বাউল লো ॥

পথে সে বাজাল মোহন বাঁশি
(তোর) ঘরে ফিরে যেতে হলো ভুল লো।
কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি
বৈঁচিমালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো ॥

ও সে বুনো পাগল পথে বাজায় মাদল,
পায়ে ঝড়ের নাচন শিরে চাঁচর চুল লো ॥

দিল নাকেতে নাকছাবি বাবলাফুলি
কাচের চুড়ি আর ঝুমকোফুল দুল লো।
সে নিয়ে লাজ দুকূল দিল ঘাগরি
সে আমার গাগরি ভাসাল জলে বাতুল লো ॥

২

(বেদে ও বেদেনিদের গান)
তিলক–কামোদ দেশ—কাওয়ালি

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন করে।
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভরে।
সাজাব কেমন করে ॥

কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন–ডালি,
সাজাতে কি না—সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধরে ॥

কেতকী ভাদর–বধূ ঘোমটা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি–ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনীফুল মানে না মানা ছুঁতে পড়েছে ঝরে॥

গন্ধ–মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজি টগর–বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে মরে॥

৩
(মহুয়ার গান)
ভৈরবী–পিলু—কার্ফা

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী॥

সে কাঁদন শুনি হেরো নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে জুঁই চামেলি কামিনী॥

আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখি, 'পিউ কাহাঁ',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী॥

৪
(মহুয়ার গান)

কত খুঁজিলাম নীল কুমুদ তোরে।
আছে নীল জল শূন্যে সরসী ভরে॥

উঠেছে আকাশে চাঁদ, ফুটেছে তারা,
আছে সব, একা মোর কুমুদ–হারা।
অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝরে॥

বিল ঝিল খুঁজি নাই সে যে হায়,
হৃদয় শুধায় চোখে, কোথায় কোথায়।
ঘুমায়ে আছে সে কি আছে লুকায়ে,
সোঁদা মাখা এলোচুল গেল শুকায়ে
নদীরে শুধাই—জল যায় যে সরে॥

৫
(মহুয়ার গান)
পিলু—কাওয়ালি

কোথা চাঁদ আমার!
নিখিল ভুবন মোর ঘিরিল আঁধার॥

ওগো বন্ধু আমার, হতে কুসুম যদি,
রাখিতাম কেশে তুলি নিরবধি।
রাখিতাম বুকে চাপি হতে যদি হার॥

আমার উদয়-তারার শাড়ি ছিঁড়েছে কবে,
কামরাঙা শাঁখা আর হাতে কি রবে।
ফিরে এস, খোলা আজও দখিন-দুয়ার॥

৬
(মহুয়ার গান)

ফণির ফণায় জ্বলে মণি
কে নিবি তাহারে আয়
মণি নিতে ডরে না কে
ফণির বিষ-জ্বালায়॥

করেছে মেঘ উজালা
বজ্র মানিকমালা,
সে-মালা নেবে কি কালা,
মরিয়া অশনি ঘায়॥

৭

(বেদেনির গান)
দরবারি কানাড়ি—কাওয়ালি

মহুল গাছে ফুল ফুটেছে
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।
গুনগুনিয়ে ভ্রমর এল
ভুল করে তোর ভোলাল মন॥

আঁউরে গেছে মুখখানি ওর
করল বাতাস ফুলের আঁচল,
চাঁদের লোভে এল চকোর
মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন॥

কেশের কাঁটা বিঁধে পাখায়
রাখল ওরে বেঁধে শাখায়,
মৌটুসি মৌ হিয়ায় মিশায়
মদের মিঠায় কপাটে কর নিকট আপন (ও তুই)॥

৮

(বেদেনিদের গান)
দরবারি কানাড়ি—কাওয়ালি

আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন॥

প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনী-দলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলাল
খোলো গো নিঁদ-মহল-আবরণ॥

ঘুরে ঘুরে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে নাচুনি ঘূর্ণির ছন্দে।

লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমুঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ॥

৯
(পালঙ্কের গান)
আড়ানা—কাওয়ালি

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এল চাঁদের জোয়ার॥

সংকেত-বাঁশরি বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
স্যাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর পাথার॥

জেগে উঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখি
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।
অসহ রূপের দাহে ঝলসি গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।

ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগো।
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিণী অভিসারে বঁধুয়ার॥

১০
(মহুয়ার গান)
বেহাগ ও বসন্ত—একতালা

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর।

স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলোছায়ায়,
বহিছে পবন গন্ধ-চোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

১১
(মহুয়ার গান)
আশাবরী—কাওয়ালি

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দেবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোনার চাঁদ-চুঁয়া॥

মধু হতে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রঙ ধরে কাজল-নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া॥

ঝিম হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পানসে জোছনাতে পানসি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতানি এ মহুয়া॥

১২

(মহুয়ার গান)

দেশ—একতালা

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দুজন।
সুন্দরতর হলো নিখিল ভুবন॥

আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন॥

মরিতে চাহি না, পেয়ে জীবন-অমিয়া।
আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।

আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল-বন্যা,
পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ॥

১৩

(রাধু পাগলির গান)

ভাটিয়ালি—কারফা

ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই এপার-ওপার করি॥

আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল।
আমি ভাসতে আসি, আসিনিকো কামাতে ভাই কড়ি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।

তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥

আমি তারই আশে তরী লয়ে ঘাটে বসে থাকি,
আমার তারই নাম ভাই জপমালা তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন–তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদীর জলে ভরি॥

ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হলাম দেশান্তরী॥

১৪
(রাধু পাগলির গান)
ভাটিয়ালি—কাহারবা

আমার গহিন জলের নদী
আমি তোমার জলে ভেসে রইলাম জনম অবধি॥

ও ভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
আমি চরে এসে বসলাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার জলেরে আমি ভাসি নিরবধি॥

ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই, ভাঙলে কেন মন,
ও ভাই হারালে আর পাওয়া না যায় মনেরি রতন।
ও ভাই জোয়ারে মন ফিরে না আর রে, ও সে ভাঁটিতে হারায় যদি।

তুমি ভাঙো যখন কূল রে নদী ভাঙো একই ধার,
আর মন যখন ভাঙো রে নদী দুই কূল ভাঙো তার।
ও ভাই চর পড়ে না মনের কুলেরে, ও সে একবার ভাঙে যদি॥

১৫

(রাধু পাগলির গান)

ভাটিয়ালি—কাহারবা

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥

আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি,
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল, তাই হলাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো
ওরে শুকাইনিকো গলে॥

ওই যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ হতে এসে
আমার দুখের তরী দিছি ছেড়ে (বন্ধু) চলতেছে সে ভেসে।
এখন সে পথে নাই তুমি বন্ধু গো
তরী সেই পথে মোর চলে॥

‘সুরথ-উদ্ধার’ পালার গান

১

(পুরবাসীগণের গান)

আজ শরতে আনন্দ ধরে না রে ধরণীতে
একি অপরূপ সেজেছে বসুন্ধরা নীলে হরিতে॥

আনো ডালা ভরি কুন্দ ও শেফালি
আজ শারদোৎসব জ্বালো দীপালি,
স্নেহ-মাখা সুনিবিড় আকাশ উদার ধীর,
দুলে নদী-তীর কার আগমনীতে॥

২

(রাজলক্ষ্মীর গান)

হেথা নাহি কল্যাণ
দেশ শ্রীহীন ম্লান,
বসিয়াছে ধর্মের পুণ্যাসনে
অধর্ম অনাচার॥

৩

(নর্তকীগণের গান)

বাসনার সরসীতে ফুটিয়াছে ফুল,
মধু-লোভী মদালস এস অলিকুল॥

ভোগের পাত্রে মধু
প্রাণ ভরে পিও বঁধু
আনন্দে হয় যদি হোক দিক ভুল॥

৪

(সকলের গীত)

অন্নপূর্ণা মা এসেছে অন্নহীনের ঘর
উলু দে রে শঙ্খ বাজা প্রদীপ তুলে ধর্॥

তপস্যাহীন পাপীর দেশে
মা এসেছে ভালোবেসে,
বিনা পূজায় মায়ের রূপে এল বিধি বর॥

৫

(পাহাড়ি নর-নারীগণের গীত)

আয় রণজয়ী পাহাড়ি দল
শক্তি-মাতাল বুনো পাগল,
থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ
নেচে আয় রে দৃপ্ত পায়।
গিরি দরি বন ভাসায় যেমন
পার্বতিয়া ঝর্নাজল।
আনো তীর ধনু বর্শা হান
বাজরে শিঙ্গা বাজা মাদল॥

৬

(ভৈতবের গীত)

তোরা মা বলে ডাক,
তোরা প্রাণভরে ডাক মা বলে রে
রইবে না আর দুঃখশোক।
আমার মুক্তকেশী মায়ের নামে
মুক্তি লভে সর্বলোক॥

নাম জপে যে বরাভয়ার
ত্রিভুবনে ভয় কিরে তার
সে অন্তবিহীন অন্ধকারে
দেখতে পায় আশার আলোক॥

৭

(প্রজাগণের গীত)

পুণ্য মোদের মায়ের আসন কলঙ্কিত করল কে
কোন সে দুরাচার
মায়ের কোটি সন্তান আজ করবে বিচার তার।
কোন অশুচি দানব এসে স্বর্গে বসে জয়ীর বেশে,
বজ্র হানি বক্ষে তাহার ভাঙব অহঙ্কার॥

৮

(সকলের গীত)

এসেছে রে অধর্মের আজ শেষ বিচারের দিন,
কাপুরুষ মোরা মোদেরি দোষে
অধর্ম আজ রক্ত শোষে,
আজ সে ক্ষুদ্রে রুদ্র রোষে
করব চরণ-লীন॥

‘মদিনা’

১

আমার ‘মদিনা’ নাটক
নায়কের প্রথম গান
নৌজোয়ানের গান

মদিনা ! মদিনা ! মদিনা !
তোমায় ছাড়া আর কারও ভালোবাসি না।
‘মদিনা’ ! তব আর একটা নাম কি
কেউ বলে ‘হাস্‌নাহেনা’, আমি তোমায় ‘মদিনা’ বলে ডাকি।
মদিনা ! আমি তোমায় ছাড়া আর কারেও জানি না॥

মদিনা ! তুমি রইবে চিরদিন মোর ঘরে এসে
তোমায় আমায় মিলন হবে ভালোবেসে।
‘মদিনা !’ আমার ছেলে দুটির ডাক নাম ‘সানি’ ও ‘নিনি’
ওরা দুটি ভাই,
‘সানি’ ও ‘নিনি’রে যেন আপন ছেলের মতো ভালোবেসো
এই আমি চাই।
আমি নওজোয়ান, আমি কবি সুন্দর, সুন্দরের পূজারী,
আমায় ভালোবেসে বাংলার সব নরনারী !
আমার কথার ফুলে ‘মদিনা’
তোমার গানের ডালা সাজাই।
মদিনা ! মদিনা ! মদিনা !
তোমায় ছাড় আর কারেও ভালোবাসি না॥’[১]

২

আমার ‘মদিনা’, নাটকের মডার্ন গান,
(মদিনা নিজে এটি গাইছে)

আমি ‘মদিনা’ মহারাজার মেয়ে, সকলের জানা আছে।
নৌজোয়ান ! তুমি কার ছেলে তুমি কেন এলে মোর কাছে॥

---

১ গানটি নতুন ‘মদিনা’ নাটকের জন্য রচিত।

আমি গান গাইতে জানি
তুমি কি গান লিখতে জানো ?
তাহলে তুমি বাড়ি গিয়ে
আমার তরে অনেক গান লিখে আনো ;
তাহলে তোমায় মালা গেঁথে দিব
মোর গুল–বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে ফুলের গাছে ॥

তুমি মহারাজার, বাদশার ছেলে হও,
তাহলে আমার ঘরে এসে কথা কও।
তব ভালো নাম কি হে কবি
তাহলে আঁক্‌ব তুমি[২] তোমার ছবি
আমি পর্দানশিন কুমারী, মোর এখনো কেউ নাহি যাচে ॥

৩

আমার 'মদিনা' নাটকের আধুনিক গান

'মদিনা !' 'মদিনা !' কেন তোমার এত অহঙ্কার ?
তোমার বাড়িতে আমি কভু আসব না আর।
মোরে বাংলার সকলে ভালোবাসে
সেই গৌরবে এসেছিলাম তোমার কাছে।[৩]

৪

আমার 'মদিনা' নাটকের নাচের গান
(নর্তকী তরুণীরা গাইবে)

আরক্ত কিংশুক কাঁপে মালতীর বক্ষ ভরি
চন্দ্রের অমৃত–স্পর্শে উঠিতেছে শিহরি শিহরি ॥

---

২. 'তুমি'র স্থলে সম্ভবত 'আমি' হবে। এটিও 'মদিনা'র জন্য লেখা নতুন গান পাণ্ডুলিপির এক কোণে কবি লিখেছেন : কুমারী অনিমা চৌধুরী গাইবে।

৩. অসম্পন্ন এই গানটি পাণ্ডুলিপিতে আগাগোড়া কাটা, আছে, মনে হয় ফুল নাটকে এটি সংকলন করতে চাননি কবি।

নীরব কোকিলের গুঞ্জন
চৈত্র পূর্ণিমা রাত্রি, বাড়িয়াছে বক্ষের স্পন্দন।
মোদের নাচের নূপুরের ছন্দ কভু চপল কভু মৃদু-মন্দ,
বসন্ত-উৎসব-সজ্জা অন্তরাল হতে মৃদু ভাষে
সুন্দর গুঞ্জন-ধ্বনি কেন ভেসে আসে।
মমতার মধু-বিন্দু ক্ষরিল, মোরা মধু খেয়ে বলিলাম—আহা মরি॥

ধরণীর অঙ্গ হতে বাসরের সজ্জা পড়ে খুলি
গভীর আনন্দে মোরা চাহি দুটি আঁখি তুলি।
চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি, এল ফিরি
প্রিয়, তুমি কেন চলে গেলে ধীরি ধীরি।
তুমি ফিরে এলে মোরা লভিলাম অমৃতের স্বাদ
চন্দ্রের অমিয়া পান করি॥[৪]

৫

আমার 'মদিনা' নাটকের নাচের গান
(নর্তকী তরুণী গাইবে)

চৈত্র পূর্ণিমা রাত্রি, মাধবী-কানন মধুক্ষরা
মধুর আনন্দ-উল্লাসে রাত্রে ভাসে বসুন্ধরা॥

মুকুল-সৌগন্ধ ভারে দখিনা পবন
নৃত্যের ছন্দে চলে মর্মরিয়া বেণু-বন।
তটিনী ঊর্মির মর্ম নিয়া
শত ভঙ্গে চন্দ্রে নিবেদিয়া
দুর্নিবার প্রেমোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ-কল-গীতে ভরা॥

মধুর পূর্ণিমা নিশি, পূর্ণপাত্র শিরাজি হস্তে যেন সাকি,
জ্যোৎস্নার মদির স্বপ্নে মুকুলিত মাধবীর আঁখি।
গোলাপের স্নিগ্ধগন্ধে অস্থির অন্তর,
আজি রাত্রে হাসিছে সমাহিত প্রসন্ন সুন্দর।
পরিতৃপ্ত চকোরের রুদ্ধ-কণ্ঠ[৫] লভিতে চন্দ্রের
পান করি শারাব গেলাস-ভরা॥

---

৪. 'মদিনা' নাটকের জন্য লেখা নতুন গান, অপ্রকাশিত।
৫. সম্ভবত এখানে কবি আরো কিছু শব্দ যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এটিও অপ্রকাশিত।

৬
আমার 'মদিনা' নাটকের জন্য আধুনিক গান
(আমি গাইব)[৬]
জিলফ–তেতালা

একা[৭] ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে
ভ্রমর–কুন্তলা কিশোরী ?
আধেক অঙ্গ জলে, রূপের লহর তোলে[৮]
সে ফুল দেখে বেভুল সিনান বিসরি ॥

একি নতুন ছবি[৯], আঁখিতে দেখি ভুল,
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে ঝিলের জলে[১০] অরুণ গাগরি ॥

ঝিলের নিথর জলে আবেশে[১১] ঢলঢল গলে পড়ে সে শত তরঙ্গে,
শারদ আকাশে দলে দলে আসে মেঘ–বলাকা খেলিতে সঙ্গে !
আলোক–মঞ্জরি প্রভাত–বেলা
বিকশি জলে কি গো করিছে খেলা ?
আবেশে বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি ॥

৭
আমার 'মদিনা' নাটকে ...
(শৈল দেবী গাইবে)
প্রতাপ বরালী—আদ্ধা কাওয়ালি

নিশি–রাতে রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বাদল–নূপুর
বাজিল ঘুমের সাথে সজল মধুর ॥

---

৬. শচীন দেব বর্মণ 'গাইবে' লিখে কেটে দিয়ে লিখেছেন 'আমি গাইব'।
৭. সুপরিচিত এই গানটিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে কবি 'মদিনা' নাটকে স্থান দিয়েছেন 'ভোরের ঝিলের' হয়েছে 'একা ঝিলের'।
৮. পঙক্তিটি নতুন সংযোজিত।
৯. ছিল : 'একি নতুন লীলা'।
১০. 'আকাশ–গাঙে' হয়েছে 'ঝিলের জলে'।
১১. 'আবেশে' শব্দটি নতুন যোজন।

দেয়া গরজে বিজলি চমকে,
জাগাইল কে মোর ঘুমন্ত প্রিয়তমকে।[১২]
আধো ঘুমে[১৩] 'কে এল' 'কে এল' বলে ডাকিছে ময়ূর॥

দ্বার খুলি পড়শি কৃষ্ণা মেয়ে আছে চেয়ে[১৪]
মেঘের পানে আছে চেয়ে।
কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘ্‌লা আকাশ না ঐ মেঘ্‌লা মেয়ে?
ধায় নদীজল মহাসাগরের পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে,
জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ ভারাতুর॥

৮
আমার 'মদিনা' নাটকে ...
(শৈল দেবী)
ঠুমরি—তেতালা

মহুয়াবনে আধো নিশীথ রাতে বেণুকা বাজায়ে
ডাকে গো মোরে কোন বিরহী।
সে মানা মানে না, সখি সে কি জানে না
আমি ভবনের বধূ বন-বালিকা নহি॥

বন-কেতকী বলে, তারে চাতকী জানে
তাই কাঁদিয়া মরে চেয়ে মেঘের পানে।
বলে যমুনার জল, ওর ডাক সে যে ছল
তাই রোদনের স্রোত হয়ে অকূলে বহি॥[১৫]

---

১২. 'আধো ঘুমে'র স্থলে 'আধো ঘুমঘোরে চিনিতে নারি ওরে।'
১৩. 'আছে চেয়ে' অংশটি সংযোজিত।
১৪. গানটি নতুন এবং অপ্রকাশিত।
১৫. গানটি নতুন এবং অপ্রকাশিত।

৯

আমার 'মদিনা' নাটকের গান
(শৈল দেবী গাইবে)
নৌরোচকা—তেতালা

বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে।

[সম্পূর্ণ গানটি আছে, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই।]

১০

আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
আধুনিক গান
কুমারী ইলা ঘোষ

আবার ভালোবাসার সাধ জাগে।
সেই পুরাতন চাঁদ আজি নতুন লাগে মধুর লাগে॥

যে ফুল দলিয়াছি নিঠুর পায়ে
সাধিয়া তারে বুকে জড়ায়ে[১৬]
উদাসীন হিয়া হায় রেঙে ওঠে অবেলায়
সোনার গোধূলি-রাগে॥

আবার ফাগুন-সমীরণ[১৭] কেন বহে
আমার ভুবন ভরি বেজে[১৮] ওঠে বাঁশরি অসীম বিরহে।
তপোবনের বুকে ঝর্নার সম
কে এলে সহসা নিরুপম,[১৯]
তোমার নূপুর-ধ্বনি প্রাণে ওঠে অনুরণি
সহসা কে এলে প্রিয়তম আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে
সহসা রাঙাইলে কুঙ্কুম-ফাগে॥[২০]

---

১৬. এই পঙক্তিটি ছিল : 'সেই পুরাতন চাঁদ আমার চোখে আজ নূতন লাগে।'
১৭. ছিল : 'সাধ যায় ধরি তারে বক্ষে ছড়ায়ে।'
১৮. ছিল : 'সমীর।'
১৯. 'বেজে' স্থলে 'কেঁদে' ছিল।
২০. ছিল : 'কে এল সহসা হে প্রিয়তম।'

১১

এস এস বন-ঝরনা উচ্ছল চল ঝরনা।
সর্পিল ভঙ্গে লুটায়ে তরঙ্গে
ফেন-শুভ্র ওড়না॥

পাষাণ জাগায়ে এস নির্ঝরিণী
এস যৌবন-চঞ্চলা জল-হরিণী
মরু-তৃষিতের প্রাণে ঢালো ধারাজল
শ্যাম-মেঘ বরণা॥

এস বুনো পথ বন বেয়ে সুমধুর গান গেয়ে
গভীর অরণ্যের মৌন-ব্রত ভেঙে পাহাড়ি মেয়ে
নৃত্যপরা পায়ে ছন্দ আনো
আনন্দ আনো মৃত প্রাণ জাগানো।
অনাবিল হাসির ঝরা ফুল ছড়ায়ে
এস মঞ্জু মনোহরণা॥[২১]

১২

আমার 'মদিনা' নাটকের আধুনিক গান
(নৌজোয়ান)

ইরানের রূপ-মহলের শাহজাদি শিরি ! জাগো।
জাগো শিরি
'প্রিয় জাগো' বলে তোমার প্রিয়তম
ডাকে শোনো আগে রাতে ধীরে ধীরে॥[২২]
(তুমি) ধরা দিবে বলেছিলে বে-দরদী
(যদি) পাহাড়ি কাটিয়া আনিতে পার নদী।[২৩]

---

২১. শেষের তিনটি চরণ সংযোজিত।

২২. পাণ্ডুলিপির প্রথমে লিখেছেন 'শৈলজানন্দের বিপর্যয় নাটকে দিব', কেটে দিয়ে পরে লিখেছেন, 'আমার মদিনা' নাটকের গান'—এটিও কেটে দিয়ে তলায় লিখেছেন, 'আমার আলেয়া নাটকে দিব' পাশে লিখেছেন 'প্রমীলা দেবী গাইবে নাচবে'। সুতরাং ইচ্ছে করলে 'মদিনা' থেকে গানটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। অপ্রকাশিত নতুন গান বলে আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

২৩. বহুল পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এই গানটির মূল চরণ ছিল এইরকম :

হেরো গো শিলায় আজি উঠিয়াছে ঢেউ
(সেথা) তব মুখ ছাড়া নাহি আর কেউ,
প্রেমের পরশে যেন মোমের পুতুল হয়েছে পাষাণ গিরি॥

গলিল পাষাণ, আমি তোমার প্রিয়তম ফিরে এলাম বিরহী বিবাগী
তোমার দেখার লাগি
তুমি আমার প্রিয়তমা হও আমার পানে চাহ ফিরি
এস শিরি ! এস শিরি॥[২৪]

১৩

আমার 'মদিনা' নাটকে
(শৈল দেবী গাইবে)

মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে এ রূপকুমার কবি নৌজোয়ান।
মোর ঘুম যবে ভাঙিলে প্রিয়তম, উঠিল পূর্ণিমা চাঁদ
জ্যোৎস্নায় হাসিল আসমান॥

আমি 'মদিনা' হেরেমের নন্দিনী যে
আছি প্রাসাদে আছি বন্দিনী যে,
ভেবেছিনু তুমি শুধু রূপের পাগল
যদি সমান ভালোবেসে থাকো
তাহলে আমায় শিখাও এসে তোমার গান॥

তুমি অনেক ছবি এঁকেছ যে মম, মোরে দিলে যে মধু।
সেই মধু চেয়ে সেই মধু বুকে লয়ে বলি,
ফিরে এস ফিরে এস বঁধু।
কেন গান গেয়ে ফির 'মদিনা' 'মদিনা' কহি,
চলে গেছে বিষাদের বিলাপ
ডাঙাও এসে মোর অভিমান॥[২৫]

'প্রিয়া জাগো' বলে ফরহাদ ডাকে শোনো
আধো রাতে ধীরি ধীরি।

২৪. ছিল : 'যদি পাহাড় কাটিয়া আনিতে পারে সে নদী।'

২৫. শেষের চারটি চরণ নতুন সংযোজন। মূলে ছিল :

১৪

আমার 'মদিনা' নাটকের গান

'শৈল দেবী', কুমারী ইলা ঘোষ, নমিতা ঘোষ (বুলা), মন্টু গাইবে

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেল-ফুল
ঝরায়ে দোলন-চাঁপা বকুল[২৬]
দুলায়ে মেঘলা চাঁচর-চুল
চপল চোখে কাজল মেখে আসিলে কে॥

ছিটিয়ে জল বাজায়ে কে মেঘের মাদল[২৭]
একা ঘরে বিজলিতে এমন হাসি হাসিলে কে॥

এলে কি গো দুরন্ত মোর ঝোড়ো হাওয়া
চির-বিরহী[২৮] প্রিয় মধুর পথ-চাওয়া
হৃদয়ে মোর দোলা লাগে
ঝুলনেরই আবেশ জাগে
ভুলে যাওয়া আমারে আবার[২৯]
ভালোবাসিলে কে॥

১৫

আমার 'মদিনা' নাটকে ইলা ঘোষ গাইবে

('মডার্ন গান, কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে')

বেণুকা—তোতালি

বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া-বনে।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে॥

গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না বলে
যে প্রেমিক মরেছিল তোমার পাষাণ-প্রতিমার তলে,
সেই বিরহী রোদন যে গো উঠিছে ভুবন ঘিরি॥

২৬. 'মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে এস রূপকুমার' গানটির প্রথম চরণের এই অংশটুকু ছাড়া আর কোথাও কোনো মিল নেই। সুতরাং এটি নতুন গান।
২৭. এই চরণটি নতুন সংযোজন।
২৮. ছিল : 'বাজায়ে মেঘের মাদল/ভাঙালে ঘুম ছিটিয়ে জল',
২৯. ছিল : 'চির-নিঠুর'

বলে, আয় সখি, সে দুরন্তে সখি[৩০]
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ওকি?
সে কি ভুলিতে দেবে না সারা জীবনে॥ [৩১]

সখি মন্দ[৩২] ছিল তার তীর ধনুক মধুর[৩৩]
বাজে এবার সুমধুর তার বেণুকার সুর[৩৪]
সখি কেন সে বন-বিলাসী
আমার ঘরের পাশে বাজায় বাঁশি
আছে আরো কত দেশ কত নারী ভুবনে॥

[কাহিনী ও পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রাখতে পূর্ব-লিখিত গানে বহু শব্দ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে তেমন কিছু শব্দ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক. ইলা ঘোষের নাম দুবার লেখা হয়েছে, অস্থিরতার পরিচয়?]

১৬
আমার 'মদিনা' নাটকের গান
(শৈল দেবী ও ইলা গাইবে)

আনো গোলাপ-পানি আনো আতরদানি গুল্‌বাগে
সহেলি গো খুব ভালো লাগে, সুমধুর লাগে॥ [৩৫]

বেদুইনি ছেলের বাঁশি কারে ডাকে
হেসে হেসে অনুরাগে॥ [৩৬]

মরুযাত্রীদের উটের সারি
যেমন চাহে তৃষ্ণার বারি
তেমনি মম পিয়াসী পরান
যেন কার প্রেম-অমৃত বারি মাগে॥

---

৩০. ছিল : 'ফেলে-যাওয়া বাসি মালায়'
৩১. মূলে ছিল : 'বলে আয় সে দুরন্তে সখি'
৩২. 'সে কি ভুলিতে তারে দেবে না জীবনে'
৩৩. ছিল : 'সখি, ভাল ছিল তার তীর-ধনুক নিঠুর'
৩৪. ছিল : 'বাজে আরো সকরুণ তার বেণুকার সুর'
৩৫. ছিল : 'সহেলি গো কিছু ভালো নাহি লাগে'
৩৬. ছিল : 'কেঁদে অনুরাগে'

চাঁদের পিয়ালাতে জোছনা-শিরাজি ঝরে যায়
আমারি হৃদয় সুমধুর সে মধু পায়।[৩৭]
হায় হায় ! বাদাম গাছের আঁধার বনে
মধুর[৩৮] নিশ্বাস ওঠে বুলবুলির শিসের গণে।
বিরহী মোদের কোথায় হাসে[৩৯] কোন মদিনাতে
ফোরাত নদীর স্রোতের[৪০] সম বুকে ঢেউ জাগে॥

১৭

আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়াব
(শেল দেবী ও ইলা গাইবে)

দোলন-চাঁপা বনে দোলে দোল-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।

[গানটিতে কোনো পরিবর্তন নেই সুতরাং উদ্ধৃত করলাম না।]

১৮

আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
(আধুনিক গান, কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে)

তোমার গানের চেয়ে তোমায় ভালো লাগে আরো
(মোর) ব্যথায় আস প্রিয় হয়ে, কথায় যখন হারো।
(তব) সুর যবে দূর যায় চলে
তখন আস মোর আঁখির জলে
ভালোবাসায় যে মধু দাও বধুঁ
তা কি ভাষায় দিতে পারো॥

আমায় যখন সাজাও সুরে ছন্দ অলঙ্কারে
তখন তুমি থাকো যেন কোন গগনের পারে।

---

৩৭. ছিল : 'আমারি হৃদয় কেন গোসে মধু নাহি পায়।'
৩৮. 'মধুর' শব্দটি সংযোজিত
৩৯. 'হাসে'র স্থলে ছিল 'কাঁদে'
৪০. 'রোদন' স্থলে 'স্রোতের' হয়েছে।

গান থামিয়ে একলা ঘরে
আস যখন আমার তরে
সেই ত আমার আনন্দ, তাহা ছন্দে দিতে পারো।[৪১]

১৯

আমার 'মদিনা' নাটকে ও রেডিওতে, রেকর্ড কোম্পানিতে সিনেমায় গাওয়াব 'রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায় রুমঝুমি' গানটিতে একটি পরিবর্তন আছে। শেষ দুই চরণের উপরে এবং 'পাড়ি দেয় বনপারে বাঁশি রাখালিয়া"র পর 'বউ কথা কও কোকিল প্যাপিয়া' পংক্তিটি বেশি আছে। পাণ্ডুলিপিতে কবি লিখেছেন : (নাচের গান রমলা গাইবে নাচবে, প্রমীলা + ত্রিবেদী + রুমা), শেষোক্ত দুই মহিলা শিল্পীর কথাও কবি সম্ভবত ভেবেছিলাম।

২০
আমার 'মদিনা' নাটকে শৈল দেবী গাইবে
(আধুনিক গান)

(বঁধু) জাগাইলে এ কোন্ পরম সুন্দরের তৃষা।
(মোর) হাসিয়া দিন যায়, পোহায় জাগরণে নিশা।।

এ ভীরু ফুলকলি জাগাও বঁধু
তোমার বুকে ছিল এ মধু
আমি পরম আনন্দ চাই
দিও না মিলনে বেদনা মিশা।।[৪২]

২১
আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়ার
(শৈল দেবী গাইবে)
সন্ধ্যামালতী—আদ্ধা কাওয়ালি

'শোনো ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী'

দু একটি শব্দ ছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন না থাকায় গানটি উদ্ধৃত করলাম না।

---

৪১. গানটি 'মদিনা'র জন্য লিখিত এবং অপ্রকাশিত।
৪২. গানটি নতুন এবং অপ্রকাশিত।

২২

আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে

'মোমতাজ ! মোমতাজ। তোমার তাজমহল'

[গানটিতে দুটি শব্দের পরিবর্তন আছে, ক. 'বৃন্দাবনের' স্থলে আছে 'ফিরদৌসের' এবং খ. 'প্রেমিক শাজাহানে'র স্থলে আছে প্রেমিক বাদশাহ শাহজাহানে।']

২৩

আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে

'নূরজাহান ! নূরজাহান !'

[গানটিতে 'সেলিম' স্থলে 'সে যে' বসেছে আর সব ঠিক আছে।]

২৪

আমার 'মদিনা' নাটকে সিনেমায় গাওয়াব
মাঢ়-মিশ্র—কার্ফা
(কুমারী অঞ্জলি দাশগুপ্তা গাইবে)

ঘরে যদি এলে প্রিয়
নাও একটি খোঁপার ফুল।
আমার চোখের দিকে চেয়ে
ভেঙে দাও মনের ভুল॥

অধর কোণের ঈষৎ হাসির আলোকে
বাড়িয়ে দাও আমার গহন কালোকে
যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে
দুলিয়ে যেয়ো দুল॥

একটি কথা কয়ে যেয়ো, একটি নমস্কার,
সেই কথাটি গানের সুরে গাইব বারবার।

হাত ধরে মোর বন্ধু ভুলো
তোমার মনের সকল ভুল॥[৪৩]

২৫
আমার 'মদিনা' নাটকে সিনেমায় গাওয়াব
(নাচের গান, রমা ও রমলা গাইবে নাচবে)
ভৈরবী পিলু-কার্ফা

['আধো আধো বোল' কোনো পরিবর্তন নেই।]

২৬
আমার 'মদিনা' থেকেও সিনেমায় গাওয়াব
(নাচের গান রমা রমলা গাইবে নাচবে)
বেহাগ খাম্বাজ পিলু

['নাই পরিলে নোটন-খোঁপায়'—গানটিতে কোনো পরিবর্তন নেই।]

২৭
আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
আমি গাইব
সাহানা-বাহার—কাওয়ালি

['নাই চঞ্চল-লীলায়িত দেহ চির-চেনা' কোনো পরিবর্তন নেই]

২৮
আমার 'মদিনা' নাটকে শৈল দেবী গাইবে
ভৈরবী-কার্ফা

['আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে প্রিয়তম'—কোনো পরিবর্তন নেই।]

---

৪৩. গানটি আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

২৯

আমার 'মদিনা' নাটকে দিব
কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে
পিলু খাম্বাজ-কার্ফা

['আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে প্রিয়তম'—কোনো পরিবর্তন নেই।]

৩০

আমার 'মদিনা' নাটকের গান
(নাচের গান রমলা নাচবে গাইবে)
সিন্ধুড়া-কাওয়ালি

['কার মঞ্জীর রিনি ঝিনি বাজে—চিনি চিনি'—কোনো পরিবর্তন নেই।]

৩১

আমার 'মদিনা' নাটকের আধুনিক গান
(কুমারী অনিমা দাশগুপ্তা গাইবে)
কানাড়া—একতালা

['নিরুদ্দেশের পথে আমি' গানটির শেষ চার পংক্তিতে যে সামান্য পরিবর্তন আছে আমি কেবল সেটুকু তুলে দিলাম :

তোমার আমার পাওয়ার আশায় আবার আমি এলাম হেসে
কাছে কাছে ছিলাম বলে
দূরে তুমি যাওনি চলে
বাহির ছেড়ে আজ পেয়েছি তোমার অন্তরেতে ঠাঁই॥]

৩২

আমার 'মদিনা' নাটকের গান
(হাসি গান/নাচের গান, প্রমীলা ত্রিবেদী গাইবে, নাচবে)

['বল বল সখি বল, ওরে, সরে যেতে বল'—গানটির শেষ থেকে তৃতীয় চরণে 'জয়' স্থলে 'চাও' ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই।]

৩৩

আমার 'মদিনা'র গান

(কুমারী ইলা ঘোষ গাইবে)

ভৈরবী—দাদরা

নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না
দীপ নিভিতে দাও।
নিবুনিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
সারা রাত ঘরে থেকে যাও॥[৪৪]

আজও শুকায়নি মালার গোলাপ
আশা–ময়ূরী মেলেনি কলাপ
বাতাসে এখনো জড়ানো প্রলাপ
বারেক ফিরে চাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

ঘুমে ঢলে পড়তে দিও না অলস–আঁখি
ক্লান্ত করুণ কায়,
সুদূর নহবতে সানাই বাজিতে দাও
উদাস যোগিয়ায়।[৪৫]
হে প্রিয় প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ফুল ঝরিয়া মরিতে চায়,
তোমার হাসির আভায় দিক রাঙিয়ে দাও।[৪৬]
দীপ নিভিতে দাও॥

৩৪

আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়াব

পিলু বারোয়াঁ মিশ্র—দাদরা

আমার গানের মালা আমি
করব তারে[৪৭] দান।

---

৪৪. ছিল : 'ক্ষণিক থাকিয়া যাও।'

৪৫. চরণ চারটি ছিল এইরকম : 'ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি/ক্লান্ত করুণ কায়,সুদূর নহবতে বাঁশরি বাজিতে দাও/উদাস যোগিয়ায়।'

৪৬. ছিল : 'তব হাসির আভায় তরুণ প্রায়/দিক রাঙিয়ে যাও॥'

৪৭. 'কারে'

মালার ফুলে জড়িয়ে আছে
মোর করুণ অভিমান॥

চোখে সজল[৪৮] কাজল-লেখা
কণ্ঠে ডাকে কুহু-কেকা
কপোল যার অশ্রু রেখা
একা যাহার প্রাণ।
মালা করব তারে দান।
শাখায় ছিল কাঁটার বেদন
মালায় ছিল সূচির জ্বালা,
কণ্ঠে দিতে খুশি হই আমি
মোর আনন্দের মালা।[৪৯]
বিরহে মোর প্রেম-আরতি
জ্যোতির্লোকের অরুন্ধতী
তার তরে মোর এই গান
মালা মোর করনু তারে দান॥[৫০]

৩৫

আমার 'মদিনা' নাটকের গান
নৌজোয়ান কবি গাইবে
তিলক-কামোদ-রূপক

['ভালোবাসার ছলে আমায় তোমার নামে গান গাওয়ালে'—কোনো পরিবর্তন না থাকায় উদ্ধৃত দিলাম না।]

৩৬

আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়াব
কাজরী-কার্ফা

সখি বাঁধ লো[৫১] ঝুলনিয়া।/নামিল মেঘলা[৫২] বাদরিয়া।
চলো কদম তমাল তলে গাহি কাজরী। চললো গোরী শ্যামলিয়া॥

---

৪৮. 'কণ্ঠে দিতে সহসা না পাই/অভিশাপের মালা/এই অভিশাপের মালা।'
৪৯. 'বিরহে যার প্রেম-আরতি/আঁধার লোকের অরুন্ধতী/নাম না-জানা সেই তপতী/তার তরে এই গান। মালা করনু তারে দান॥'
৫০. 'বাঁধল' শব্দটি দুবার ছিল।
৫১. 'মেঘলা'র পর 'মোর' শব্দটি ছিল।
৫২. ছিল : 'ঝমাঝম বৃষ্টি—নূপুর পায়।'

বাদল পরীরা নাচে গগন-আঙিনায়
রিমিঝিম্ রিমিঝিম্ বৃষ্টি-নূপুর পায়।[৫৩] এ হিয়া মেঘ হেরিয়া ওঠে মাতিয়া॥

মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলি-জরিন্ ফিতা,
গাহিব দুলে দুলে শাওন-গীতি কবিতা।
শুনিয়া বঁধুর বাঁশি-বন-হরিণী চকিতা,
দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা,[৫৪] / কাজলে মাজি লহ আঁখিয়া॥

৩৭

কাফি-সিন্ধু-কাহারবা

['দুরন্ত বায়ু পুরবৈয়া বহে অধীর আনন্দ'—কোনো পরিবর্তন নেই।]

৩৮

আমার 'মদিনা' নাটকে ও সিনেমায় গাওয়াব
আরবি নৃত্যের সুর—কাহারবা (কার্ফা)

['শুকনো পাতার নূপুর পায়ে' গানটিতে 'পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া-দুলিয়া/ধূলি-ধূসর কায়' এর বদলে আছে 'আনন্দিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া। নূপুর দিয়া পায়।' এ ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন নেই।]

৩৯

আমার 'মদিনা' নাটকে ও সিনেমায় গাওয়াব
পিলু মিশ্র-দাদরা

['গত রজনীর কথা পড়ে মনে' গানটির প্রথম দুই পংক্তি এবং শেষ পংক্তিতে কিছু পরিবর্তন ছাড়া বাকিটুকু অপরিবর্তিত আছে। প্রথম দুটি চরণের পরিবর্তিত রূপ এই : 'গত রজনীর কথা মনে পড়ে মনে।'
'রজনী-গন্ধা ফুলের মদির গন্ধে।' এবং শেষ চরণটি 'কাঁদিছে নন্দন আজি নিরানন্দে'র স্থলে হয়েছে 'হাসিছে নন্দন আজি পরমানন্দে।']

---

৫৩. 'দয়িতা'র পর এই চরণটি ছিল : 'পরো মেঘ-নীল শাড়ি ধানি রঙের চুনরিয়া।'
৫৪. প্রথম চরণটি ছাড়া অবশিষ্ট অংশটি নতুন করে লেখা, সুতরাং নাটকে নতুন অপ্রকাশিত গান বলা যায়।

৪০
আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়াব
কুমারী অমিয়া দাশগুপ্তা গাইবে
ভীমপলশ্রী মিশ্র—কাহারবা

['পলাশ ফুলের মউ গেলাস ভরি" গানটির চতুর্থ চরণ 'আঁচল' শব্দের পর 'দিব' শব্দটি নেই এবং ষষ্ঠ চরণে 'সজল ছবি', হয়েছে 'মধুর ছবি'—বাদ বাকি অপরিবর্তিত।]

৪১
আমার 'মদিনা' নাটক ও সিনেমায় গাওয়াব
খাড়-খাম্বাজ-মিশ্র-দাদ্‌রা

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে।
বিবাহের বাজল বাঁশি আজি মোর নৌজোয়ানি জীবনে॥

নুতন করে আমার বাঁচিবার সাধ জাগে
সুন্দর লাগে ধরা মোর আনন্দিত নয়নে॥[৫৫]

৪২
আমার 'মদিনা' নাটকে ও সিনেমায় গাওয়াব
গৌড় সারং—কাওয়ালি

['রেশ্‌মি চুড়ির তালে কৃষ্ণচূড়ার ডালে'—গানটিতে কোনো পরিবর্তন নেই। পাণ্ডুলিপির কিনারায় লেখা 'নিতাই ঘটক' গাইবে।]

৪৩
সিন্ধুমিশ্র—খেমটা

[শেষ চরণের উপরে 'গেয়ো না গুন্‌গুন্‌' চরণটির বদলে আছে 'গাও সুমধুর গুন্‌গুন্‌' সুর প্রেমে দুলে দুলে।' এছাড়া আর কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই।]

মদিনার পাণ্ডুলিপি এখানেই শেষ হয়েছে।

৫৫

চলচ্চিত্রের গান

‘ধ্রুব’

১

[সুনীতির গান]

জাগো ব্যথার ঠাকুর, ব্যথার ঠাকুর,
জাগো হে পাষাণ দেবতা !
তুমি না হরিলে হরি,
কে হরিবে প্রাণের ব্যথা ॥

তুমি সব হরিলে,
ওহে নিখিলহরণ, সব হরিলে।
আমার যা-কিছু ছিল প্রিয়তম
হরি হে, সে-সব হরিয়া নিলে।
আমি হয়েছি পথের ভিখারিনি।
রাজার রানি নেমেছি ধুলায়
হয়েছি পথের ভিখারিনি।
তাই শাপ দিই বড় দুখে,
তুমি এই দুখিনীর সন্তান হয়ে
আসিবে আমার বুকে।
তুমি আমার বক্ষে হাসিবে কাঁদিবে,
খেলিবে, কহিবে কথা।
ব্রজের গোপাল ! সেদিন ভুলিব
আমার প্রাণের ব্যথা ॥

২

[সুনীতির গীত]

অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর
বহিছে তরলতর পুবালি পবন।

বিজলি-জ্বালার মালা পরিয়া কে মেঘবালা
কাঁদিছে আমারি মতো বিষাদ-মগন॥

ভীরু এ মন-মৃগ আলয় খুঁজিছে ফিরে,
জড়ায়ে ধরিছে লতা সভয়ে বনস্পতিরে,
গগনে মেলিয়া শাখা বন-উপবন॥

৩

[সুনীতির গীত]

চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহ-তারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটিরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত-চিত সচকিত শ্রবণ॥

৪

[ধ্রুবের গীত]

ধুলার ঠাকুর, ধুলার ঠাকুর!
তোমার সাথে করব খেলা।
ধুলার আসন, ধুলার ভূষণ,
ধূলি নিয়ে হেলাফেলা॥

অনেক দূরে গহন বনে
খেলব দুজন আপন মনে,
খেলার নেশায় সকাল কখন
হয়ে যাবে বিকালবেলা॥

খুঁজতে মাতা আসলে রাতে
দু'জন গিয়ে ধরব হাতে,
বলব, ঠাকুর আছেন সাথে,
ভয় কি গো মা, নই একেলা॥

৫

[ধ্রুবের গীত]

হরি–নামের সুধায় ক্ষুধা–তৃষ্ণা নিবারি।
হরি–নাম বসন হরি–নাম ভূষণ
আমি হরি–প্রেম ভিখারি॥

পরিয়া শ্রীহরি–নামের মালা
ভুলিব পিতার অনাদর–জ্বালা,
হরি–নামের সুধায় ক্ষুধা–তৃষ্ণা নিবারি॥

যাব বনে মা'র সনে
শ্রীহরিরে আঁখি–নীরে কবো প্রাণের ব্যথা।
আমারে আর মোর জননীরে হেন
দীনবন্ধু এত দুখ দাও কেন,
করুণা–সিন্ধু তুমি দুখ–হারী॥

৬

[ধ্রুবের গীত]

আমি রাজার কুমার পথ–ভোলা
আমি পথ–ভোলা আমি পথ–ভোলা
দখিন হাওয়া দাও দোলা॥

দাও দোলা দাও দোলা
আজি আমার প্রাণের ও মনের
সকল দ্বার খোলা॥

তরুলতা বনের পাখি তোদের ডাকি
আয় শুনে যা,
শোন্ ঝরঝর ঝর্নাধারা
রাজার দুলাল আমি, শোন্ রে ফুল
নদী উতলা॥

৭

[মুনি-পত্নীর গীত]

হে দুখহরণ ভক্তের শরণ
অনাথ-তারণ হে বিধাতা !
তুমি ধ্রুব জ্যোতি চাহ যার পানে
নিমেষে সে ছুটে যায় তব সন্ধানে,
বৃথা তারে সংসার পিছু ডাকে বারবার
হে মুক্তিদাতা, হে বন্ধু-ত্রাতা ॥

৮

[মুনি-পত্নীর গীত]

শিশু নটবর নেচে নেচে যায়
চল-চরণে ধূলি-মাখা গায়।
ননীর পুতুল আদুল তনু
চলিতে পথে ফিরে ফিরে চায় ॥

তাহারি পায়ের নাচের তালে
ফোটে পুলকে কুসুম ডালে,
গ্রহ-তারা সেই নাচের ঘোরে
ঘুরিয়া মরে তারি রাঙা পায় ॥

৯

[মুনি-পত্নীর গীত]

মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে
নওল-কিশোর মদন-মোহন।
চারু ত্রিভঙ্গিম ঠাম বঙ্কিম,
বন্দে পদ কোটিচন্দ্র তপন ॥

বৃষ্টিধারা-সম নব নবতম
সৃষ্টি পড়ে ঝরি সে-নাচে নিরুপম,

রতন-মঞ্জীর বাজে রুমঝুম,
ঘোরে গ্রহ-তারা ঘিরি শ্রীচরণ॥

১০

[নারদের গান]

গহন বনে শ্রীহরি-নামের
মোহন বাঁশি কে বাজায়।
ভুবন ভরি সেই সুরেরই
সুরধুনী বয়ে যায়॥

সেই নামেরই বাঁশির সুরে
বনে পূজার কুসুম ঝুরে,
সেই নামেরই নামাবলী
গ্রহ-তারা আকাশে জুড়ে।
অন্তবিহীন সে-সঙ্গীতের
সুর-স্রোতে কে ভাসবি আয়॥

১১

[ধ্রুবের গীত]

দাও দেখা দাও দেখা
হরি পদ্মপলাশ-লোচন।
এত কাঁদি ডাকি তবু শোনো না কি
হে প্রভু ব্যথা-বিমোচন॥

শুনিয়াছি হরি জননীর কাছে
তুমি আছ যার তার সব আছে,
তুমি অনাথের নাথ।
কেহ নাই যার তুমি আছ তার
অনাথের নাথ !
আমি অনাথ বালক, জগৎ-পালক !
দাও শ্রীচরণে শরণ॥

১২

ফুটিল-মানস-মাধব-কুঞ্জে
প্রেম-কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
মাধব তুমি এসো হে
হে মধু-পিয়াসী চপল মধুপ
হৃদে এস হৃদয়েশ হে
নীল মাধব, তুমি এসো হে॥
তুমি আসিলে না বলি, শ্যাম রায়
অভিমানে ফুল লুটায় ধুলায়
নীল মাধব তুমি এসো হে॥

বনমালী, বনে বনফুল-হার
হায়, শুকাইয়া যায় আঁখিজলে তার
জিয়াইয়া রাখি কত আর।
এসো গোপন পায়ে, চিতচোর।
এসো গোপন পায়ে।
যেমন নবনী চুরি করি খেতে
এসো হে তেমনি গোপন পায়ে
যেমন লুকায়ে অভিসারে যেতে,
এসো শ্যাম সেই মৃদুল পায়ে।
না হয় নূপুর খুলিয়ো
যমুনা থির নীরে বাঁশরির তানে
না হয় লহরী না তুলিয়ো।
যেমন নীরবে ফোটে ফুল,
যেমন নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা-গগন-কূল
এসো তেমনি নীরব পায়ে।
অনুরাগ-ঘষা হরি-চন্দন, শুকায়ে যায়
আর রহিতে নারি, এসো হৃষিকেশ
হে শ্যাম রায়॥

১৩

নারদ- হৃদি-পথে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম।
ধ্রুব- বাঁকা শিখী-সম নয়ন বাঁকা বঙ্কিম ঠাম॥

নারদ– তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে
ধ্রুব– অধরে মুরলী ধরি দাঁড়াল ত্রিভঙ্গে।
নারদ– সোনার গোধূলি যেন নিবিড় সুনীল নভে
পীত ধড়া পরো কালো অঙ্গে (হরি হে)।
ধ্রুব– নীল কপোত–সম চপল চরণ দুটি
নেচে যাক্ অপরূপ ভঙ্গে (হরি হে)।

উভয়ে– যেন নূপুর বাজে
হরি, সেই পায়ে যেন নূপুর বাজে।
বনে নয়, শ্যাম, মন–মাঝে
যেন মঞ্জীর হয়ে বাজে ॥

ঐ চরণে জড়ায়ে পরান আমার
যেন মঞ্জীর হয়ে বাজে ॥

১৪

ফিরে যায় ওরে ফিরে যায়
শূন্য এ বুকে ফিরে আয়।
সন্ধ্যা ঘনায় তুই কোথা হায়
ওরে পাখি মোর নীড়ে আয় ॥

তোরে না হেরিয়া ওরে ধ্রুবতারা
ব্যথার পাথারে কাঁদি পথহারা
তোরে যে হরিল, নিয়ে সে–হরি রে
শূন্য এ মন্দিরে আয় ॥

১৫

নাচো বনমালী করতালি দিয়া
হেলেদুলে ধিয়া তা ধিয়া

মধুর ছন্দে নাচো আনন্দে
আমার প্রাণ নাচাইয়া ॥

একবার নাচো হে
বাঁকা শিখী-পাখা বামে হেলায়
বাঁকা শ্যাম একবার নাচো হে
বাঁকা নয়ন পীত বসন
বনমালা গলে নাচো হে।

এসো ত্রিভঙ্গ ধামে শ্যামরায়
দক্ষিণে বামে ছন্দ নামে
রুমুঝুমু নূপুর পায়।
অলকা তিলক আঁকা শিহর শিখী-পাখা
এসো মন-বন-ছায়ায় ॥

ঐ শুনি তার বাঁশি বাজে
আসে ঐ আসে প্রাণের হরি
কোটি অমল কমল-গন্ধে
আসে দশদিক আমোদিত করি
এল ঐ এল প্রাণের হরি ॥

১৬

উভয়ে— জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর
মদন-মনোহর কাননচারী
গোপী-চন্দন আমোদিত তনু
বনমালী হরি বংশীধারী ॥

ধ্রুব— চাঁচর চিকুরে শোভে শিখী-পাখা
বাঁকা ত্রিভঙ্গিম চারু নয়ন বাঁকা
সুনীতি— ও বাঁকা রূপ যেন মর্মে রহে আঁকা
মনে বিরহ কালা বনবিহারী ॥

সুনীতি– ভক্তি প্রেম প্রীতি তব ও রাঙা পায়
ধ্রুব– নূপুর হয়ে হরি, যেন বাজিয়া যায়,
সুনীতি– জনমে জনমে কৃষ্ণ–কথা গায়
যেন এ দেহ–মন শুক–সারী॥

১৭

কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে মা
আমি মা তোর দুখ ঘুচাব
বসন–ভূষণ দেবো এনে
মা তোর চোখের জল মুছাব॥

তুই হবি মা রাজ–জননী
এনে দেবো রত্ন–মণি,
রাজার আসন আনব ছিনি
তোর সেই আসনে বসাব॥

পাতালপুরী

১

আঁধার ঘরের আলো
ও কালো শশী
আঁধার ঘরের আলো।
কে বলে তোরে কালো
ওই রূপে মন ভুলাল॥

তোরই রূপের মোহে
আমি মরি বিরহে
যত পরান দহে
তত বাসি যে ভাল॥

২

এলোখোঁপায় পরিয়ে দে
পলাশফুলের কুঁড়ি লো
পরিয়ে দে বেলোয়ারি চুড়ি।
কালো-শশী বনে আবার
বাজাল বাঁশরি লো
বাজাল বাঁশরি॥

৩

ও শিকারি মারিস্ না তুই
মানিকজোড়ের একটি হে

সাথী–হারা পাখিটিও
মরিবে বঁধুর বিরহে॥

একা পাখির শাপ লেগে,
(হে) যাবে সুখের ঘর ভেঙে,
পাখি–মারা তীর এসে তোর
বিঁধবে আমার বুকে হে॥

৪

তালপুকুরে তুল্‌ছিল সে
শালুক সুঁজির ফুল রে
শালুক সুঁজির ফুল।
ঢুলুঢুলু চোখে রে তার,
এলোমেলো চুল
(ও তার) এলোমেলো চুল॥

(আমার) হাতের ধনুক রইল হাতে
তীর ছুঁড়তে হয়ে গেল ভুল
ও তার এলোমেলো চুল।
সেই ফুলবিলাসীর তরে আমার
গেল জাতি কুল রে গেল জাতি কুল॥

৫

দুখের সাথী গেলি চলে
কোন সে দেশে বিহানবেলা।
ও তুই মাঠে আছিস্ লুকিয়ে বুঝি
তাই মাটি খুঁড়ে তোরে খুঁজি।
আমায় নিয়ে যা রে, যে দেশে তুই
আমি রইতে নারি আর একেলা॥

৬

ধীরে চলো চরণ টলমল
সখি নতুন মদের নেশা
পিয়েছি বিষ-মেশা,
চল্‌তে পথে উঠি চম্‌কে॥

একি খাওয়াল মুখপোড়া কালো ছোঁড়া
ওঠে অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ছম্‌কে।
গুরুজনের কাছে ঢলে ঢলে পড়ি
গেল কুলমান আমি লাজে মরি।
ও সে কদমতলায়, বাঁশি বাজায়
আড়চোখে চায়,
পেলে একলা পথে আগ্‌লে দাঁড়ায় সে থমকে॥

৭

পু— ফুল ফুটেছে কয়লা-ফেলা
ময়লা টবে ঝুড়িতে
আমি বাউরি হয়ে উড়ে যাব
উড়ে যেমন ঘুড়িতে॥

স্ত্রী— তোর বিরহে ময়লা ছোঁড়া
বুড়ি হলাম কুড়িতে
পুড়ে হলাম কয়লা-পোড়া
আর পারি না পুড়িতে।

পু— চুরি করে নিয়ে যাবে
ডাগর-চোখা ছুঁড়িকে
সিঁড়ি খাদের পাতালপুরীতে॥

স্ত্রী— ঠুন্‌কো মলের কালো শশী
তোরে বাঁধব নাকো
বাঁধব নাকো ঠুন্‌কো কাচের চুড়িতে
রাখব বেঁধে বাজুর জুড়িতে॥

গোরা

ঊষা এল চুপি চুপি
সলাজ নিলাজ অনুরাগে
চাহে ভীরু নববধূ সম
তরুণ অরুণ বুঝি জাগে ৷৷

শুক্‌তারা যেন তার জল–ভরা আঁখি
আনন্দে বেদনায় কাঁপে থাকি থাকি।
সেবার লাগিয়া হাত দুটি
মালার সম পড়ে লুটি
কাহার পরশ রস মাগে ৷৷

নন্দিনী

চোখ গেল চোখ গেল
কেন ডাকিস রে
চোখ গেল পাখি রে
চোখ গেল পাখি।
তোর ও চোখে কাহার চোখ
পড়েছে নাকি রে
চোখ গেল পাখি রে
চোখ গেল পাখি॥

চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে
জানে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে
তার ওষুধ নাই।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় কাহার আঁখি রে
চোখ গেল পাখি রে
চোখ গেল পাখি॥

তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে
বুকে লাগে
চোখ গেল ভুলে রে 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা'
বলে তাই ডাকিস অনুরাগে রে।
ওরে বন–পাপিয়া কাহার গোপন প্রিয়া ছিলি
আর জনমে
আজো ভুলতে নারিস আজো ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল্ যে হারায়
তাহারে কি পাওয়া যায় ডাকি রে
চোখ গেল পাখি রে
চোখ গেল পাখি॥

চৌরঙ্গি

১

(নেপথ্য সঙ্গীত)

চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি
চারদিকে রঙ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী ;
সে সকলের মন মাতায়
কলকাতার চৌমাথায়,
ওপারে যে ফিল্মের ঝিল্‌মিল্‌ আলোর দেয়ালি
এপারে যে পথের ভিখারিনি চোখের বালি ;
গোরা কালো সাহেব মেমে, মন্দ ভালো
বি–এ, এম–এ,
সবাই তাহার সঙ্গী ;
সে দক্ষিণ হাত তুমি দক্ষিণা চায়
আলো দেয় রবি শশি ফুল দেয় দখিনা বায়
ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গি,
নুয়ে পড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গি।।

২

(ভিখারিনির গান)

রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়—যায়—যায়
ওড়না তাহার ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়।।

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে উঠে তনুর তলোয়ার
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথরকুচির হার

তার ডালিম ফুলের ডালি গোলাপ গালের লালি
ঈদের চাঁদ ও চায়॥

আরবি ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে বাদশাজাদি বুঝি
সাহারাতে ফেরে সেই মরীচিকায় খুঁজি
কত করুণ মুসাফির পথ হারাল হায়
কত বনের হরিণ তারি রূপ তৃষায়॥

৩
(কামিনদের গান)

সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো,
পাত ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো
তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে।
ছেলে দুটো ভাত পায়নি পথ চেয়ে রয়েছে
আমিও ভাত রাঁধিনি দেখো না চুল বাঁধিনি
শাশুড়ি মান্ধাতার খুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।
আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো
সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো।
এত খায় তবু এদের বউগুলো সুটকো
ছেলেগুলো প্যাঁকাটি বাবুগুলো মুটকো।
এরা কাগজের ফুল এরা চোখে চাঁদ দেখে না
ইটের ভিতর কীটের মতো কাটায় সারা রাত গো॥

৪
(রাজকুমারীর গান)

আরতি-প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়
প্রেমের কুসুম গাঁথি মিলন মালায় ;
সুন্দর আসে মোর
প্রিয়তম মন-চোর,
তাই পুলকের শিহরন তনু লতিকায়॥

৫

(ভিখারিনির গান)

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই
বুল্‌বুলি সেই কথা ভুলিল কি হায় ;
সে কেন তবে আসে না
রাতে ফুল মোর হাতে শুকায়।
রাজবাগিচার ফুল হোক যত গরবী
পথের ফুলেও আছে তারি মতো সুরভি।
রসের পুতলি হয় পথের ভিখারিনী
যদি–প্রেম পায়॥

৬

(নায়ক ও নায়িকার গান)

নায়ক। জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি॥

নায়িকা। কান্না মেশানো পান্না নেব না বঁধু
এই পথেরই ধুলায় আমার মনের মধু
করে হীরা মানিক সৃষ্টি, মিষ্টি মিষ্টি॥

নায়ক। সোনার ফুলদানি কাঁদে লয়ে শূন্য হিয়া
এসো মধুমঞ্জরী মোর—এসো প্রিয়া।

নায়িকা। কেন ডাকে বৌ কথা কও,
বৌ কথা কও,
আমি পথের ভিখারিনি গো—
নহি ঘরের বউ
কেন রাজার দুলাল মাগে মাটির মউ
বুকে আনে ঝড়, চোখে বৃষ্টি
তার সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি তবু মিষ্টি॥

৭

(ভিখারিনির গান)

ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো ;
ঘুম আয় রে দুষ্ট, খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মতো নুয়ে যা
ঘুম আয় রে ঘুম আয় ঘুম ॥

মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে
খোকার চোখের পাপড়ি পড়ুক ঘুমে ঝিমিয়ে
ঘুম আর রে আয়
শুশুনি শাক খাওয়াব ঘুমপাড়ানি আয়
ঝিঁঝিঁপোকার নূপুর খোলো খোকা ঘুমু যায়
ঘুম আয় রে ঘুম আয় ঘুম ॥

৮

(ভিখারিনির গান)

ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে
জাফরানি রঙের পরাব পিরান তোর গায় রে।
আস্‌মানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়নতারা
তোর খেলার সাথী কাঁদে রে শাপলার ফুল
ফিরে আয় পথহারা
দু'নয়ন ঘুমে হৃদয় ঘুমায় না
কাছে পেতে চায় রে, আয় রে।
চোখের কাজল তোর চাঁদ মুখে লেগেছে
আয় মুছাব আঁচলে,
মায়ের পরানে তোর স্নেহের সাগর তরঙ্গ উথলে
মোর মনের ময়না ঘরে মন রয় না
পথ চেয়ে রাত কেটে যায় রে,
আয় রে ॥

৯

(ভিখারিনির গান)

ওগো বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও
অবেলায় ঝরা এ মুকুল,
লয়ে যাও বিফল এ জীবন
এই পায়ে দলা ফুল।
ওগো নদীজল লহ আমারে
বিরহের সেই মহাপাথারে
চাঁদের পানে চাহি যে পারাবার
অনন্ত কাল কাঁদে বিরহ ব্যাকুল॥

দিকশূল

১

ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর
ফুরাবে না এই ফুল
এই হাসি ঐ চাঁপার সুরভি
ভুল নহে, নহে ভুল॥

জানি জানি মোর জীবনের সঞ্চয়
রসঘন মাধুরীতে হবে মধুময়
তবে কেন আমার বকুল কুঞ্জে
বাঁশরি হইল আকুল॥

না—না—না—না।
কৃষ্ণাতিথিতে নাই যদি হাসে চাঁদ
ফুরাবে না মোর পূর্ণ রসের সাধ
যমুনার ঢেউ থাকুক আমার
আমি নাই দেখিলাম কূল॥
না—না—না—না।

২

ঝুম্‌কোলতার জোনাকি
মাঝে মাঝে বৃষ্টি
আবোলতাবোল বকে কে
তারও চেয়ে মিষ্টি॥

আকাশে সব ফ্যাকাশে ডালিমদানা পাকেনি
চাঁদ ওঠেনি কোলে তার মা বলে সে ডাকেনি
রাগ করেছে বাঘিনী বারো বছর হাসে না
স্বপ্ন তাহার ভেঙে যায় খোকা কেন আসে না।

পাথর হয়ে আছে ঝিনুক
দুধের বাটি দোলনা
মাকে বলে, 'খোকা কই?'
কিছুই খেলা হলো না।
তেমনি আছে ঘরের জিনিস
কিছুই ভালো লাগে না
পা আছড়ে মা কেঁদে কয়
'খোকা কেন ভাঙে না'॥

অভিনয় নয়

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে
বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিও॥

সুরের ডুরিতে জপমালা সম
তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম,
দুয়ারে ভিখারি গাহিলে সে গান
তুমি ফিরে না চাহিও॥

অভিশাপ দিও, বকুল কুঞ্জে
যদি কুহু গেয়ে ওঠে
চরণে দলিও সেই যুঁই গাছে
আর যদি ফুল ফোটে।
মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়
যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,
(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছ ধূলায়
(তারে) আর তুলে নাহি নিও॥

গ্রন্থ-পরিচয়

['নজরুল-রচনাবলী'-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৮) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

অভিভাষণ

'প্রতিভাষণ' প্রদত্ত হইয়াছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর রবিবার সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে। নজরুল-সম্বর্ধনার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যক মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায়।

তরুণের সাধনা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে (১৯৯৩ সালে প্রকাশিত নতুন সংস্করণের অন্তর্গত) 'যৌবনের গান' (কলিকাতার দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত) শীর্ষক অভিভাষণটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত কবি নজরুলের দীর্ঘ অভিভাষণেরই অংশবিশেষ। পুরো অভিভাষণটি 'তরুণের সাধনা' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'যৌবনের গান' শিরোনামের অংশটুকু বাদ দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত নজরুলের অভিভাষণটি 'যৌবনের ডাক' শিরোনামে ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সওগাত'এ প্রকাশিত হয়। 'সওগাত'-সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, 'সভাপতির অভিভাষণটি নজরুল নিজেই 'যৌবনের ডাক' নাম দিয়ে 'সওগাত' এ ছাপাতে দেন।' (দ্রষ্টব্য : 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম', মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রণীত, নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত, জুন ১৯৮৮)

'সওগাত'এ প্রকাশিত নজরুলের উপরোক্ত অভিভাষণটিতে বিষয়ানুসারে কয়েকটি সাবহেডিং থাকায় 'তরুণের সাধনা'য়ও তা দেওয়া হলো।

সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই 'অনল-প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থখ্যাত কবি, রাজনীতিবিদ, বাগ্মী ও তরুণ দলের নেতা বাংলার মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (সিরাজগঞ্জের শিরাজী হিসাবে অভিহিত) লোকান্তরিত হন (১৯৩২,১৮ জুলাই)। উল্লেখিত সম্মেলনের আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর পুত্র—কবি, রাজনীবিদ ও বাগ্মী (মরহুম) সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল হক। সম্মেলনে নজরুলের সঙ্গে অংশ নেন বাংলার জননন্দিত প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও কবি সুফী জুলফিকার হায়দার। সম্মেলনের আয়োজন এবং সম্মেলন-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'সিরাজগঞ্জে কাজী নজরুল ইসলাম', ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা', ভাদ্র ১৩৯৫।

শেষ কথা

নজরুলের এই অভিভাষণটি ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় 'যৌবনের ডাক' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

প্রতি-নমস্কার

'প্রতি-নমস্কার' শীর্ষক প্রতিভাষণ কবি প্রদান করেন চট্টগ্রামে, 'বুলবুল সমিতির সভ্যগণ' কর্তৃক প্রদত্ত 'কবির প্রশস্তি' নামক মুদ্রিত মানপত্রের প্রত্যুত্তরে।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

চট্টগ্রামে 'বুলবুল সমিতি'র উদ্যোগে নজরুলকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়—সে-উপলক্ষে 'কবি-প্রশস্তি' শিরোনামে যে মুদ্রিত মানপত্র 'বুলবুল সমিতি'র সভ্যগণের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় তার শুরুতেই বলা হয় 'বাংলার শেলি' কবিবর—কাজী নজরুল ইসলাম মহোদয় সমীপেষু'। এসলামাবাদ প্রেস, চট্টগ্রামে মুদ্রিত মানপত্রটিতে সংবর্ধনার তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নেই। সম্ভবত ১৯২৯ সালের প্রথমদিকেই এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

‘যদি আর বাঁশি না বাজে’
পু ন শ্চ

‘যদি আর বাঁশি না বাজে’ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ও ৬ এপ্রিলে বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনের সভাপতির ভাষণরূপে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

রসলোকের তৃষ্ণা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

‘রসলোকের তৃষ্ণা’ শীর্ষক অভিভাষণটি ইতোপূর্বে ‘নজরুল-রচনাবলী’তে ছিল না। রচনাটি ড. চৌধুরী কামাল রহিম, পরিচালক, ইউনেস্কো আঞ্চলিক অফিস আরব রাষ্ট্রসমূহ কায়রো (১৯৭০-৭৯)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, নজরুল এই ভাষণটি কথাশিল্পী আবু রুশদের কলকাতার বাসায় অনুষ্ঠিত ঘরোয়া সাহিত্য-সভায় প্রদান করেন। এর অনুলিপি করেন জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী ও ড. কামাল চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা’ শীর্ষক অভিভাষণটি ইতোপূর্বে ‘নজরুল-রচনাবলী’তে ছিল না। রচনাটি শিশির করের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, হাওড়ায় রবীন্দ্র-স্মরণসভায় নজরুলের ভাষণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পনেরো দিন পরে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সংগীত গবেষণা

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
সংস্কৃত ছন্দের গান

ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির ‘নজরুল ইসলামের ছন্দ’ প্রবন্ধে (‘নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ’, নজরুল ইন্সটিটিউট, জানুয়ারি ১৯৮৯ গ্রন্থে সংকলিত) লিখেছেন,

সংস্কৃত তোটক, অনঙ্গশেখর, শার্দূলবিক্রীড়িত, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত প্রভৃতি বৃত্ত ছন্দের আদলে বাংলা কবিতা রচনার প্রয়াসও করেছেন। তবে সে সকল ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠা-সহকারে প্রস্বরমাত্রিক পদ্ধতির অনুসরণে না করে মিশ্ররীতিরই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নিখুঁত প্রস্বরমাত্রিক তথ্য বিমান-বিহার পদ্ধতিতে বিদেশী ছন্দসমূহ বাংলায় অনূদিত হলে সে-সব ছন্দের ধ্বনিসুষমা অনেক বেশি পাওয়া যাবে। সংস্কৃত ছন্দ দ্বিবিধ : বৃত্ত ছন্দ ও জাতিছন্দ। বৃত্তছন্দে অক্ষর সংখ্যা ও মাত্রা সংখ্যা এবং লঘু-গুরুভেদের পর্যায়ক্রম সুনির্দিষ্ট। জাতিছন্দে শুধু মাত্রা সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। তাতে বর্ণ-সংখ্যার স্থিরতা নেই। বাংলায় এই মাত্রা ছন্দে কিছু উৎকৃষ্ট গান বিরচিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত অক্ষর-ছন্দে সঙ্গীত রচনার দুঃসাহস কোনো কবিই করেননি। নজরুল সেই দুরূহ ছন্দে কয়েকটি মার্গ-সঙ্গীত রচনা করে নূতন পথের ইশারা দিয়েছেন। তাঁর 'ছন্দিতা' গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'মত্তময়ূর', 'রুচিরা', 'দীপকমালা', 'মন্দাকিনী', 'মঞ্জুভাষিণী', 'মণিমালা', 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত' ও 'সৌরাষ্ট্র ভৈরব' ছন্দ-রাগের ১১টি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাংলা গানের জগতে বিশাল সম্ভাবনার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ অমলকুমার মিত্র 'কবি নজরুলের সংস্কৃত ছন্দে গান' ('সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১, অক্টোবর ১৯৯৩) সংখ্যায় লিখেছেন,

'নজরুল সংগীত পরিক্রমা'য় দেখা যায় যে কবি নজরুল ইসলাম সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে দশটি সংগীত রচনা করেছিলেন। ওই গানগুলি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'ছন্দিতা' নামে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই। রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, বর্ণনায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, যন্ত্রানুষঙ্গে যন্ত্রীসংঘ এবং ভূমিকায় ছিলেন শৈল দেবী, ইলা ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন রায়। এর ১৭ বছর পরে গানগুলি কবির 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছিল। সংস্কৃত ছন্দগুলির নাম এবং সেগুলির সূত্রে কবির গানের প্রথম চরণ উল্লেখ করা হলো :

সংস্কৃত ছন্দের নাম			
প্রিয়া	...		
মধুমতী	...		
দীপকমালা	...		...
স্বাগতা			স্বাগতা কনক চম্পকা ...
মন্দাকিনী			জল ছলছল এস মন্দাকিনী
মণিমালা			মধু মধু ছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী
রুচিরা			ভ্রমর নূপুর পরিহিতা কৃষ্ণ কুন্তলা
মধুভাষিণী		...	আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
মত্তময়ূর		...	মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে
চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত	...	...	তারকা নূপুরে নীল নভে

এই পর্বেই নজরুল 'ছন্দিতা' অনুষ্ঠানের জন্য সংস্কৃত ছন্দে গানগুলি রচনা করেছিলেন। কবির ছন্দ নির্বাচন এমনই ছিল যে গানগুলি প্রচলিত তালের ঠেকার ছন্দ এড়িয়ে ভিন্নরকম ছন্দের সৌষ্ঠবে শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। ৭ মাত্রার ছন্দ হলেই সেটা তেওড়া বা রূপক ছন্দের অনুগামী নয়, ১৬ মাত্রায় ছন্দ হলেই সেটা ত্রিতাল, মধ্যমান বা আড়া ঠেকার চলনে চলবে না, ১৮ মাত্রার ছন্দ হলেই সেটা দাদরার ঢঙে

চলবে না—এই সবই কবি গানের মাধ্যমে শ্রুতিগোচর করেছিলেন। কবির নির্বাচিত সবকটি ছন্দই ছিল অক্ষরবৃত্ত, ওগুলিকে মাত্রাবৃত্তে ব্যবহার করা পূর্বোক্ত সূত্রে—প্রতি লঘুবর্ণ বা হ্রস্বধ্বনি = ১ মাত্রা এবং প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বা দীর্ঘধ্বনি অর্থাৎ=২ মাত্রা, প্রস্বন দীর্ঘধ্বনির প্রথম মাত্রায়। সবকটিই ছিল সমবৃত্ত ছন্দ, হয়েছিল চরণে মাত্রাসংখ্যা সমান।

ছন্দের লক্ষণ সংক্ষেপে বোঝাবার জন্য গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতে কয়েকটি সংকেত ব্যবহার করা হয়েছিল। '।' চিহ্ন-একটি লঘু অক্ষর এবং 'ऽ' চিহ্ন একটি গুরু অক্ষর। কবি নজরুল অবশ্য '।' চিহ্নের পরিবর্তে, 'না' লিখতেন এবং 'ऽ' এর পরিবর্তে 'তা' লিখতেন।

যদিও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের গান সম্পর্কে তাঁর 'নজরুল সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ' গ্রন্থে গ্রন্থকারের কথায় লিখেছেন,

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কবি কোনও নতুন তাল সৃষ্টি করেননি। কবি 'ছন্দিতা' অনুষ্ঠানে যে ছন্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখিত। রামায়ণ-মহাভারত ভাগবত-পিঙ্গলছন্দসূত্রম্-শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি থেকে ছন্দগুলি চয়ন করে কবি বাংলা গানে প্রয়োগ করেছেন। ২৬শে জুলাই ১৯৪১ তারিখে প্রচারিত 'ছন্দিতা' অনুষ্ঠানের বেতার জগতে এরূপ বর্ণনা ছিল—

রাত্রি ৮টা। ছন্দিতা
রচনা ও পরিচালনা—কাজী নজরুল ইসলাম
যন্ত্রানুষঙ্গ—যন্ত্রীসঙ্গ
বর্ণনা—এস্. সি. চক্রবর্তী
ভূমিকায়—শৈল দেবী, ইলা ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন রায়।'

গানগুলি ছিল এরূপ—

(১) স্বাগত কনক চম্পকবর্ণা—স্বাগতা ছন্দ (১৬ মাত্রা)
(২) মহুয়াবনে বনপাপিয়া—প্রিয়াছন্দ (৭ মাত্রা)
(৩) বনকুসুম তনু তুমি কি মধুমতী—মধুমতী ছন্দ (৮ মাত্রা)
(৪) মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে—মত্তময়ূর ছন্দ (২২ মাত্রা)
(৫) ভ্রমর নূপুর পরিহিতা কৃষ্ণ কুন্তলা—রুচিরা ছন্দ (১৮ মাত্রা)
(৬) দীপক মালা গাঁথো গাঁথো গাঁথো সই—দীপকমালা ছন্দ (১৬ মাত্রা)
(৭) জল ছলছল এস মন্দাকিনী—মন্দাকিনী ছন্দ (১৬ মাত্রা)
(৮) আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে—মঞ্জুভাষিণী ছন্দ (১৮ মাত্রা)
(৯) মঞ্জু মধুছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী—মণিমালা ছন্দ (২০ মাত্রা)
(১০) তারকা নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন ছন্দিতার ছন্দ—বৃষ্টিপ্রপাত ছন্দ (৪৮ মাত্রা)

অনেকে এগুলিকে 'নজরুলসৃষ্ট তাল' আখ্যা দেন। কিন্তু এগুলি আসলে ছন্দ এবং বহুপ্রাচীন। আলোচনায় বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। ১৬ মাত্রার তাল ত্রিতাল। এই তালের ছন্দ ১৬ মাত্রা। ছন্দ নিম্নরূপ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	—	৯	—	১১	—	১৩	—	১৫	১৬

মন্দাকিনী ছন্দ ১৬ মাত্রা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	—	৯	—	১১	—	১৩	—	১৫	১৬
জ	ল	ছ	ল	ছ	ল	এ	০	সো	০	ম	ন	দা	০	কি	নী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রখ্যাত সমালোচক 'অমলকুমার মিত্র' মহাশয় 'চতুষ্কোণ', মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৯ সংখ্যায় জানিয়েছেন যে 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে ছাপার ভুলে 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত' এবং ৪৮ মাত্রা ছাপা হয়েছিল। আসলে নাকি হওয়া উচিত ছিল 'চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত' এবং ৪১ মাত্রা। কিন্তু মিত্র মহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করলেও এ সত্য যে ছন্দবিশেষজ্ঞ 'আবদুল কাদির' নির্ভুল জেনেই সজ্ঞানে 'নজরুল-রচনাসম্ভারে' 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'শেষ সওগাত' গ্রন্থের সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রও কোনও ভুল করেননি।

বৈদিক যুগে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি ২৬ প্রকার ছন্দের উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বহু ছন্দের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বস্তুত ভাগবত বর্ণিত 'স্বাগতা', 'শিশুপাল বধ' কাব্যের 'মত্তময়ূর', রামায়ণের 'রুচিরা', ভাগবতের 'মঞ্জুভাষিণী' প্রভৃতি ছন্দগুলিরও পুনঃপ্রচলন করেন নজরুল। প্রাচীন কালের পিঙ্গল রচিত 'পিঙ্গলছন্দসূত্রম্', গঙ্গাদাস রচিত 'ছন্দোমঞ্জরী' বা বর্তমান কালের রাধাকান্ত দেব বাহাদুর রচিত 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থগুলি পাঠ করলে এ বিষয় সম্যক ধারণা হবে।'

উপরোক্ত আলোচনাসমূহ থেকে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা গান রচনায় নজরুলের সংস্কৃত ছন্দজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মেল-মেলন

'মেল-মেলন' সঙ্গীতালেখ্য ১৯৩৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটে বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম। বিভিন্ন অংশে রবীন দাস (বুলু), রমেন দাস (নন্তু), মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় (বুলকী), উমা দত্ত, রমা দাস (লুপু)।

['নজরুল যখন বেতারে', আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী]

যাম যোজনায় কড়ি মধ্যম

নজরুল রচিত, সুরারোপিত সঙ্গীতালেখ্য 'যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম' একটি রাগভিত্তিক গবেষণামূলক রচনা। ১৯৪০ সালের ২২শে জুন ৬-৫৫ মিনিটে এই সঙ্গীতালেখ্যটি কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

['নজরুল যখন বেতারে', আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।]

অগ্রন্থিত গান
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

অগ্রন্থিত গানগুলি ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত নজরুল রচনা সম্ভার' গ্রন্থ (জানুয়ারি ২০০১) থেকে সংকলিত।

নাটিকা ও গীতিবিচিত্রা

ভূতের ভয়
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'ভূতের ভয়' নাটকের রচনা ও প্রকাশকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে (১৯৯৩) এই নাটকটি অন্তর্ভুক্ত। 'ভূতের ভয়' মূলত রূপক কাহিনী। এর আড়ালে নজরুলের রাজনৈতিক দর্শন অর্থাৎ নজরুল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের আত্মত্যাগকেই মহান করে তুলেছেন। এই নাটিকাতে নজরুলের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। জুন ১৯৯৭]

জাগো সুন্দর চিরকিশোর
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'জাগো সুন্দর চিরকিশোর' গ্রন্থে নজরুলের হাতের লেখা রচনার ১৬টি পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের সম্পাদক আসাদুল হক 'ভূমিকা'য় লিখেছেন, 'জনাব আবদুল আজীজ আল আমান কবি নজরুলের বেশ কিছু কিশোর উপযোগী নাটিকা, কবিতা ও গান একত্রিত করে 'নজরুল কিশোর সমগ্র' নামে কলিকাতা হরফ প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ... সৌভাগ্যবশত, কবির হাতের লেখা মূলগীতি নাটকটি আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। পাণ্ডুলিপিটি মোট ১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রকাশিত নাটিকাটির সাথে কবির হস্তলিপির যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য করা গেছে। কোনো কোনো জায়গায় শব্দের বানান বদল করা

হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় শব্দ বাদ পড়েছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় লাইনই বাদ পড়েছে।'

['জাগো সুন্দর চিরকিশোর', নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯১]

ঈদ
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৩৬৫ সালের ৭ই বৈশাখ ঈদ-সংখ্যা দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় নাটিকাটি প্রকাশিত হয়। 'ঈদ' মূলত গীতিনাটিকা। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ৪র্থ খণ্ডে (১৯৯৩ সালের সংস্করণ) এটি সংকলিত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় 'ঈদ' গীতি-নাট্যটি কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়।

['বেতারে নজরুল', ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, মে ১৯৮৮]

গুল-বাগিচা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৪-১২-৪০ তারিখে কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় 'গুল-বাগিচা' নামে গীতিবিচিত্রাটি। রচনা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম। 'গুলবাগিচা'য় যে গানগুলি ছিল সেগুলো—(১) আধো আধো বোল (২) মন দিয়ে যে দেখি তোমায় (৩) যবে আঁখিতে ওরা কহে কথা (৪) মোর প্রিয়া হবে এসো রানি (৫) সখি, বুলবুলি কেন কাঁদে গুলবাগিচায় (৬) মুখের কথায় নাই জানালে, জানিয়ো গানের ভাষায়। গানের কয়েকটি পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

['বেতারে নজরুল', ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, মে ১৯৮৮]

অতনুর দেশ
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'অতনুর দেশ'-এর অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে ('নজরুল-রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩) নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য রয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান সংস্করণে বাণীর পার্থক্য যথাসম্ভব সংশোধনের

চেষ্টা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে গানের বাণী যথাসম্ভব মিলিয়ে দেখা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক, সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ ও নজরুল বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা সদ্যপরলোকগত ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের (২০০৪) অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে। উক্ত গ্রন্থে গানের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর এবং কণ্ঠশিল্পীর নাম উল্লিখিত না থাকলেও ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, গানের বাণী সংগৃহীত হয়েছে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে এবং গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকে।

'অতনুর দেশ' কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৮ জুন তারিখে ('বেতারে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী)।

শত সতর্কতা সত্ত্বেও, মুদ্রণ-বিভ্রাটের দরুন হয়তো গানের বাণীতে ও অন্যত্র কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বিজয়া
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র ৪র্থ খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'বিজয়া' শীর্ষক সংলাপসমৃদ্ধ গীতি-নাট্য অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বেতার-জগৎ' (কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের মুখপত্র)-এর ১০ম বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১৬ অক্টোবর, ১৯৩৯ থেকে সংকলিত 'বিজয়া'য় গদ্য-সংলাপ ছাড়াও পাঁচটি গান রয়েছে। সংলাপ-সমৃদ্ধ এ গীতি-নাট্যের চরিত্র হলো : জনৈক দেবতা, মানুষ, ভিখারিণী, জনৈকা নারী। চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ 'বিদ্যাপতি' নাটকে ('হিজ মাস্টারস ভয়েস' রেকর্ড কোম্পানি কর্তৃক সাতখানি রেকর্ডে ধারণকৃত) যে 'চরিত্র-পরিচয়' দেওয়া হয়েছে, তাতে 'বিজয়া' নামে একটি চরিত্র আছে। 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয়েছে যে, 'হিজ মাস্টারস ভয়েস' কোম্পানি একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০) প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলির ৫ম খণ্ডে (প্রকাশকাল মে, ২০০৪) 'বিজয়া' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'বেতার-জগৎ' থেকে এটি নেয়া হয়েছে—এমন কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'বিজয়া' এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলির ৫ম খণ্ডের (২০০৪) অন্তর্গত 'বিজয়া' অভিন্ন। এতে এটাই

অনুমেয় যে, 'নজরুল-রচনাবলী' থেকেই 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে 'বিজয়া' সংকলিত হয়েছে। আসাদুল হক লিখেছেন, 'বিজয়া' কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ২২ অক্টোবর। ('বেতারে নজরুল', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা)

শ্রীমন্ত
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এইচ.এম.ভি, থেকে 'শ্রীমন্ত' রেকর্ডনাট্য প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নম্বর এন. ৭৪২৪-৭৪২৬। এর কাহিনী মূলত লোকগাঁথা ভিত্তিক।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। জুন, ১৯৯৭]

পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রহসন নাটিকা। ১৩৪০ সালে অগ্রহায়ণের 'ছায়াবীথি' পত্রিকায় নজরুলের ছদ্মনাম মোহাম্মদ লোক হাসান নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে শ্রুতিনাটক হিসেবে এতে একটি গান 'ওহে রসিক রসাল' ও নতুন সংলাপ সংযোজিত হয়ে রেকর্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে এবং রেকর্ড নম্বর এন. ৭১৮০।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। জুন, ১৯৯৭]

ঈদল্ ফেতর্
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ঈদুল্ ফেতর্' রেকর্ড-নাট্য হিসাবে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং এন ৯৮২৩-৯৮২৪। নজরুল খুব স্বল্পপরিসরে ইসলামের মূল শিক্ষণীয় কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'বিলাতি ঘোড়া বাচ্চা' একটি রেকর্ড নাটিকা। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রচারিত হয়। রেকর্ড নং এন. ২৭২৯৪।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

বাঙালি ঘরে হিন্দি গান
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'বাঙালি ঘরে হিন্দি গান' রেকর্ডনাট্য ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং এন ২৭৯৪১। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর লিখেছেন,

> 'বাঙালি ঘরে হিন্দি গান কৌতুকনাটিকা, সংগীতশিক্ষক ও ছাত্রীর ঠাকুর মা উভয়ের হিন্দি ভাষার অজ্ঞতা হতে কি ধরনের কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাই দেখানো হয়েছে। আগাগোড়া কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অসংগত রূপটিও লেখক মাঝে মাঝে প্রকটিত করেছেন।'

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

ঈদজ্জোহা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'ঈদজ্জোহা' শীর্ষক কোনো রচনা ইতোপূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কয়েকটি গান ও গদ্যরচনার সমবায়ে লেখা 'ঈদজ্জোহা'র গানগুলোর বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। গানের বাণীর যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে দুটি সংকলনগ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। গ্রন্থ দুটি হলো : (১) 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ (২০০৪) ও (২) 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (প্রথম প্রকাশকাল ২০০৬)। কলকাতার হরফ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক, সঙ্গীতজ্ঞ ও নজরুল-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে গানের বাণীর সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর এবং কণ্ঠশিল্পীর নাম মুদ্রিত না থাকলেও তা গানের বাণী যে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে এবং গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকেই নেওয়া হয়েছে, সে-কথা

গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ (২০০২ সালে লিখিত) বলা হয়েছে। নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত গানের বাণী ও 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) থেকে নেয়া। 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের মূল সম্পাদক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এবং সদ্যপরলোকগত ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুরকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো গানের বাণীতে কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট রয়ে গেছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

দেবীস্তুতি

'দেবীস্তুতি' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ : মহালয়া, ১৩৭৫ সাল।নিতাই ঘটক সংকলিত এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রী গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎ চন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+৬২। মূল্য তিন টাকা।

নজরুল-সঙ্গীতের স্বনামখ্যাত স্বরলিপিকার নিতাই ঘটক তাঁর 'সঙ্কলকের নিবেদন'-এ বলিয়াছেন :

> 'কবি নজরুল ইসলামের তিনখানি অপ্রকাশিত রচনা ও ১৬খানি অপ্রকাশিত 'মাতৃস্তুতি' দিয়ে 'দেবীস্তুতি' সঙ্কলিত হলো।
>
> ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে কবি 'দেবীস্তুতি' লেখেন। ... ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে তিনি 'বিজয়া' এবং ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে 'হরপ্রিয়া' নাটিকা দু'টি রচনা করে আমাকে দেন। এই নাটিকা দুটিতে সংযোজিত কয়েকখানি গান কবি পূর্বেই রচনা করেছিলেন। পরে উপযুক্ত মনে করায় সেগুলি এই বইখানির স্থানে সংযোগ করেন। অপরাপর ১৬খানি গান ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে রচিত হয়।'

'দেবীস্তুতি' রচনাটিতে 'মহালক্ষ্মী' শিরোলেখায় যে গানটি আছে তাহার পাঠান্তর নজরুল-একাডেমীর 'নজরুল-গীতি' তৃতীয় খণ্ডে আছে এরূপ—

ওমা দনুজ-দলনী মহাশক্তি
নম অনন্ত কল্যাণ-দাত্রী
পরমেশ্বরী মহিষ-মর্দিনী
চরাচর বিশ্ব-বিধাত্রী॥

সর্বদেবদেবী তেজোময়ী,
অশিব-অকল্যাণ-অসুর-জয়ী,
দশভুজা তুমি মা ভীত-জন-তারিণী
জননী জগদ্ধাত্রী॥

দীনতা ভীরুতা দুঃখ গ্লানি ঘুচাও,
দলন করো মা লোভ-দানবে।
আয়ু দাও, যশ দাও, ধন দাও, মান দাও—
দেবতা করো মা ভীরু মানবে॥

শক্তি-বিভব দাও, দাও মা আলোক ;
দুঃখ-দারিদ্র্য অপসৃত হোক্।
জীবে জীবে হিংসা, এই সংশয়
দূর হোক মা গো, দূর হোক।
পোহায়ে দাও মা দুখ-রাত্রি॥

গানটির সুর বিস্তারের প্রয়োজনে ইহা এভাবে পরবর্তীকালে কবি কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

আসাদুল হকের 'বেতারে নজরুল' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'দেবীস্তুতি' ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি 'বেতার জগতে'র প্রচ্ছদে নজরুলের ছবিসহ প্রকাশিত এবং বাসন্তী বিদ্যাবীথির কর্তৃক ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত।

নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) নজরুলের 'দেবীস্তুতি'র অন্তর্গত গানগুলোর সম্পর্কেও তথ্যাদি পরিবেশিত হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, 'দেবীস্তুতি' প্রথম প্রকাশের তারিখ : মহালয়া ১৩৭৫ সাল নিতাই ঘটক সংকলিত এবং অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক : সুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ৬২, মূল্য তিন টাকা।

উপরোক্ত তথ্যাদি থাকা সত্ত্বেও, 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০) কর্তৃক প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে (যে-খণ্ডে 'দেবীস্তুতি' অন্তর্ভুক্ত) গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, নজরুলের 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা', 'বিজয়া' ইত্যাদি 'গোলমেলে' রচনা। সবগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বেতার স্ক্রিপ্ট অবলম্বনে তাঁর রচনাবলিতে সংগৃহীত হয়েছে। 'গোলমেলে রচনা' বলা সত্ত্বেও, উপরে উল্লিখিত : 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা', 'বিজয়া'র অন্তর্গত গানগুলো 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রকাশকাল মে ২০০৪)।

'পশ্মিবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' যে 'দেবীস্তুতি'র অন্তর্গত গানগুলো ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) থেকে নিয়েছেন, সেটা অনুমেয় এ-কারণে যে, দুই

রচনাবলীর অন্তর্গত গানগুলো এক ও অভিন্ন। গানগুলোর ধারাক্রমেও ভিন্নতা নেই; 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'দেবীস্তুতি'র অন্তর্গত গানের সংখ্যা ১১টি এবং 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থেও 'দেবীস্তুতি'র অন্তর্গত গানের সংখ্যা ১১টি।

উল্লেখ্য, 'দেবীস্তুতি'র অন্তর্গত সবগুলো গানই কলকাতার হরফ প্রকাশনী (এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭) কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত-গবেষক, নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক ও নজরুল-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা পরলোকগত ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে (২০০৪) অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণের সম্পাদক বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ. 'দেবীস্তুতি' সম্পর্কে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর লিখেছেন, '১৬.১.১৯৩৮ সংখ্যার 'বেতার জগত'-এর প্রথম নজরুলের ফটো ছাপানো হয়েছিল 'কবি নজরুল ইসলাম' পরিচয় সহকারে। এই সংখ্যায় 'আমাদের কথা' বিভাগে 'দেবীস্তুতি' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'হিন্দুর মহাদেবী আদ্যাশক্তির বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপের যে মোহনীয় বিকাশ--সেই শ্রী শ্রী মহাকালীর প্রকটকালের ভাবসঙ্গীত এই দেবীস্তুতি। কবি নজরুল ইসলাম এই সঙ্গীতগুলি রচনা করেছেন।' ['বেতারে নজরুল', ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮]

দশমহাবিদ্যা ও হরপ্রিয়া

আবদুল কাদির দেবীস্তুতির যে-গ্রন্থপরিচয় লেখেন, তা থেকে মনে হয় যে, ওই বইতে 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া' ও 'বিজয়া' এবং ১৬টি মাতৃস্তুতিমূলক গান সংকলিত হয়েছিল। মনে হয়, এই গানগুলিই দশমহাবিদ্যা নামে স্বতন্ত্রভাবে নজরুল-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। কোনো অজ্ঞাত কারণে হরপ্রিয়াও সেখানে স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদালাভ করে। আর 'বিজয়া'র স্থান হয় পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধে। নতুন সংস্করণেও আমরা 'দশমহাবিদ্যা', 'হরপ্রিয়া' ও 'দেবীস্তুতি' স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান খণ্ডে এবং 'বিজয়া' চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করলাম। 'হরপ্রিয়া' সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের ১ ডিসেম্বর 'বেতার জগতে' 'হরপ্রিয়া' সম্পর্কে বলা হয় 'হরপ্রিয়া' কাফি ঠাটের রাগ রাগিণী, রচনা ও সুরসংযোনা কাজী নজরুল ইসলাম।

['বেতারে নজরুল', আসাদুল হক]

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'দশমহাবিদ্যা' (১৬টি গানের সংকলন) অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে, ৩য় খণ্ডে 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া'ও অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০) প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে (প্রকাশকাল মে, ২০০৪) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা', 'বিজয়া' ইত্যাদি।

গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'দেবীস্তুতি, দশমহাবিদ্যা, হরপ্রিয়া, বিজয়া এগুলি গোলমেলে রচনা' (দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-রচনা সমগ্র', পৃ. ৫৯২), কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, 'গোলমেলে' রচনাগুলোই অর্থাৎ 'দেবীস্তুতি, হরপ্রিয়া, দশমহাবিদ্যা, বিজয়া' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁদের প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) অন্তর্গত 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা'র অন্তর্গত রচনাসমূহ আর 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের (২০০৪) অন্তর্গত 'দেবীস্তুতি', 'হরপ্রিয়া' 'দশমহাবিদ্যা' ইত্যাদির রচনাসমূহ অভিন্ন।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
নজরুলের 'দশমহাবিদ্যা' প্রসঙ্গে

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে ইতোপূর্বে 'দশমহাবিদ্যা' অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 'দশমহাবিদ্যা' নামে নজরুলের কোনো গীতি-গ্রন্থও সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। তবে যতদূর জানা যায়, কবির সুস্থাবস্থায়ই 'দশমহাবিদ্যা'র অন্তর্গত গানগুলো গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পী-কণ্ঠে ধারণকৃত গানের বাণীর সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় যথাসম্ভব বাণী সংশোধন করে 'দশমহাবিদ্যা' বর্তমান সংস্করণ (নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৮) 'নজরুল-রচনাবলী'তে বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গানের বাণী সংশোধন করা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত-গবেষক, নজরুল-সঙ্গীত-সংগ্রাহক, সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ ও নজরুল বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা—ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণের অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। উক্ত গ্রন্থে গানের বাণীর নিচে গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর এবং কণ্ঠশিল্পীর নাম উল্লিখিত না থাকলেও গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ সদ্যপরলোকগত ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে গানের বাণী সংগৃহীত হয়েছে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে, গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকে।

শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট ঘটে থাকতে পারে। এজন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
নজরুলের 'হরপ্রিয়া' প্রসঙ্গে

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) নজরুলের 'হরপ্রিয়া' (কাব্য-সংলাপ ও গানের সংকলন)। 'হরপ্রিয়া'র রচনাকাল : ডিসেম্বর ১৯৩১। এতে কাব্য-সংলাপ ছাড়া গানের সংখ্যা ৬টি, বাকি সবই অন্তমিলহীন ছন্দে রচিত কাব্য-সংলাপ বা নাট্য-সংলাপ।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০) কর্তৃক প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে (প্রকাশকাল : মে, ২০০৪) 'হরপ্রিয়া' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'হরপ্রিয়া'র অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহ আর 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ডের (প্রকাশকাল ২০০৪) অন্তর্ভুক্ত 'হরপ্রিয়া'র অন্তর্গত রচনাসমূহ অভিন্ন। এতে এটাই অনুমেয় যে, কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'ই 'হরপ্রিয়া'র রচনাসমূহ সংগ্রহে হয়তো 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র জন্য সহায়ক উৎস হয়েছে। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর লিখেছেন, '১৯৩৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে 'হরপ্রিয়া' সঙ্গীতালেখ্যটি প্রচারিত হয় (কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে)। অনুষ্ঠান পরিচিতি যেভাবে 'বেতার-জগতে' উল্লেখিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

হরপ্রিয়া (কাফি ঠাটের রাগ-রাগিণী)

রচনা ও সুর-সংযোজন : কাজী (য) নজরুল ইসলাম। ব্যবস্থাপনা : মনোরঞ্জন সেন, নিতাই ঘটক প্রভৃতি (পৃ. ৩২)।

['বেতারে নজরুল', ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]

কালোয়াতি কসরৎ
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'কালোয়াতি কসরৎ'-এর রচনা ও প্রকাশকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আবদুল আজীজ আল আমান 'কালোয়াতি কসরৎ'-কে রেকর্ড-নাট্য বলেছেন :

কবির লড়াই
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

কবির লড়াই ক্ষুদ্রাবয়বের গানে গানে সংলাপধর্মী রচনা। রেকর্ড নং এন ১৭৪৪১–এ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। এতে অংশ নেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জিৎ রায়। 'কবির লড়াই' নাটক বা নাটিকা না হলেও এতে নাটকীয়তা আছে। এটি নজরুলের প্রতিভাদীপ্ত একটি নাটধর্মী হাস্যরসাত্মক রচনা।

[তথ্যসূত্র : 'নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

পুরনো বলদ—নতুন বৌ
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'পুরনো বলদ নতুন বৌ' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে কৌতুক নকশা রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং এন ১৭২৬৮।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

বিষ্ণুপ্রিয়া
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকের রচনাকাল, প্রথম প্রকাশকাল ও রচনার পটভূমি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সংগৃহীত হয়নি। এটি 'নজরুল-রচনাবলী'র ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪তে নাটক-নাটিকা বিভাগে 'বিদ্যাপতি' নাটকের পরের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক ছাপা হয়। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকটি অসমাপ্ত নাটক কারণ এর শেষ অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

জন্মাষ্টমী
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'জন্মাষ্টমী' রেকর্ড-নাট্য ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং এন. ১৭১৬৯।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

প্ল্যানচেট
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

শ্রুতি–নাটক 'প্ল্যানচেট' রেকর্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। রেকর্ড নং এন. ১৭৬০।

['নাট্যকার নজরুল', অনুপম হায়াৎ]

পঞ্চাঙ্গনা
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গীতি–আলেখ্য 'পঞ্চাঙ্গনা' কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৪১ সালের ২৩শে আগস্ট রাত ৮টা থেকে ৮–২৪মিনিট পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সঙ্গীতে শিল্পী ছিলেন চিত্ত রায়, শৈল দেবী এবং ইলা ঘোষ। গীতি–আলেখ্যটি প্রযোজনাতে নজরুল ইসলামের নামও পাওয়া যায়।

['নজরুল যখন বেতারে', আসাদুল হক। শিল্পকলা একাডেমী]

নাটকের গান

'সিরাজুদ্দৌলা'
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৯৩৯ সালের ২৪শে নভেম্বর ৬–৪৫ মিনিট থেকে ৮–৪৫ মিনিট পর্যন্ত (শুক্রবার) কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক। এ নাটকের গান রচনা, সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন নজরুল। এ নাটকে নজরুলের গান ছিল : (১) আমি আলোর শিখা (২) ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গি (৩) সখি শ্যামের স্নিরিতি, শ্যামের পিরিতী (৪) পথহারা পাখি এবং (৫) হায় পলাশি। নাটকটি পরিচালনা করেন বীরেন্দ্র ভদ্র।

['নজরুল যখন বেতারে', আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী]

'সুরথ-উদ্ধার'
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'সুরথ-উদ্ধার' নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত একটি রেকর্ড নাটক, যার গানগুলি নজরুলের রচনা। 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা' ২য় সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, ডিসেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুরথ-উদ্ধার' নাটকের গল্প' শীর্ষক নিবন্ধে বিশিষ্ট নজরুল-সঙ্গীতজ্ঞ জনাব আবদুস সাত্তার লিখেছেন, 'সুরথ-উদ্ধার' গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, গ্রামোফোন কোম্পানির প্রচারপত্রে মুদ্রিত। হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর পুস্তিকায় নাটকের সঙ্গে গানের বাণী মুদ্রিত রয়েছে। সঙ্গে লেখা আছে, 'সুরথ-উদ্ধার' (Bengali drama) নাটক রচয়িতা মন্মথ রায়। সঙ্গীত রচয়িতা ও সুর সংযোজনা কাজী নজরুল ইসলাম। সঙ্গীত হরিমতী, গিরীন চক্রবর্তী, ধীরেন দাস, দেবেন বিশ্বাস ও সরযূবালা। রচনাকাল ১৯৩৬।

'মদিনা'
জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতিআলেখ্য 'মদিনা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা' প্রথম সংকলন জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ সালে। এই গীতিআলেখ্যটির সংগ্রাহক আবদুল আজিজ আল-আমান যে ভূমিকা লিখেছিলেন তা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হলো। তিনি 'মদিনা'কে একবার 'নজরুলের অপ্রকাশিত নাটক' আরএকবার 'নজরুলের অপ্রকাশিত গীতি-আলেখ্য' রূপে উল্লেখ করেছেন :

> 'নজরুল অসংখ্য গীতিনাট্য, গীতিনক্সা, রেকর্ডনাট্য, গীতিআলেখ্য, নাটিকা রচনা করেছিলেন—কখনো বেতারের জন্য, কখনো রেকর্ড কোম্পানির তাগিদে, কখনো সিনেমার প্রয়োজনে। কবির সহকর্মী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন কেবলমাত্র বেতারের জন্য নজরুল কিছু কম একশোর মতো গীতিআলেখ্য রচনা করেছিলেন, রেকর্ড কোম্পানির জন্য যে আলেখ্যগুলি রচিত হয়েছিল, অনুমান করা যায় সে-সবের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এইসব হারিয়ে যাওয়া গীতিনক্সা বা রেকর্ড নাট্যের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমরা তিরিশটির মতো উদ্ধার করেছি। এছাড়া 'বিদ্যাপতি'র পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হয়েছে, পরিচিতিমূলক পুস্তিকা পাওয়া গেলেও 'সাপুড়ে'র পাণ্ডুলিপি বা মূল পাঠ পাওয়া প্রয়োজন। কবি যে অসংখ্য গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন 'মদিনা' শিরোনামে নাটকটি তাদেরই একটি। 'মদিনা'-র মূল পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। আবার কোনোটিতে সামান্য কিছু সংলাপ আছে। 'মদিনা'য় কোনো সংলাপ নেই। সম্ভবত এটি কোন গীতিনক্সা নয়, 'মদিনা'-কে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন কবি। তিনি নিজেও এটিকে 'নাটক' নামে অভিহিত করেছেন, লিখেছেন 'আমার 'মদিনা' নাটক।
>
> কবি প্রথমেই 'মদিনা'র কাহিনীটি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলেন, তারপর গানগুলি লিখে গেছেন পরপর। পূর্বলিখিত বহু গানও এ নাটকে স্থান পেয়েছে, তবে

অধিকাংশ গানই কাহিনীর পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো কোনোটির সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে শব্দে। যেমন ৬, ৭, ১৪, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯ এবং ৪৩ সংখ্যক গান। কোনো কোনোটি বহুল পরিবর্তিত—কেবল শব্দ নয়, পরিবর্তনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে নতুন চরণ—যেমন ১০, ১২, ১৫, ১৬ এবং ৩৬ সংখ্যক গানসমূহ। কয়েকটি গানে আবার কোনোরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজনই হয়নি, কাহিনীর সঙ্গে এই গানগুলি ঠিক মানানসই হয়েছিল—১৫, ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৭ এবং ৪২ সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর। বারোটি গান একেবারে নতুন—যা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি—এর মধ্যে কয়েকটি গান কেবল 'মদিনা'র জন্য লিখিত, এই বারোটি গান হলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৪ এবং ৪১ সংখ্যক গান। 'মদিনা'র গানের সংখ্যা ৪৩। কবির সকল নাটকে গানের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করার মতো। 'আলেয়া'য় গান আছে ২৮টি, 'মধুমালা'য় ছোটবড় মিলিয়ে ৪৫টির মতো।

কাহিনীটি মিলনান্তক। নায়ক কবি স্বয়ং যিনি 'নৌজোয়ান এবং যাকে ভালোবাসে বাংলার সব নরনারী', নায়িকা 'মদিনা'—যিনি মহারাজার মেয়ে এবং পর্দানশিন। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে নর্তকী ছাড়া আরও দু-একজন আছেন যাদের কোনো নামকরণ কবি করেননি। কাহিনীটি যে মিলনান্তক তার প্রমাণ রয়েছে শেষদিকের গানে (৪১ সংখ্যক) 'বিবাহের বাজল বাঁশি আজি মোর নৌজোয়ান জীবনে।' প্রথম গানেই কবিপুত্র 'সানি' এবং 'নিনি'র নামও উল্লেখিত হয়েছে।

'মদিনা' নাটকটির পরিকল্পনা কবি সম্ভবত সজ্ঞান মুহূর্তের একেবারে শেষের দিকে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা সংগীত রচনায় ছন্দ ও ভাবের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে এবং হস্তাক্ষরে যথেষ্ট আড়ষ্টতা ও বাঁকাচোরা ভাব লক্ষ্য করা যায়, বোঝা যায় রোগের আক্রমণ তখন শুরু হয়ে গেছে। সুঠাম দেহ থেকে নজরুলী যৌবন ঝরে যাবার মতো লেখা থেকে সেই অপরূপ লীলায়িত নজরুল ছন্দও উধাও হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে যে বানান আছে, যেমন যতিচিহ্নের ব্যবহার দেখেছি, যেমন ছন্দ পেয়েছি কোনো কিছু পরিবর্তন না করে সেভাবেই প্রকাশের জন্য দিলাম। আমার মনে হয় এভাবেই হুবহু উপস্থাপিত হলে, অনেকখানি 'নজরুল-সৌরভ' পাওয়া যেতে পারে।'

চলচ্চিত্রের গান

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

ধ্রুব

'ধ্রুব' চলচ্চিত্রটি কলকাতার পাইয়োনিয়র ফিল্মস কর্তৃক প্রযোজিত হয়। ম্যাডান থিয়েটার্সের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান পাইয়োনিয়র ফিল্মস। এই ফিল্মস কোম্পানিতে নজরুল

পরিচালক পদে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারি পাইয়োনিয়ার ফিল্মসের প্রথম ছবি 'ধ্রুব' কলকাতার 'ক্রাউন' হলে মুক্তি লাভ করে। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নজরুল একাধারে চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার ও গীতিকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও, 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে নজরুল নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং নারদের কণ্ঠে চারটি গানে অংশগ্রহণ করেন।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩ এবং 'চলচ্চিত্র জগতে নজরুল', অনুপম হায়াৎ, নজরুল ইন্সটিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮]

পাতালপুরী

কলকাতার কালী ফিল্মসের নির্মিত 'পাতালপুরী' চলচ্চিত্র ১৯৩৫ সালের ২৩শে মার্চ 'রূপবাণী' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। এই চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'পাতালপুরী'র গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত-পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। প্রযোজক : প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় নজরুলের সহযোগী ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। গান রচনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা ছাড়াও 'পাতালপুরী'তে নজরুল ইসলাম অভিনয়ও করেন। তিনি নাচগানরত সাঁওতালি মেয়েদের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে, ১৯৯৩ এবং 'চলচ্চিত্র জগতে নজরুল', অনুপম হায়াৎ, নজরুল ইন্সটিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮]

গোরা

'গোরা' চলচ্চিত্রের কাহিনী ও তিনটি গান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক নরেশ মিত্র। কাজী নজরুল ইসলাম 'গোরা' চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। সহকারী সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন। নজরুলের রচিত এবং সুরারোপিত 'ঊষা এল চুপি চুপি সলাজ নিলাজ অনুরাগে' গানটি 'গোরা' চলচ্চিত্রে গীত হয়। এই গানটিতে নেপথ্যে কণ্ঠ দান করেছেন শিল্পী ভক্তিময় দাশগুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন কলকাতার দেবদত্ত বাণীচিত্র। ঐ সময় কবি নজরুল ছিলেন দেবদত্ত বাণীচিত্রের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক।

দেবদত্ত ফিল্মস প্রযোজিত 'গোরা' চলচ্চিত্র ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুলাই কলকাতার 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তি লাভ করে।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩]

নন্দিনী

'নন্দিনী' চলচ্চিত্র নির্মিত হয় কলকাতার কে. বি. পিকচার্সের ব্যানারে। প্রযোজনায় : কুমুদরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। কাহিনীকার : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনিই চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। নজরুল এই চলচ্চিত্রের জন্যে একটি গান রচনা করেন। তাঁর সুরারোপিত গানটি হলো : 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিসরে'। এতে কণ্ঠ দেন শচীন দেববর্মন। 'নন্দিনী' চলচ্চিত্রের অন্যান্য গীতিকার সুবল দত্ত ও প্রণব দত্ত। সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক : হিমাংশু দত্ত (সুর-সাগর)। মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় 'নন্দিনী' ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার 'রূপবাণী' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক। বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩ এবং 'চলচ্চিত্র জগতে নজরুল', অনুপম হায়াৎ। নজরুল ইন্সটিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮]

চৌরঙ্গি (বাংলা)

'চৌরঙ্গি' ছায়াছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা এবং প্রযোজনা করেন এস. ফজলি। সংলাপ রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গীতিকার ও সঙ্গীত-পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেন কালীপদ সেন। এই চলচ্চিত্রের চতুর্থ গান 'আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়', রচনা করেন নবেন্দুসুন্দর এবং সুরারোপ করেন প্রখ্যাত সুরকার দুর্গা সেন। বাকি ৮টি গান নজরুলের রচিত এবং তাঁরই সুরারোপিত। 'চৌরঙ্গি' (বাংলা) চলচ্চিত্রটি ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে 'এমপায়ার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স'-এর পরিবেশনায় প্রথম মুক্তি লাভ করে।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক। বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩]

চৌরঙ্গি (হিন্দি)

হিন্দী 'চৌরঙ্গি' চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন এস. ফজলি। সহ-পরিচালক : নবেন্দু সুন্দর এবং আশুতোষ চক্রবর্তী। গীত রচনা করেন

কাজী নজরুল ইসলাম, মীর্জা গালিব, হজরত জিগর মুরাদাবাদি, আরজু লখিনউভি ও প্রতাপ লাখউনভি। সুরারোপে, সঙ্গীত পরিচালনায় ও আবহসঙ্গীত রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম। আবহ সঙ্গীত রচনায় তাঁর সহযোগী হনুমান পণ্ডিত শর্মা। এম্পায়ার টকি ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত ফজলি ব্রাদার্সের হিন্দি চলচ্চিত্র 'চৌরঙ্গি' ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই কলকাতায় নিউ সিনেমা হলে প্রথম মুক্তি লাভ করে।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩]

দিকশূল

'দিকশূল' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সংলাপ : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভোলানাথ মিত্র। চিত্রনাট্য প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মনুজ ভঞ্জ। পরিচালনায় : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, প্রণব রায় ও ভোলানাথ মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনা : পঙ্কজকুমার মল্লিক। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত 'দিকশূল' ১৯৪৩ সালের ১৪ই আগস্ট একযোগে কলকাতার মিনার, বিজলি ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩]

অভিনয় নয়

'অভিনয় নয়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গীতিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিনী চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক : গিরীন চক্রবর্তী। কালী ফিল্মস নির্মিত ও ইস্টার্ন টকিজ পরিবেশিত এই চলচ্চিত্রটি ১৯৪৫ সালের ২রা মার্চ কলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তিলাভ করে।

['চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩]

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯	১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।
১৯০৮	পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।
১৯০৯	গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।
১৯১১	মাথ্রুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১২	স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।
১৯১৪	কাজী রফিজউল্লাহ্র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১৫-১৭	রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।
১৯১৭-১৯	সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।
১৯২০	মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্তরে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু,

'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন : মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের অনুষ্ঠানে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা

প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি–বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল–বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'–এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু–মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল–পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্‌রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা ['চল্ চল্ চল্'] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দরুণ কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ। গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৪ 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চ, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
	গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল-বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাতীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান নজরুল-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুরসুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ--'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ— 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ— 'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ— 'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি, কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

কুহেলিকা — উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

নজরুল-স্বরলিপি — স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১।

চন্দ্রবিন্দু — গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।

শিউলিমালা — গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।

আলেয়া — গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।

সুরসাকী — গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।

বন-গীতি — গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ— 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।

জুলফিকার — গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।

পুতুলের বিয়ে — ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।

গুল-বাগিচা — গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ— 'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'

কাব্য-আমপারা — অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।

গীতি-শতদল — গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।

সুরলিপি — স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।

সুরমুকুর — স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।

গানের মালা — গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
সন্ধ্যামালতী	গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
নজরুল সঙ্গীত সমগ্র	সম্পাদনা : রশিদুন্নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬।

নজরুলের 'মদিনা' নাটকের গান প্রসঙ্গে

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডে (১৯৯৩ সালে প্রকাশিত নতুন সংস্করণ) 'মদিনা' নাটকের ৪৩টি গান রয়েছে। এই নাট্যগীতির গানগুলোর অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয়েছে : 'মদিনা' নাটকের গান এবং 'সুরথ উদ্ধার' পালার গান নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা থেকে গৃহীত। [দ্রষ্টব্য : পুনশ্চ] এই স্বীকৃতি ছাড়া 'মদিনা' নাটক সম্পর্কিত অন্য কোনো তথ্য নেই, গানগুলো ছাড়া নাটকের কোনোরূপ গদ্য বা পদ্য সংলাপও নেই। 'মদিনা' নাটকের অন্তর্গত বহু গানই বিখ্যাত এবং নজরুলের কোনো-কোনো গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডেও এসব বিখ্যাত গান শিল্পী-কণ্ঠে গীত হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডের (১৯৯৩) অন্তর্গত গানগুলোর বাণীর সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডের নাম্বার এবং কণ্ঠশিল্পীর নাম উল্লেখিত নেই, যদিও ফুটনোটে গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি আছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান 'নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ'-এ 'মদিনা' নাটকের গানের বাণীর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে যে পার্থক্য ও পাঠান্তর রয়েছে তা যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে নজরুল-সঙ্গীতের দুটি সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। গ্রন্থ দুটি হলো (১) কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক, সঙ্গীতজ্ঞ ও নজরুল-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা ও সদ্য পরলোকগত ডঃ ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ (২০০৪) এবং (২) ঢাকার 'নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬)। উল্লেখিত দুটি গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নাম্বার এবং কণ্ঠশিল্পীর নাম উল্লেখিত না থাকলেও শ্রী ব্রহ্মমোহন ঠাকুর 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ লিখেছেন যে, তিনি গানের বাণী সংগ্রহ করেছেন নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে, গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকে এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে (মুখবন্ধটি ২০০২ সালে রচিত)। বাস্তব কারণেই, উল্লেখিত দুটি সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়েই পার্থক্য ও ভিন্নতা দেখানো হয়েছে। ছোট ছোট শব্দ বা শব্দসমবায়ে গঠিত পংক্তির পার্থক্য এখানে পরিবেশন না করে গুরুত্বপূর্ণ অংশের পার্থক্য ও পাঠান্তর নিচে দেওয়া হলো :

‘মদিনা’ নাটকের গানের বাণীর পাঠান্তর

‘মদিনা’ নাটকের গান	‘নজরুল-রচনাবলী’ ৪র্থ খণ্ড ১৯৯৩	‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) ২০০৪
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. ইরানের রূপ-মহলের শাহজাদী শিরী	‘ইরানের রূপ-মহলের শাহজাদী শিরী’ ‘নজরুল-রচনাবলী’ (৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩)-এ কয়েকটি পংক্তি : ‘গলিল পাষাণ, আমি তোমার প্রিয়তম ফিরে এলাম বিরহী বিবাগী তোমার দেখার লাগি তুমি আমার প্রিয়তম হও, আমা পানে চাহো ফিরি এসো শিরী ! এসো শিরী।	‘ইরানের রূপ-মহলের শাহজাদী শিরী’ ‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) গ্রন্থে কয়েকটি পংক্তি ‘গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না বলে যে প্রেমিক মরেছিল তোমার প্রতিমা তলে, সেই বিরহীর রোদন যেন গো উঠিছে ভুবন ঘিরি।’
২. ছড়িয়ে বৃষ্টির বন-ফুল	‘ছড়িয়ে বৃষ্টির বন-ফুল’ ‘নজরুল-রচনাবলী’ ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩-তে দুটি পংক্তি : ‘ভুলে যাওয়া আমারে আবার ভালোবাসিলে কে॥’	‘ছড়িয়ে বৃষ্টির বন-ফুল’ ‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) ২০০৪ গ্রন্থে দুটি পংক্তি : ‘ফেলে যাওয়া বাসি মালায় আবার ভালোবাসিলো কে॥’

৩.	আমার গানের মালা আমি করব কারে দান	'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, 'নজরুল-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩-তে কয়েকটি পংক্তি : 'শাখায় ছিল কাঁটার বেদন মালায় ছিল সূচির জ্বালা, কণ্ঠে দিতে খুশী হই আমি মোর আনন্দের মালা বিরহে মোর প্রেম-আরতি জ্যোতির্লোকের অরুন্ধতী তার তরে মোর এই গান মালা মোর করনু তারে দান।'	'ছড়িয়ে বৃষ্টির বন-ফুল' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ২০০৪ গ্রন্থে কয়েকটি পংক্তি : 'কথায় আমার কাঁটার বেদন মালায় সূচির জ্বালা কণ্ঠ দিতে সাহস না পাই অভিশাপের মালা (ঐ) আঁধারলোকের অরুন্ধতী নাম না জানা সেই তপতী তারি তরে গান মালা করব তারে দান।'
৪.	পলাশ ফুলের গেলাস ভরি	'নজরুল-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩-তে কয়েকটি পংক্তি : 'ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায় ঘুমাব মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায় বনের শাখা ঢুলাবে পাখা ঝরিবে রাঙা ফুল কপাল চুমিয়া।'	'নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায় ঘুমাব মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায় বনের শাখা ঢুলাবে পাখা ঝরিবে রাঙা ফুল কপাল চুমিয়া।'

রং ছড়ালে	‘গোধূলির রং ছড়ালে’ ‘নজরুল-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩-এ গানটির মাত্র চারটি পংক্তি : ‘গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে। বিবাহের বাজল বাঁশী আজি মোর নৌজোয়ানী জীবনে নতুন করিয়া আমার বাঁচিবার সাধ জাগে সুন্দর লাগে ধরা মোর আনন্দিত নয়নে॥	‘গোধূলির রং ছড়ালে’ ‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) ২০০৪ গ্রন্থে গানটি নিম্নরূপ : ‘গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে। মিলনের বাজে বাঁশী আজি বিদায়ের লগনে॥ এতদিন কেঁদে কেঁদে ডেকেছি নিঠুর মরণে আজি যে কাঁদি বঁধূ বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥ আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে, সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে। হইলে ধন্য প্রিয় মরণ-তীর্থ মম, সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে শেষ জীবনে এলে কে মোর সাঁঝ গগনে।

নজরুলের 'হরপ্রিয়া' শীর্ষক গীতি-গ্রন্থ প্রসঙ্গে

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-তে ইতিপূর্বে 'হরপ্রিয়া' নামে কোনো গীতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩১ সালে রচিত নজরুলের 'হরপ্রিয়া' নামে কোনো গ্রন্থ কবির জীবদ্দশায়—এমনকি মৃত্যুর পরও সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি, যদিও ১৯৩১ সালে রচিত হবার পর 'হরপ্রিয়া' গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করা হয়। 'হরপ্রিয়া'র অন্তর্গত গানগুলো সংকলিত হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত (২০০৪) এবং প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও নজরুল-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে (২০০৪)। সংকলিত গানগুলোর নিচে গ্রামোফোন রেকর্ডের নাম্বার এবং কণ্ঠশিল্পী বা শিল্পীদের নাম উল্লেখিত না থাকলেও, শ্রী ব্রহ্মমোহন ঠাকুর গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ (২০০২ সালে রচিত) উল্লেখ করেছেন যে গানগুলোর বাণী সংগৃহীত হয়েছে আদি গ্রামোফোন থেকে, গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীর প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকে। 'হরপ্রিয়া'র অন্তর্গত সবগুলো গান যথাসম্ভব 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের গানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনও করা হয়েছে। স্থান-সংকোচনের কারণে পাঠান্তরে স্তবক বিন্যাস সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়নি।

শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট রয়ে গেছে, এ-জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)-এর মূল সম্পাদক বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এবং সদস্য পরলোকগত ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর

'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থ	'নজরুল-রচনাবলী'	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. '(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী'	'(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জিনী' কোরাস গান (শিবরঞ্জিনী')। প্রথমে একটি গান ছাড়াও (স্তবক সংখ্যা চার) সৈন্ধবী, হরপ্রিয়া ও সৈন্ধবীর কণ্ঠের তিনটি স্তবকবিশিষ্ট কাব্য-সংলাপ রয়েছে। সংলাপে অন্ত্যমিলহীন চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।	'(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জিনী' কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত এবং ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে (২০০৪) গানটি থাকলেও সৈন্ধবী, হরপ্রিয়া ও সৈন্ধবীর কাব্য-সংলাপ নেই। 'নজরুল ইন্সটিটিউট' প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থেও (২০০৬) কাব্য-সংলাপ নেই।

২.	মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী	'মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী' 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থে কয়েকটি পংক্তি : 'সচকিত ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে পূবালী হাওয়া কানন-পথে নীপ কেশর বরষে।' 'নজরুল-রচনাবলী'তে গান ছাড়াও 'হরপ্রিয়া' ও 'সাবন্তী'র কাব্য-সংলাপ রয়েছে।	'মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থে পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'চকিত হয়ে ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে গালিয়া পড়ে মেঘ সুর শুনি হরষে 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে গান ছাড়া কোনো কাব্য-সংলাপ নেই। 'নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থেও একই রূপ।
৩.	মেঘবিহীন খর বৈশাখে	'মেঘবিহীন খর বৈশাখে' 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থে 'মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে' গানটি ছাড়াও 'হরপ্রিয়া' ও 'নীলাম্বরী'র কাব্য-সংলাপ রয়েছে।	'মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে' 'নজরুল ইন্সটিটিউট' প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থে (২০০৬) শুধু গানটিই আছে। হরপ্রিয়া ও নীলাম্বরীর কাব্য-সংলাপ নেই।
৪.	নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়	'নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়' 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থে 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়' গানটি ছাড়াও হরপ্রিয়া, সাহানা'র অন্ত্যমিলহীন কাব্য-সংলাপ আছে।	'নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থে (২০০৪) শুধু 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়' গানটিই আছে, কোনো কাব্য-সংলাপ নেই। 'নজরুল ইন্সটিটিউট' প্রকাশিত (২০০৬) 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থেও একই।

৫. যখন আমার গান ফুরাবে	'যখন আমার গান ফুরাবে' 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'হরপ্রিয়া' গ্রন্থে গানটি ছাড়াও হরপ্রিয়া, ও মল্লার-এর অন্ত্যমিলহীন কাব্য-সংলাপ রয়েছে।	'যখন আমার গান ফুরাবে' 'নজরুল-গীতি (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) শুধু গানটি আছে, কোনোরূপ কাব্য-সংলাপ নেই। তবে গানের প্রতি স্তবক শেষে 'তখন এসো ফিরে' পংক্তিটি রয়েছে। 'নজরুল ইন্সটিটিউট' প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে 'এখন এসো ফিরে' পংক্তিটি গানের শেষাংশে একবার মাত্র পুনরাবৃত্ত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থেও কোনো কাব্য-সংলাপ নেই।
৬. ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা	'ঝরঝর ঝরে শাওন ধারা' 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'হরপ্রিয়া' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। 'নজরুল ইন্সটিটিউট' প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত গানটির বাণী অভিন্ন।	'ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা'

পরিশিষ্ট

নজরুল-সৃষ্ট
রাগ ও বন্দিশ
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নজরুল বিশ শতকের তিরিশ দশকের শেষ এবং চল্লিশ দশকের সূচনাতে কলকাতা বেতারকে কেন্দ্র করে অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী উদ্ধার এবং নতুন রাগ সৃজনের যে ব্যতিক্রমধর্মী কাজটি করেছিলেন তার ফলে বেশ কয়েকটি নতুন রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলো তিনি বাংলা গানের বাণী অবলম্বন পূর্বক করেছিলেন। যার মধ্যে ১৮টি গান ছিল—তাঁর সৃষ্ট রাগভিত্তিক রাগগুলো হলো—নির্ঝরিনী, বেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, দোলনচম্পা, দেবযানী, অরুণরঞ্জনী, শঙ্করী, রুদ্র ভৈরব, অরুণ ভৈরব, শিবানী ভৈরবী, যোগিনী, আশা ভৈরবী, শিব সরস্বতী, উদাসী ভৈরব, রমলা। এই আঠারোটি রাগকে হিন্দুস্থানি বন্দিশে রূপান্তরিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তা মুদ্রিত করেছেন 'নজরুল সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ' গ্রন্থে (ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, জুলাই ২০০০)' বলা বাহুল্য যে এটি একটি দুরূহ ও প্রশংসনীয় কাজ। 'নজরুল-রচনাবলী' জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ৮ম খণ্ডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত নজরুলের সৃষ্ট আঠারোটি রাগের বন্দিশ তাঁর গ্রন্থ থেকে সংকলিত করা হলো। 'গ্রন্থকারের কথা'য় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নজরুল-সৃষ্ট রাগ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তার মূল্যবান অংশ সংযোজন করা হলো।

'১২ই নভেম্বর ১৯৩৯ সাল সকালে জগৎ ঘটক রচিত 'উদাসী ভৈরব' বেতারে প্রচারিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং নাটিকার গানগুলি রচনা করেন ও সুরারোপ করেন। জগৎ ঘটক-এর বর্ণনা অনুযায়ী—'সুরেশদা কবিকে ভৈরব রাগের প্রচলিত রূপ এড়িয়ে নতুন সুরের রূপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। কবি সেই নিয়ে মেতে উঠলেন, এমনকি ঘুমের মধ্যেও রাগ-রাগিণীর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। নতুন ভৈরব রাগের উদ্ভাবন করলেন অরুণ ভৈরব, উদাসী ভৈরব, রুদ্রভৈরব ইত্যাদি।

'উদাসী ভৈরব' একটি নাটিকা আমাকে দিয়ে লেখালেন। তাতে তাঁর ছয়টি নতুন ভৈরব ও ভৈরব অঙ্গের উদ্ভাবিত রাগের গান যোগ করে একটি চমৎকার গীতিনাট্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে গানগুলির স্বরলিপিও করে ফেললাম।

১লা নভেম্বর, ১৯৩৯ 'বেতার জগতে' 'উদাসী ভৈরব' নাটিকাটির একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রখ্যাত গবেষক অমলকুমার মিত্র-র কাছে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর নাটিকাটির সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছেন—

১। রাগ–অরুণ ভৈরব

পিতা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান সংবাদ শ্রবণে সতী শিব সমীপে আগমন করিলেন ভৈরবী ও যোগিনীগণের সহিত, অনুমতি লাভের আশায়। ধ্যানস্থ শিবকে তিনি অরুণ ভৈরব গাহিয়া জাগাইতেছেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙতে শিব সতীকে যাইতে অনুমতি দিলেন না। বলিলেন এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতেছে প্রজাপতি দক্ষের কু–বুদ্ধি প্রণোদিত। ইহার পরিণাম অশুভ। তথাপি সতী নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন পিত্রালয়ে।

[গান : জাগো অরুণ–ভৈরব জাগো হে শিব ধ্যানী। শিল্পী : নিতাই ঘটক, গীতা মিত্র, ইলা ঘোষ প্রমুখ]

২। রাগ—আশা ভৈরবী

সতীর বিচ্ছেদে শিব কাতর হইয়া পড়িলে, কি এক অজানা আশঙ্কায় চিত্ত তাঁর ভরিয়া উঠিল। এই সময়ে 'আশাভৈরবী' সান্ত্বনা দিলেন ত্রিদিবনাথকে—প্রভো, মিথ্যা আশঙ্কা ত্যাগ করুন।

[গান : মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ। শিল্পী : গীতা মিত্র]

৩। রাগ—শিবানী ভৈরবী।

কিন্তু আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। শিবানী ভৈরবী আসিলেন দুঃসংবাদ বহন করিয়া—

যজ্ঞ সভাস্থলে শিবকে নিন্দা করিলেন প্রজাপতি দক্ষ ; সেই নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

[গান : ভগবান শিব জাগো জাগো। শিল্পী : গীতা মিত্র]

৪। রাগ—রুদ্র ভৈরব।

সতীর দেহত্যাগ সংবাদ শ্রবণে শোকাতুর শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে দক্ষ সতীর দেহত্যাগের কারণ সেই দক্ষের ছিন্নমুণ্ডে যজ্ঞের আহুতি প্রদান করিবেন। স্বীয় ছিন্নজটা হইতে সৃষ্টি করিলেন বীরভদ্রকে—আপনার তেজ ও শক্তি দিয়া তাহাকে পাঠাইলেন দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিতে।

[গান : এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর। শিল্পী : নিতাই ঘটক]

৫। রাগ—যোগিনী।

রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্যে ও প্রলয়ংকর মূর্তিতে সৃষ্টি ধ্বংস পায়। তাই 'যোগিনী' আসিলেন শিবকে শান্ত করিতে।

[গান : শান্ত হও শিব, বিরহ বিহ্বল। শিল্পী : গীতা মিত্র।]

৬। রাগ—উদাসী ভৈরব।

রুদ্র শিব শান্ত হইলেন ; কিন্তু সতীর বিরহে কাতর। তাই তাঁহার মায়ামগ্ন চিত্ত একবার সান্ত্বনা লাভ করিতেছে, একবার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের বিধাতা ভগবানের এ মূর্তি ভক্তের চোখে কত সুন্দর, কত মধুর।

[গান : সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে। শিল্পী : অনিল বাগচী]

* বন্ধনীস্থিত গান ও শিল্পী পরিচিতি 'বেতার জগতে' ছিল না। পাঠকের সুবিধার্থে সংযোজিত হলো।

১২ই নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখে বেতার জগতে অনুষ্ঠান পরিচিতি এরূপ—

'সকাল ৯টা ১৫মি—উদাসী ভৈরব
পরিকল্পনা : কাজী নজরুল ইসলাম
রচনা : জগৎ ঘটক
গীত রচনা ও সংগঠনা : কাজী নজরুল ইসলাম'

নাটিকাটির শুরুতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সম্পর্কে পাণ্ডুলিপিতে নজরুল লিখেছেন, 'ভিখার বা বসন্ত থেকে ভৈরোঁতে'। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্য সংগীত আকাদেমি 'উদাসী ভৈরব' নামক যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন তাতে 'ভিখার' রাগের উল্লেখ নেই। 'ভিখার' রাগটি একটি পুরাতন লুপ্ত রাগ যা নজরুল পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং ৩০শে অক্টোবর ১৯৪০ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় বেতারে প্রচারিত হয়। 'বেতার জগতে'র বিবরণ হতে আমরা জানতে পারি—'দেশে বহু রাগরাগিণী অপ্রচলিত হতে হতে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে—এইসব রাগিণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন কবি নজরুল ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এঁরা বহু লুপ্তপ্রায় রাগরাগিণীর পুনরুদ্ধার করে হিন্দুস্থানি সংগীতে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। এবারে এদের আলোচ্য রাগ-ভিখার, এই অনুষ্ঠানটির অধিবেশন হবে ৩০শে অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যা সাতটায়।' রাজ্য সংগীত আকাদেমির মতো প্রকাশনা হতে প্রকাশিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থে বহু ভ্রান্তি থাকায় ভাবী প্রজন্ম সত্য তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞাতই রয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন বোধ করি। ঐ একই গ্রন্থে এমন সব গানেরও উল্লেখ রয়েছে যা 'উদাসী ভৈরব' নাটিকার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। গানগুলির স্বরলিপিকার হিসাবে নিতাই ঘটকের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে 'নবরাগ' নামক 'হরফ' প্রকাশিত স্বরলিপি গ্রন্থে জগৎ ঘটক-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। পরবর্তীকালে আকাদেমির গ্রন্থে সংশোধন করা হলেও কিছু সম্পর্কহীন গান বর্তমানেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এবার আসা যাক গানগুলি সহ রাগ বিশ্লেষণে। প্রথম গান 'জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো'। রাগ—অরুণ ভৈরব। কোথাও কোথাও দেখা যায় তাল—সাদ্রা। মনে রাখা প্রয়োজন 'সাদ্রা' নামে কোনও তাল নেই। সাদ্রা একপ্রকার গীতরীতি। সাদ্রা রীতির গান ঝাঁপতালে নিবদ্ধ হয়। সেহেতু গানটি ঝাঁপতাল। ধামারের মতো সাদ্রাও জনচিত্ত মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ধ্রুপদ ভাঙা গান। বৈজুবাওরা ও তাঁর শিষ্যপরম্পরায় এই প্রকার

গীতিরীতির রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সহ্‌দারা'—নামক স্থানে এই রীতির সূত্রপাত ঘটায় এর নাম 'সাদ্‌রা'।

নজরুল কর্মাবস্থায় থাকাকালীন গানটির কোনও রেকর্ড প্রকাশিত না হওয়ায় জগৎ ঘটক কৃত স্বরলিপি সুরের প্রামাণ্য বিবেচ্য। গানটির স্থায়ী অংশ বীররসাত্মক। অরুণ—সূর্য, ভৈরব—ভয়ঙ্কর। অষ্ট ভৈরব হলো—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার। অষ্ট ভৈরবের সব মূর্তিরূপই বীর-রসবোধক, অরুণ-ভৈরব রাগের গানটিও বীররসাত্মক।

দ্বিতীয় গান 'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ'। রাগ—'আশা-ভৈরবী'। রাগটির নামকরণেই 'ভৈরবী' উল্লেখ করা হয়েছে। ভৈরবীর জন্য—রাগ দুটি হলো আশাবরী (ভৈরবী-ঠাট) ও শুদ্ধ-শাওন্ত। গানটির বাণীর মধ্যেই রাগ-গায়নের সময়ের ইঙ্গিত রয়েছে।

তৃতীয় গান 'ভগবান শিব জাগো জাগো'। রাগ—'শিবানী ভৈরবী'। রাগটির আরোহণ ক্রম পূর্বাঙ্গ শিবরঞ্জনী ও উত্তরাঙ্গ আশাবরীর মতো করুণ রস প্রকাশক।

চতুর্থ গান 'এসো শংকর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর।' রাগ 'রুদ্র ভৈরব'। কবির সুস্থাবস্থায় গানটির কোনও রেকর্ড প্রকাশিত হয়নি। গানটি ধ্রুপদাঙ্গের রাগ-প্রধান গান বলা যায় এবং বাণীও ধ্রুপদের মতো হিন্দু ধর্মীয় সংগীত। ধ্রুপদ-সংগতে যে সব তাল ব্যবহৃত হয় এই গানটি সে মতো সুরফাঁকতালে নিবদ্ধ। গানটির স্থায়ীতেই রাগের নাম ব্যবহৃত হয়েছে, যা নজরুলের এক বিশেষত্ব। শুরুতেই মধ্য-সপ্তকের ষড়জ থেকে তার-সপ্তকের ষড়জে 'ছুট'-এর অলংকার প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্তরার বাণী স্পষ্টত হিন্দু ধর্মীয়ভাব হওয়ায় ধ্রুপদ-এর সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। গানের বাণীর সংঘাত, প্রলয়, ধ্বংস, শক্তিমত্তা প্রভৃতি ব্যবহৃত রূপক শব্দগুলি রাগের নামকরণ 'রুদ্র' শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধ্রুপদের রীতি অনুযায়ী গানটি তিন-সপ্তকব্যাপী বিস্তৃত।

পঞ্চম গান 'শান্ত হও শিব, বিরহ বিহ্বল।' রাগ—'যোগিনী'। রাগটির চলন সাপেক্ষে টোড়ি ঠাটের জন্য—রাগ বিবেচিত হতে পারে। আরোহণে পূর্বাঙ্গে তোড়ি ও উত্তরাঙ্গে আশাবরীর ছায়া, অবরোহণে পূরবীর আভাস পাওয়া গেলেও ম্লান।

ষষ্ঠ গান 'সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে'। রাগ—'উদাসী ভৈরব'। নাটিকার নামানুসারে 'শেষ রাগটির নামকরণ এবং কবির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গানের প্রথমেই 'উদাসী ভৈরব' শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়েছে। রুদ্রের যে অষ্টমূর্তি পূর্বেই বলা হয়েছে, সেই শিব আজ সতী-বিরহে কাতর। তীব্রমধ্যম ও কোমল নিখাদের অপূর্ব সুর-সম্পর্ক এই উদাসী রূপটি পরিস্ফুট করেছে। এ রাগটি নজরুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গানটির মধ্যে ভৈরব-এর বিন্দুমাত্র ছায়া বোধগম্য হয় না, অথচ সুর বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে ভৈরবের বৈশিষ্ট্য। রাগের আরোহণে (সা <u>রে</u> গ মা মম ম <u>নি</u> সা <u>রে</u> সা) শুদ্ধ মধ্যমকে সুর ধরলে আরোহণ দাঁড়ায় 'প ধ নি সা <u>রে</u>সা <u>রে</u>মপ <u>ধ</u>প' এরূপ।

১৯৪০ সালের ১৩ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় বেতারে প্রচারিত হয় 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের ছয়টি গানের মধ্যে শৈল দেবী গেয়েছিলেন দুইটি রাগ (মীনাক্ষী

ও বনকুন্তলা) এবং গীতা মিত্র (বর্তমানে গীতা বসু) গেয়েছিলেন চারখানি রাগ (নির্ঝরিনী, বেণুকা, সন্ধ্যামালতী ও দোলনচম্পা)। 'বেতার জগতে' পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নরূপ—

'সন্ধ্যা ৭-২০ মি.—নবরাগ মালিকা
রচনা ও প্রযোজনা—কাজী নজরুল ইসলাম
বর্ণনা—অনিল দাস
ব্যঞ্জনা—গীতা মিত্র ও শৈল দেবী'

১৬ই জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখে 'বেতার জগতে' গীতিনাট্যটি প্রকাশিত হয়। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর 'বেতারে নজরুল' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গানগুলির কেবল প্রথম পঙ্ক্তি উল্লেখ করলাম এবং বর্ণিত রাগ পরিচয় বন্দিশের সঙ্গে থাকায় পরিত্যাগ করলাম অযথা কলেবর বৃদ্ধি না হওয়ার কারণে।

'নবরাগ মালিকা
—কাজী নজরুল ইসলাম

নিবিড় অরণ্য মাঝে বয়ে যায় ঝর্নাধারা
অবিচ্ছিন্ন ঝরঝর সুরের প্রবাহ
পাখির পালক বাঁধা তীর-ধনু হাতে
গেয়ে ওঠে ঝর্নাতীরে বনের কিশোর—

রাগিণী নির্ঝরিণী—তেতালা

[গান : রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম কে বাজায় জল ঝুমঝুমি।]

শুনিতে শুনিতে সেই ঝরনার সুর
আনমনা হয়ে যায় বনের কিশোর।
ফেলে দিয়ে তীর ধনু শীর্ণা ঝর্নাজলে
সরল বাঁশিতে তুলে তরলিত তান।
সজল ঝর্নার বুকে ছিল যে বেদনা
তাই যেন ফুটে ওঠে পাহাড়ি বাঁশিতে।
ছিল সেই বনে এক অরণ্য কুমারী
চন্দ্রা নাম তার; শুনি সেই বেণুরব
ভুলে যায় চঞ্চলতা আঁখি সকরুণ
কহে তার প্রিয় সখী রূপ মঞ্জরীরে—

রাগিণী বেণুকা—তেতালা

[গান : বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া বনে।]

শুনি সেই গান—যেন বনের মর্মর।
বনের কিশোর আসে বাঁশরি বিসরি।
হেরিয়া কিশোরে চন্দ্রা আনত নয়ানে
অনামিকা অঙ্গুলিতে জড়ায় আঁচল।
যত লাজ বাধে, তত সাধে মনে মনে
হে সুন্দর থাকো হেথা আরো কিছুক্ষণ।
মুঠি মুঠি বনফুল চন্দ্রা পানে হানি
মৃদু হাসি গেয়ে ওঠে বনের কিশোর—

রাগিণী মীনাক্ষী—তেতালা

[গান : চপল আঁখির ভাষায় মীনাক্ষী।]

শরমে মরমে মরি পলাইয়া যায়
প্রথম প্রণয়-ভীরু চন্দ্রা দূর বনে
সন্ধ্যামালতীর কুঞ্জে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
কি যেন অসহ দুখে, অজানা পীড়ায়।
দেখিলে চাহিতে নারে মুখপানে তার
না দেখিলে প্রাণ আরো করে হাহাকার।
আবার বাজিয়া ওঠে বাঁশি যেন বুকে
কাছে এসে তারে তার প্রিয় সখি—

(চন্দ্রার রূপমঞ্জরীর গান)
রাগিণী সন্ধ্যামালতী—আদ্ধা-কাওয়ালি

[গান : শোনো ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী।]

বক্ষে দোলে নব অনুরাগের মালিকা
চক্ষে বহে অকরুণ অশ্রু নির্ঝরিণী
তবু চাহিল না বৃন্দা বনের কিশোরী
চন্দ্রা আঁখি তুলি ! অকারণ অভিমানে
ফিরে গেল ম্লান মুখে বনের কিশোর
চলি গেল আন্‌পথে মুখ ফিরাইয়া।
গহন অরণ্য পথে ফেলে রেখে বাঁশি
ফিরে এসে সেই সন্ধ্যামালতী বিতানে
লুটাইয়া কাঁদে চন্দ্রা বলে, ‘হে নিষ্ঠুর,
কেন তুমি জোর করে ভাঙিলে না লাজ ?

হে অন্তর্যামী কেন অন্তরের ব্যথা
বুঝিলে না? কেন তুমি ভুল বুঝে গেলে?'

রাগিণী বনকুন্তলা—তেতালা

[গান : বনকুন্তল এলায়ে বন-শবরী ঝুরে।]

ফিরে আসিল না আর বনের কিশোর
ঘরে ফিরিল না আর বনের কিশোরী।
মাধবী চাঁদের বুকে কৃষ্ণ লেখা হয়ে
দেখা দেয় আজো সেই কিশোরের ছায়া।
কাঁদে চাঁদ সেই বিরহীরে বুকে ধরি
আনন্দে কলঙ্কী নাম করিল বরণ।
বনের কিশোরী চন্দ্রা সেই চাঁদ পানে
চাহিয়া বনের বুকে বিসরিয়া তনু
ধরিল দোলনচম্পা রূপ এ ধরায়
জনম লভিয়া পুন হেরিতে কিশোরে!
আজো দোল পূর্ণিমার রাতে বিকশিয়া
ঝরে যায় বিরহের প্রখর বৈশাখে
বারেবারে জন্ম লভে মরে বারেবারে
তবু তার প্রেমের সে অনন্ত পিপাসা
মিটিল না মিটিবে না বুঝি কোনোকালে।
অনন্ত এ বিরহের রাস-মঞ্চে তার
অচ্ছেদ্য মিলন-লীলা চলে অনিবার।

রাগিণী দোলনচম্পা—তেতালা

[গান : দোলন-চাঁপা বনে দোলে দোলপূর্ণিমা রাতে।]

পরে গীতা মিত্রর কণ্ঠে বেণুকা ও দোলনচম্পা রাগের গান দুইটির রেকর্ড প্রকাশিত হয় সোনেলা কোম্পানি থেকে এপ্রিল, ১৯৪০ সালে। রেকর্ড নং—কিউ, এস, ৪৬৫। এই রেকর্ডটি নজরুল-সৃষ্ট রাগে প্রথম রেকর্ড। সন্ধ্যামালতী রাগের গানটি ঐ বছরই শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠে গীত-রেকর্ড প্রকাশিত হয় কলম্বিয়া কোম্পানি থেকে। রেকর্ড নং—জি. ই. ২৫৫১। বনকুন্তলা রাগে কবি আরও একটি গান রচনা করেন—'(মোর) প্রথম মনের মুকুল'। সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে হিন্দুস্থান কোম্পানি থেকে জানুয়ারি, ১৯৪১ সালে রেকর্ড প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং—এইচ. ৮৭৬। সুপ্রভা সরকারের রেকর্ডে কবি রাগটির সামান্য পরিবর্তন করেছেন। বিবাদী স্বর হিসাবে কোমল নিখাদ ও শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার করেছেন।

দোলনচম্পা রাগটির নাম বিভিন্ন গ্রন্থে দোলনচাঁপা নামে দেখা যায়। কিন্তু কবি দোলনচম্পা নামকরণই করেছিলেন এবং 'বেতার জগতে'ও বারংবার এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। 'নবরাগ' স্বরলিপি গ্রন্থে সুরের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে গীতা মিত্র গীত রেকর্ডের সুরের পার্থক্য স্পষ্ট। মনে রাখা প্রয়োজন গীতা মিত্র-র রেকর্ড কবির তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল।

সন্ধ্যামালতী রাগে নিবদ্ধ গানটির নবরাগ বর্ণিত-সুর এবং শ্রীমতী রাধারাণী গীত রেকর্ড ধৃত সুর-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, বহুকাল ব্যবধানে জগৎ ঘটক মহাশয় স্বরলিপি করায় (প্রায় আটাশ বৎসর ব্যবধানে ১৯৬৭-৬৮ সালে) কিছু স্মৃতিবিভ্রাট হতে পারে।

প্রথমে বাণীর পার্থক্য বিশ্লেষণ করা যাক—

জগৎ ঘটক কৃত স্বরলিপি

রাতের ভ্রমর হয়ে
সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকে তাহারে

বেতার জগৎ

নিশীথ ভ্রমর হয়ে
হেরো সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তাহারে

শ্রীমতী রাধারাণী গীত রেকর্ড ও গীতা বসু (মিত্র)-র নিকট শ্রুত

নিশীথের ভ্রমর হয়ে
হেরো সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তারে

১১ই মে ১৯৪০ তারিখে 'নবরাগ মালিকা' পর্যায়ের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বেতার জগতে অনুষ্ঠান পরিচিতি ছিল নিম্নরূপ—

'সন্ধ্যা ৭টা ৫ মি.—নবরাগ মালিকা
রচনা ও সংগঠনা—কাজী নজরুল ইসলাম
সংগীত সহযোগ—সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রীসঙ্ঘ;
বর্ণনা—অনিল দাস
বিভিন্ন অংশে—গীতা মিত্র, শৈল দেবী, সুপ্রভা ঘোষ

[এই অধিবেশনের সমস্ত রাগই কবি নজরুল ইসলাম কর্তৃক উদ্ভাবিত]'

এই অনুষ্ঠানে যে গানগুলি গীত হয়েছিল—

(১) দেবযানী—দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে—নবনন্দন

শিল্পী : শৈল দেবী

(২) অরুণরঞ্জনী—হাসে আকাশে শুকতারা হাসে—তেতালা

শিল্পী : গীতা মিত্র

(৩) রূপমঞ্জরী—পায়েলা বোলে রিনিঝিনি—ত্রিতাল।

শিল্পী : শৈল দেবী

(৪) বনকুন্তলা—মোর প্রথম মনের মুকুল—কাহারবা।

শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ

(৫) রমলা—ফিরিয়া যদি সে আসে—ত্রিতাল।

শিল্পী : গীতা মিত্র

(৬) শঙ্করী—শংকর অঙ্গলীনা যোগমায়া—একতালা (চতুর্মাত্রিক)

শিল্পী : শৈল দেবী

২৭শে জুন ১৯৪২ সালে প্রচারিত 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানটির গানগুলি সম্পর্কে এখনও আমরা অন্ধকারে, গীতা মিত্র (বসু)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে তাঁর স্মৃতিতে এখন আর আসছে না। যাই হোক, কবি সৃষ্ট আর একটি রাগেরও সন্ধান আমরা পাই। রাগটি হলো 'শিব-সরস্বতী'। কবি তাঁর 'জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী' গানটি 'শিব সরস্বতী—ত্রিতালে' সুর করেন এবং 'পাঠশালা', মাঘ ১৩৪৬ সংখ্যায় গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রন্থে দেখা যায় ১৩৪২ সাল। কিন্তু এ তথ্য ভ্রান্ত, কারণ ১৩৪২ সালে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশই করেনি।

জগৎ ঘটক-কৃত স্বরলিপি এবং গীতা বসু (মিত্র)-র নিকট পাওয়া সুর বা আদি রেকর্ড হতে শ্রুতি সুর তুলনা করে দেখা যায় যে 'সন্ধ্যামালতী' রাগ সহ কয়েকটি গানেরই সুর পরিবর্তন ঘটেছে।

নির্ঝরিনী

ঠাট—ভৈরব

জাতি—?—ষাড়ব

বর্জিত স্বর—আরোহে 'রে', 'ধ' ও 'নি' এবং অবরোহণে 'নি'।

(অবরোহণে 'নি' একেবারে বর্জন না করে গুপ্তভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, কেদার রাগের আরোহণে 'গ' গুপ্ত, তবে দ্রুতগতিতে মাঝে মাঝে 'নি' ব্যবহার দোষণীয় নয়)

বাদী—প

সমবাদী—র্সা

বিবাদী স্বর নি অবরোহণ গতিতে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ। (মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার বেশী হয়)

'রে' ও 'ধ' আন্দোলিত হয়।

সময়—প্রাতঃকাল।

'সা-প' স্বর-সঙ্গতি রাগ বিশেষত্ব পরিস্ফুটনে সহায়ক।

প্রকৃতি—চঞ্চল। (আরোহণে গতি ধীর ও অবরোহণে চঞ্চল)

সমপ্রকৃতির রাগ—জিল্‌ফ্‌। অবরোহণে জীল্‌ফ্‌ এর রূপ পরিস্ফুট হয়।

ন্যাস স্বর—'ম' (ম'-তে অপন্যাস করে 'রে'-তে ফিরে আসা প্রায়ই ঘটে থাকে)

আরোহ—সা প, গ ম প, র্সা।

অবরোহ—র্সা নিধ প, ম গ ম, রে সা।

পকড়—সা প, গমপ, মগম, রেসা, পসা।

আলাপ—সাপ, মপ, গমপ, মগম, রেসা, প গমপ, মগমপ, নিধ প, নিধ প ম রে, সা ধ প।

বিলম্বিত একতাল

ক্যায়সে পাউঁ বাঁশুরী কি দরশন,
লাগ গ্যয়ি উন্‌হে মেরি তন-মন।
এক বাত কহে বৃজকে লোগন,
ক্যায়সী রহুঁ ম্যায় ঘর শ্যাম বিন॥

সা-নিধ প	সা - - গম	(প) ম গম প	মগ মরে সাগ প
ক্যা য় সে S	পাঁ S S উ S	বাঁ S শু S S	রী S SS কি S S
৪		x	

গমপ সাঁ-সাঁ -	নিধ নিধ প -	প - মগ মরে	রে - সা -
দSSSSর S	শ ন S S	লা S গ S গ্যয়ি	উ S হে S
০		২	

গম প - -	- - - গমপ	সাঁ - - -	- - সাঁধপম গমরেসা
মেS রি S S	S S S তSন	ম S S S	S S ন SSS SSSS
০		৩	

প - গম প	নিধ প গম প	সাঁ - - -	গ গ ম প র্গমর্ম রেঁ
এ S কS ত	বা S তS ক	হে S S S	বৃ SSS জSS S
৪		×	

রেঁ - - রেঁরেঁ	সাঁ - - -	রেঁ সাঁ -	নিধ নিধ প গমপ
কে S S লোগ	ন S S S	ক্যা য় সী S	র হুঁ ম্যা SS য়
০		২	

মগমরে সাগমপ- -	- - - গমপ	সাঁ - - -	--সাঁধপম গমরেসা
ঘSSSরSSSSS	S S S শ্যাSম	বি S S S	S S ন S SS SSSS
০		৩	

রূপক (মধ্যলয়)

বনমেঁ কাহ্না বাঁশুরী বজাবত
রাধা রাধা সদা বংশী পুকারত।
বাঁশুরী বজাবত, গঁউয়া চরাবত
সব সখীয়ণ য়্যাসি শুনাবত॥

সা - প	প ধ	পম গম	রে রে সা	গ ম	প প
ব S ন	মে S	কাS হ্নাS	বাঁ শু রী	ব জা	ব ত
০	২	৩	০	২	৩

ধ প সাঁ	নিধ প	গম প	গম পধ পসাঁ	ধপ মগ	মরে সা
রা ধা রা	ধা S	সS দা	বং SS শীS	পুS কাS	রS ত

গ ম ধপ	সাঁ সাঁ	সাঁ সাঁ	সাঁ নিধ নিধ	রেঁ রেঁ	সাঁ সাঁ
বাঁ শু রীS	ব জা	ব ত	গ উ য়াঁ	চ রা	ব ত

গঁ মঁ পঁ	মঁগঁ মঁ	রেঁ সাঁ	গম পধ	পসাঁ ধপ গ	মরে মসা
স ব স	খীS S	য় ণ	য়্যাS SS	সীS শুS নাS	বS ত

বিস্তার—

(১) সা, নিধ প, সা, মগমরেসা, সা প, মপ, গমপ, রেসা।
(২) সা, গ ম প, মগ ম প, নিধ প, নিধ প ম রে, নিধ প সা।

(৩) সা প, গম প, সা গ ম প, মগমরে, সাগমপ, নিধপ, মগমরে সা।
(৪) গ ম রে সা, গ ম প, রে সা ম রে, প ম ধ প, গ ম প সাঁ।
(৫) সা প, গ ম প সাঁ, সাঁ নিধ প, ম গ ম রে, রেঁ সাঁ, নিধ প সাঁ।
(৬) প, গ ম প, ধ প, গ ম প সাঁ, নিধ প সাঁ।
(৭) সা রে সা গ সা প গ ম প, নিধ গ ম রে, নিধ প রে সাঁ।
(৮) ধ ম প, গ ম গ প, সাঁ প, রেঁ সাঁ, মঁ গঁ মঁ রেঁ, নিধ প সাঁ।
(৯) গ ম প সাঁ, রেঁ সাঁ মঁ গঁ, গঁ মঁ পঁ, রেঁ নিধ প সাঁ।
(১০) ধ প ম, গ ম নিধ, প সাঁ, রেঁ সা, মঁ গঁ মঁ রেঁ, প ধ ম প সাঁ।

সরগম (রূপক-মধ্যলয়)—

১। | সাঁসাঁসাঁ নিধপ মগম | রেসা মগ | পম ধপ | রেঁসাঁ গরেঁ মঁগঁ | পঁ - | - - |
০ ২ ৩ ০ ২ ৩

২। | গমপ গমপ রে | ধধপ মগম | রে সা | গমপ গমপ রে | সাঁসাঁসাঁ ধধধ | রেঁ সাঁ |
০ ২ ৩ ০ ২ ৩

| ধ-প ধপম রে | মগম গমপ | সাঁ মগম | গমপ সাঁ মগম | গমপ সাঁ | সা সঁ |

বোলতাল (রূপক-মধ্যলয়)—

১। | রেঁসাঁ মঁগ মরেঁ | সাধ গম | পসাঁ রেঁসাঁ | নিধ পম ধপ | মগ মরে | সাগ মপ |
| বS নS মেS | কাS SS | SS হ্বাS | বাঁS শুS রীS | বS জাS | বS তS |
০ ২ ২ ০ ০ ০ ০

২। | সাগ মপ মগ | পম ধপ | সাঁ - | মঁগঁ মঁরেঁ সাঁ | ধপ মগ | মরে সা |
| বS নS মেS | কাS SS | হ্বা S | বাS শুS রী | বS জাS | বS ত |
৩ ২ ৩ ০ ২ ৩

তান (রূপক মধ্যলয়)

১। | সপ মপ গম | রেসা মগ | পম ধপ |
২। | সাঁনি ধপ মগ | মরে পম | ধপ রেঁসাঁ |
৩। | সাঁসাঁ নিধ পম | গম গপ | মরে সা | পম ধপ রেঁসাঁ | গরেঁ মঁগঁ | পঁ - |
৪। | সাসা গগ মম | সাগ গম | প - | গগ মম পপ | গম মপ | সাঁ - |
৫। | পম গম পম | গম পম | গম রে | ধপ মপ ধপ | মপ ধপ | মপ গ |
| সাঁনি ধপ মগ | রেসা গরে | মগ প | রেঁসাঁ নিধ পম | গম ধপ | মপ সাঁ |

সরগম (বিলম্বিত-একতাল)

| সাগমপমপমগ গমধপমপধপ | সা - - ধ - - প - গ - - ম - - প - |
২ ০

| মগমরেসাগমপ, সাগমপ, সাগমপ |
৩

তান (বিলম্বিত-একতাল)

১। | সাসাগগসাগম- গগমমগমপ- | মপধপমপসা- রেসাগরেমগমরে |
২ ০

| সানিধপমগমরে গমপগমপগম |
৩

২। | মগমমপমপপ মপধপগমরেসা | সাধপসারেরেসাসা গরেমগমরে সা- |
০ ২

| সাসাপপধধমম পপগগমমরেসা | গমমপসা-গম, মপসা -,গমমপ |
০

বেণুকা

ঠাট—খাম্বাজ
জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ
বর্জিত স্বর—অরোহে 'গ'
বাদী—ম
সমবাদী—স
পূর্বাঙ্গ বাদী রাগ
সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
সমপ্রকৃতির রাগ-পাহাড়ী (খাম্বাজ ঠাটাশ্রিত) ও তিলককামোদ
প্রকৃতি—বক্র ও চঞ্চল
উভয় নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহে বক্রভাবে 'নি' ও অবরোহে নি'।
অবরোহে 'ধ' ও'গ' স্বরে কিঞ্চিৎ বিরাম
আরোহে 'নি' ব্যবহৃত হয়ে বিপরীত গতিতে ফিরে এসে মধ্যম থেকে পুনরায় আরোহণ করা রাগটির বৈশিষ্ট্য।
আরোহ—সা রেম, পনি ধম, প ধর্সা।
অবরোহ—র্সা নি প ধ ম, গ রে গ সা।
পকড়—সা রে ম, নি ধ প ধম, ম গ, রে গ সা।
আলাপ—
সা রে, ধ্ সা রে, নি্ প্, প্ নি্ ধ্ প্, ধ্ সা, রে গ সা, সা রে ম গ, প নি ধ প, প ধ ম, গ রে গ সা।

বিলম্বিত ঝুমরা

মধুর সুর বাঁশুরী বজাবত বাঁশুরীয়া।
শুনি মুরলী কি সুর ভুল গ্যয়ি ভরণ পানিয়া।

রেমপনি | ধম মগরেগ সা মপধ
মSধুS | রS সুSSS র বাঁSশুS
৩

| সাঁ - - | নি প পধ ম | মগরেগ সারেধ্সা |
| রী S S | ব জা বS ত | বাঁSশুS রিSয়াS |
× ২ ০ ৩

| রে ম পনিধম পধ |
| শু নি মুSরS লিS |

| সাঁ - - | সাঁ রেঁগঁ সাঁ ধসাঁ | রেঁমঁ গঁ রেঁগঁ | সাঁ - নি পধ |
| কি S S | সু SS র SS | ভুS ল গ্যS | নি S S ভর |

| সাঁ - - | নি প পধ ম | মগরেগ সারেধ্সা |
| ণ S S | S S পাS S | নিSSS য়াSSSS, |

একতাল (মধ্যলয়)

পানিয়া না ভরণে দেত বাঁশুরীয়া
বিচ রোকে মোহে এরি কাহ্নাইয়া।
আশ লাগত রহুঁ দিন রাতিয়াঁ
ছায় রহে মোর ন্যই যোবনীয়া॥

সা রে	মা মগ	রেগ সা	নি়ধ পধ	ম পধ	সাঁ -
পা নি	য়া নাঽ	ভঽ র	ণঽ দেঽ	ত বাঁশু	রি য়া
×	০	২	০	৩	৪

নি -	প পধ	ম ম	মগ রেগ	সারে পনি়	পধ সাঁ
বী ঽ	চ রোঽ	কে মো	হেঽ এঽ	রিঽ কাঽ	হ্নাই য়া

ম প	নি় ধপ	মপ সাঁ	সাঁরেঁ গঁ	সাঁ নি	নি প
আ শ	লা গত	রঽ হুঁ	দিঽ ঽ	ন রা	তি য়া

ধ সাঁ	সাঁ রেঁগঁ	রেঁমঁ গঁরেঁ	গঁসাঁ নি	প পনি়	পধ সাঁ
ছা য়	র হেঽ	মোঽ ঽর	ন্যঽ ই	যো বঽ	নীঽ য়া

বিস্তার—

১। সা, রে, ধ় সা রে, নি় প়, প় নি় ধ় প়, ধ় সা, রে গ সা।
২। সা রে, সা ম গ, রে গ, সা রে গ সা, মপ, নি় ধ প ধম, গ রে গ সা।
৩। ধ় সা, রে নি় প় ধ় সা, গ রে গ সা, ম প নি় ধ ম, প ধ ম, গ রে গ সা।
৪। সা রে মগ, পানি় ধপ, পধম, প ধ সাঁ।
৫। সা, সা রে, রে গ সা, পধম, রেগসা, প নি় ধম, সাঁ নি প ধ ম।
৬। সা রে, রে ম গ প, প নি় ধপম, প ধ, ধ সাঁ নি প, মগ, গসা, রে গ সা।
৭। ম গ সা রেগ সা, ম প, প ধ, ধ নি়, প নি় ধম, পধসাঁ রেঁ, নি প সাঁ।
৮। প ধ, মপধ, পধসাঁ, সাঁ রেঁ, নি প ধ ম, নি় ধম, প ধ সাঁ।
৯। সাঁ, নি প ধ ম প ধ সাঁ, রেঁ মঁ গঁ, রেঁ গঁ সাঁ।
১০। প ধ সাঁ রেঁ মঁ গঁ, নি প ধ ম গ, মঁ গঁ, রেঁ গঁ সাঁ।

সরগম (একতাল-মধ্যলয়)—

১। | রেম গ | পনি় ধ | মপ ধম | গরে গসা | রেম পনি় | ধম পসাঁ |
× ০ ২ ০ ৩ ৪

২। | নিপ সানি | প নি়ধ | পধ ম | রেঁম গরেঁ | গসাঁ রেম | গরে গসা |
× ০ ২ ০ ৩ ৪

| পধধ নি়ধপ | প-ধ ম-প | রে-ম সা-রে | গসারে ম, | গসারে ম | গসারে ম |

তান (একতাল মধ্যলয়)—

১। | রেম মরে | পপ মপ | গরে গসা | মপ ধর্সা | নিপ মপ | নিধ প |

২। | পপ সাসা | পপ ধপ | নিধ মগ | রেগ সারে | ম নিনি | পপ সা |

৩। | নিনি পপ | সাসা নিনি | রেঁরেঁ সাসা | গরেঁ গসা | নিপ নিধ | পধ সা |

৪। | সারে মগ | রেগ সারে | মপ নিধ | পধ মপ | ধর্সা নিপ | ধম পর্সা |
| রেঁরেঁ মঁমঁ | গঁমঁ রেঁগঁ | সারেঁ মঁগঁ | সারেঁ গঁসা | পধ সাপ | ধর্সা, পধ |

৫। | নিনি পপ | ধর্সা রেঁমঁ | গরেঁ গঁসা | নিনি পপ | ধর্সা ধম | পনি ধম |
| মপ পধ | পনি ধম | গসা রেগ | সারে মপ | নিধ মপ | ধর্সা ধর্সা |

সরগম (বিলম্বিত ঝুমরা)—

| সারেমপনিধপধ, মপধমগমরেগ, পনিধমপধর্সা, নি - - প ধ - - ম |
২

| রেমগপনিধমপ, ধর্সা-ধর্সা-ধর্সা,
৪

তান (বিলম্বিত ঝুমরা)—

১। | নিনিপপধর্সাধর্সা রেঁমঁগরেঁগসাধর্সা নিপধমপনিধপ মগরেগসারেমপ |
২

| নিধমপধর্সানিধ মপধর্সা, নিধমপ
২। | সারেমগসারেগ- রেমনিধমপধ-, মপধর্সানিপমনি, |
×

| ধপমগসারেমপ, রেমপনিমপধর্সা, নিপধমপধর্সা-, রেঁমঁগরেঁগঁসানিপ, |
২

| মপধর্সা - - মপ, ধর্সা - - মপধর্সা,
০

মীনাক্ষী

ঠাট—কাফী

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ

বর্জিত স্বর—আরোহে 'নি'

বাদী—রে

সমবাদী—প

বিশেষত্ব—অবরোহণে বক্রগতিতে 'ধ' ও 'গ' স্বরে যথাক্রমে নিখাদ ও মধ্যম স্বর ধরে আন্দোলন। বক্র ও চঞ্চল গতির জন্য 'মীনাক্ষী' নামকরণ।

সমপ্রকৃতির রাগ—নীলাম্বরী, কাফী ও হংসকিঙ্কিনী।

অরোহ—নি ধ সা নি রে, গ ম প, গমপধসাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধম, প, প ধ প, মগরে, গ সা।

উভয় ধৈবত ও গান্ধার ব্যবহৃত হয়, আরোহে শুদ্ধ ধৈবত ও গান্ধার এবং অবরোহে উভয় ধৈবত ও গান্ধার।

পকড়—নি ধ সানি রে, গমপ, ম গ রে, গ সা।

আলাপ—নি ধ সা নি রে, গমপ, নি ধ ম প গ রে, গ সা।

ত্রিতাল—মধ্যলয়

হিয়া মে ব্যসাউ তোহে প্যারে
তনমে মনমে নয়ননমে হমারে।
বংশী বজাবত গাবত মুরারী
নাচত হিরদয়মে শ্যাম গিরিধারী॥

সানি ধ সা নি	রে - গ ম
হিঽ য়া মে ব	সা ঽ উ তো
০	৩

প - - -	নিধ মপ ধ প	সাঁ ধ সাঁ সাঁ	নি ধ ম প
হে ঽ ঽ ঽ	প্যাঽ ঽঽ ঽ রে	ত ন মে ম	ন মে ন য়
×	২	০	৩

গ ম প গ	রে গম -ম সা
ন ন মে হ	মা ঽ ঽ রে
×	২

পানি ধম পধ সাঁ	সাঁ - সাঁ সাঁ
বঽ ঽং শীঽ ব	জা ঽ ব ত
০	৩

| সা গ রে রে | গ -ম সা - | র্সা ধ সা সা | নি ধ ম প |
| গা ব ত মু | রা ঽ রী ঽ | না চ ত হির্ | দ য় মেঁ ঽ |
× ২ ০ ৩

| গ ম প গ | রে গ - সা |
| শ্যা ঽ ম গি | রি ধা ঽ রী |
× ২

বিস্তার—

১। সা, নি ধ সা, প নি ধ সা রে, গ রে, ম গ রে, গ সা।
২। সারে, নি ধ সা নি রে, গ ম প, ম গ রে, গ সা।
৩। গ ম প ধ গ ম নি ধ প, প ধনি প, প গ রে, গ সা।
৪। গ রে নি ধ সা, নি গ রে, গ ম প, ম ধ প, ম গ রে, গ সা।
৫। গ ম প নি ধ প গ রে, প - ম গ রে, গ সা।
৬। রে গ ম প, গ ম নি ধ প, ধনি ম প, নি ধ র্সা।
৭। নি প ধ ম গ ম প, ধ নি র্গ রেঁ, প ধনি ম গ রে, গ সা।
৮। গ ম প নি ধ র্সা, প ধ রেঁ, ধ র্সা নি রেঁ, ধ নি র্গ রেঁ, র্গ সা।
৯। নি ধ ম প, ধ রেঁ নি ধ ম প, প ধনি ম প, গ ম প নি ধ র্সা।
১০। র্সা নি ধ র্সা নি রেঁ, র্সা র্গ রেঁ, র্গ র্সা,

সরগম—

১। | নিধ সানি রেগ মপ | নিধ মপ ধনি -নি | পম গরে গ -ম | নিধ সা নিধ সা |
০ ৩ × ২

২। | সারে পপ মগ রেসা | রেগ -গ সা - | গম ধধ নিধ পম | পধ -ধ ম - |
× ২ ০ ৩

| পধ র্সার্সা নিধ পম | ধনি র্গরেঁ র্গর্গ র্সা |
× ২

বোলতান ঃ—

১। | গম পগ মপ গরে | নিধ সানি রেসা গরে | গ - সা - | মগ রেসা গম প |
| হেঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | প্যাঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | রে ঽ ঽ ঽ | প্যাঽ ঽঽ রেঽ ঽ |
× ২ ০ ৩ ×

২। | সারে রেগ রেরে, গম | মধ পপ, পধ ধনি | ধধ, সানি ধম পধ | - - - - |
| হিঽ ঽঽ ঽঽ য়াঽ | ঽঽ ঽঽ মেঽ ঽঽ | ঽঽ বঽ সাঽ উঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ |
০ ৩ × ২

| পম গরে গ - | সারে গম পগ মপ |
| প্যাঽ ঽঽ রে ঽ | তোঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ |
০ ৩ ×

তান—

১। | গম পধ র্সানি র্রেসা | নিধ পম গরে গসা |
×

২। | পধ পনি ধর্সা নিধ | পম গরে গম প |
×

৩। | সারে গরে গম প | পধ নিধ র্সানি র্রে | র্সানি ধপ গরে গসা |
৩

৪। | পধ পপ ধনি ধধ | র্সানি র্রের্সা র্গর্রে র্গর্সা | নিধ পধ পম গরে |
০

| গসা গরে গম প |

৫। | সানি ধসা নিধ গরে | গম পগ মপ গম | নিধ পধ পম গরে |
০

| গসা নিধ গরে সা |

৬। | নিধ সারে সারে গম | গরে গম রেগ মপ | গগ মপ গম পধ |
×

| মম পধ মপ ধনি | পধ র্সার্রে র্মর্গ র্রের্গ | র্সানি ধপ মগ রেসা |

৭। | সারে রেগ রেরে, গম | মপ মম, পধ ধনি | ধধ, পধ র্সানি র্রের্সা |
০

| র্গর্রে র্গ - - | নিধ মপ ধ - | পম গরে গ - |

| গরে সানি ধসা গরে | গম পনি ধনি প |

সন্ধ্যামালতী

ঠাট—'পিলু' রাগের মত এই রাগকে কোন নির্দিষ্ট ঠাটাশ্রিত বলা যায় না।

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

বাদী—প

সমবাদী—সা

পূর্বাঙ্গ-বাদী রাগ।

রস—করুণ-স্নিগ্ধ-মধুর।

সমপ্রকৃতির রাগ—আরোহে পিলু, বাঁরোয়া, মূলতানীর রূপ এবং অবরোহে মূলতানীর রূপ ফুটে ওঠে।

আরোহে উভয় গান্ধার, মধ্যম ধৈবত ও নিখাদ ব্যবহৃত হয়।

আরোহ—নি সা গ রে, সা গ ম প, গ র্ম প, নি ধ ম, প নি র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ প, ম গ রে সা।

পকড়—নি সা গ রে, গ ম প, প ম গ, ধ প, ম গ রে নি সা।

আলাপ—নি সা, গ রে সা, রে নি ধ প, ম প, নি ধ ম, প নি সা, গ ম প, ধপ, র্ম গ রে, নি সা।

ত্রিতাল—মধ্যলয়

অবহুঁ ন আয়ে মোরে সজন
সাঁঝ আগ্যয়ি আঁধিয়া হোবন।
গ্যয়িথি কাহ্না গৌয়া চরাবন
ক্যয়সি কাটাউ ম্যায় রাতিয়া উন্হে বিন॥

| সাগ রেসা নি সা |
| অS বS হুঁ ন |
৩

| গ রে সা - | সাগ মপ র্ম প | নিধ ম প - | প নি র্সা র্সা |
| আ S বে S | মোS SS রে S | সাS জ ন S | সাঁ S ঝ আ |
× ২ ০ ৩

| গ রে র্সা - | পধ মধ প - | র্ম গ রে সা |
| গ্য S য়ি S | আঁS ধিS য়া S | হো S ব ন |

| নি ধ ম প | নি - নি - | র্সা - - র্গ |
| গ্য S য়ি থি | কা S হ্না S | গৌঁ S য়া চ |

| রে - র্সা র্সা | নির্সা র্গরে র্সানি ধ | প মগ র্ম প | প নি র্সা - |
| রা S ব ন | ক্যাS য়S সেS কা | টা SS উ ম্যায় | রা S S S |

| র্গ রে র্সা - | পধ মধ প - | র্ম গ রে সা |
| তি S য়া S | উS ন্হS হে S | বি S S ন |

বিস্তার—

১। সা, নি সা, গ রে সা, নি ধ প, নি ধ ম প, প গ রে সা।
২। নি সা গ রে সা, গম প, ধ প, মগ রে, নি সা।
৩। গ রে সা, প মগ, প ধ, ম ধ প, গ রে নি সা।
৪। গ ম প, প নি ধ ম প, প মগ, প নি গ রে সা।
৫। প, গ ম প, ধ প, নি ধ ম প, প মগ, নি গ রে সা।
৬। গ ম নি ধ, ম প নি, ধ ম প, প গ ম প ধ প, ধ ম প, গ রে সা।
৭। গ ম প নি ধ, গ মধ, মগ মপ, গ ম প নি, প নি সা।
৮। প ধ মপ গ ম প, প নি ধ ম প, প নি, নি সা গ রে সা।
৯। নি সা নি ধ প, গ রে সা, প গ রে সা নি, সা নি ধ প, মনি ধপনি সা।
১০। নি সা গ রে গ ম, গ রে সা রে নি সা, নি ধ প, প গ ম প, গ ম প নি সা।

সরগম—

১। | পম গপ মগ রেসা | পধ মধ পম গ | সানি ধপ গরে সা |
৩ × ২

| সানি ধপ গরে সা | গম পগ মপ "ন" |
০ ৩ ×

২। | গমপ নিধ ম প | নিসানি ধপ ম প | গরেসানি ধপমনি ধমপধ প |
০ ৩ ×

| গ- ম- - প - | গ - - রে - সা - |
২ ০ ৩

বোলতান—

১। | পম গম পধ প | গরে সানি সাগ মপ | নিধ মপ গরে সা | নিধ পম গরে সা |
| অS বS হঁS ন | আS ওS বেS SS | মোS SS রেS S | সS SS জS ন |
৩ × ২ ০

২। | পপ পপ গম পপ | ধধ ধধ মপ ধধ | নিনি নিনি পনি সা | পনি ধম গম প |
| অS SS বS SS | হঁS SS নS SS | আS SS য়েS S | সS SS জS ন |
৩ × ২ ০

তান—

১। | নিসা গরে সাগ মপ | মনি ধম গম প |
২

২। | পনি সাগ রেঁসা নিধ | পর্ম গরে সাগ মপ |
২

৩। | নিসা গরেঁ সনি সা | মনি ধম গম প | পধ র্মপ গর্ম প |
৩

৪। | পর্ম পধ গর্ম প | নিসা গরে সাগ মপ | সানি ধপ মনি ধপ | মপ নিসা গরেঁ সা

৫। | গরে সানি র্মগ রেসা | ধপ র্মগ নিধ পর্ম |
| সানি ধপ মনি ধপ | গরে সানি সাগ মপ |

৬। | সানি সাগ রেসা নিধ | মপ নিসা গম প | পর্ম গর্ম পধ প |
২

| মপ নিসা গরেঁ সানি | ধপ মনি ধম পগ | র্মপ গরে সানি সা |

৭। | রেসা গরে সাগ রেসা | পর্ম ধপ মনি ধপ | রেঁসা গরেঁ সাগ রেসা |
৩

| নিসা পনি সানি ধপ | র্মগ র্মপ মনি ধপ | র্মগ রেসা গম পনি |
| সা পর্ম পপ ধপ | র্মগ র্মর্ম সাগ রেসা |

বনকুন্তলা

ঠাট—বিলাবল
জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব
বর্জিত স্বর—আরোহে ম ও নি এবং অবরোহে ম,
অবরোহে প ও ধ স্বরে স্থিতি হওয়ায় ভূপালী থেকে পার্থক্য স্পষ্ট হয়।
বাদী—রে
সমবাদী—প
গ্রহ ও ন্যাস স্বর—রে
সময়—সন্ধ্যা
রস—করুণ

পূর্বাঙ্গবাদীরাগ

আরোহ—সা রে, গ প ধ প, ধ সাঁ।
অবরোহ—সাঁ নি ধ প গ রে, গ সা রে।
পকড়—সারে, গ সা রে, ধ় প়, ধ় সা।
আলাপ—সা রে, গ সারে, সা নি় ধ়, প়, ধ় সা, রে গ প, ধ প,
গরে পগ ধ প, সা রে গ সা।

ঝাঁপতাল (মধ্যলয়)

না বাজাও বাঁশুরী বাঁশুরীয়া
শুন পাবে মোরি শাষ-ননদীয়া।
একত বৈরী মোরী পার পড়োশিন
চরচা করত মোহে ইতন লোগন
ক্যায়সে যাঁউ তোরে পাস সাঁবরিয়া॥

রেগ	‖ সানি় ধ়প়	ধ় সা সা	রে -	রে - গসা
নাং	‖ বাS • SS	জা ও বাঁ	শু S	রী S বাঁS
	×	২	০	৩

গ প	ধপ গরে সারে	গ প	ধ প ধ
শু রী	য়াS SS শুS	ন পা	বে S মো
সাঁ -	সাঁ - রেঁ	গরেঁ সাঁনি	ধপ গরে রেগ ‖
রি S	শা S ষ	নS নS	দীS য়াS "না" ‖
‖ রে গ	প - ধ	সাঁ -	রেঁ - সাঁ
‖ এ ক	ত S বৈ	রী S	মো S রি
রেঁ -	রেঁ - গঁ	সাঁ নি	ধ প গ
পা S	র S প	ড়ো S	শি S ন

প প	ধ ধ প	র্সানি ধপ	র্রে - র্সা
চ র্চা	ক র ত	মোS হেS	ই S ত
র্সানি পধ	ধপ গরে সারে	গ প	ধ প ধ
নS লোS	গS নS ক্যায়	সে যাঁ	উ S তো
র্সা -	র্সা - র্রে	গরে র্সানি	ধপ গরে রেগ
রে S	পা S স	সাঁS বS	রিS য়াS "নাS"

বিস্তার—

১। সা, ধ্ সা, রে গ সা রে, প্ ধ্, প্ রে সা।

২। সা নি্ প্ ধ্, ধ্সা, গ রে, প, ধ প, রে গ প, গ রে, ধ্ সা রে, গ সা।

৩। সা রে, গ সা রে, সা রে প, ধ প, সা রে গ প ধ প, প গ রে গ সা রে, ধ্ সা।

৪। ধ্ সা রে গ সা রে, রে গ ধ প, নি ধ প ধ প, রে গ সা।

৫। প, প ধ প, রে গ ধ প, প গ রে গ সা, গ প ধ প, নি ধ প ধ র্সা।

৬। প গ রে, গ সা রে, গ নি ধ, প ধ র্সা, র্সা ধ, নি ধ প ধ প।

৭। প ধ, প নি ধ, প র্সা নি ধ, প ধ র্সা র্রে, র্সা নি ধ প।

৮। রে গ সা রে, গ প ধ প, ধ র্সা প ধ প, র্রে র্গ র্সা র্রে নি ধ প, ধ র্সা।

রাগটি কবির খুবই প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্থান' কোম্পানি থেকে কবিরই প্রশিক্ষণে 'মোর প্রথম মনের মুকুল' গানটি 'বন কুন্তলা' রাগে সুপ্রভা ঘোষ (সরকার) -এর কণ্ঠে রেকর্ড (এইচ-৮৭৬, জানুয়ারী ১৯৪১) প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে কবি রাগটির কিছু বৈচিত্র প্রয়োগ করেন। কোমল নিখাদ ও শুদ্ধ মধ্যম বিবাদী স্বর দ্বয় ব্যবহার করেন। সে মত—

৯। সা রে প, ধনি্ ধনি্ ধ প, প ধ র্রে, র্সা নি্ ধ, ধনি্ ধ প ম প, গ ম গ রে, সা গ রে গ সা।

১০। প ধ র্সা র্রে র্গ র্সা, র্সা নি ধ প ধ প, ধনি্ ধনি্ প ধ প, গ ম গ রে, গ সা ধ্ সা।

সরগম—

১। | রেগসা রেপগ | রে- -রে প | পধপ ধর্সানি | ধপ গরে "না" |

২। | সারে রেরে | পগ ধপ গরে | পধ ধপ নিধ | র্সানি র্রেগ র্সারে |
| নিধ পধ | প - নিধ | পধ প | নিধ পধ "না"।

বোলতাল—

১। | ধাসাসা সারেরে | রেগগগ রেগগগ সা | গপপ পধধ | ধর্সা র্সারে "না" |
| নাSS বা SS | জাSS SSS ও | বাঁSS শুSS | রিS য়াS |

২। | সারে রেগ | পগ রেগ সা | র্সানি ধপ | গরে গসা "না" |
| নাS SS | বাS জাS ও | বাঁS শুS | রীS য়াS |

তান—

১। | পধ র্সারে | র্গর্সা নিধ পধ | গপ রেগ | সারে গসা "না" |

২। | সানি় প়ধ় | সারে গসা পগ | ধপ নিধ | পধ র্সারে "না" |

৩। | রেসা গরে | সারে গপ ধপ | ধর্সা র্রেনি | ধপ গরে "না" |

৪। | ধপ র্সাধ | নিধ পধ র্সারে | র্গর্সা নিধ | পগ রেসা "না" |

৫। | সারে রেগ | গপ ধপ গপ | পধ ধনি | ধর্সা র্রের্সা ধর্সা |
| র্রের্গ র্সারে | ধর্সা নিনি ধপ | নিনি ধপ | নিনি ধপ "না" |

৬। | রেসা রেরে | রেগ রেগ সা | পগ পপ | পধ পধ র্সা |
| র্গরে র্গর্সা | নিধ পগ রেগ | সারে গপ | ধপ র্সা "না" |

দোলন চম্পা

ঠাট—কল্যাণ
জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ
বর্জিত স্বর—আরোহে 'রে'
গতি—বক্র ও আন্দোলিত
বাদী—ধ
সমবাদী—সা
সময়—সন্ধ্যাকাল
প্রকৃতি—করুণ ও দোলায়মান
সমপ্রকৃতির রাগ—হাম্বীর, মালবশ্রী, কামোদ, নট প্রভৃতি রাগের ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব ও তিরোবাব ঘটে।
আরোহ—সাগ ম' প, গম নি ধ, প নি ধ র্সা।
অবরোহ—র্সানি, ধনি, ধনি̱ ধ প ম' প, গম গম রে সা।
পকড়—সাগম'প, গ ম নি ধ, ধ নি̱ ধ প ম', গ ম রে সা।
আলাপ—সাগম'প, গ ম রে সা, গ ম নি ধ, প নি ধ র্সা, নি র্সা ধ নি̱ ধ প ম', গ ম রে সা।

ত্রিতাল (মধ্যলয়)

সখিরী—

ম্যায় শ্যাম বিনা ক্যায়সে কাটাউঁ
হির্‌দয় মন্দিরমেঁ উন্‌হে বসাউঁ।
মধুর বচন ম্যায় উন্‌হে কহুঁ
অঙ্গ-অঙ্গমেঁ লগায়ে রহুঁ॥

|| - সা গম' পগ | মনি ধপ নিধ র্সা | নি র্সা ধ নি̱ | ধ প ম' প |
|| S স খিS SS | SS SS রীS ম্যায় | শ্যা S ম বি | না S ক্যায় সে |
x ২ ০ ৩

| গ ম রে - | সা - - - | গ ম রে সা | গ ম' প প |
| কা S টা S | উঁ S S S | হি র্ দ য় | ম ন্দি র মেঁ |

| গ ম ধ ধ | পনি ধর্সা - র্সা |
| উ ন্ হে ব | সাৎ SS উঁ "ম্যায়" |

| প ম' প ধ | গ ম ধ - |
| ম ধু র ব | চ ন ম্যা য়্ |

| প নি ধপ নিধ | র্সা - - - | র্সা র্গ র্গ র্ম | রেঁ - র্সানি র্সা |
| উ ন্ হেS কS | হুঁ S S S | অ ং গ অ | ং গ লS S |

| ধ - - নি̱ | প - - র্সা |
| গা S য়ে র | হুঁ S S "ম্যায়" |

বিস্তার—

১। সা, রে সা, গ ম রে সা, সা নি, প নি ধ সা।
২। সা গ র্ম প, গ ম রে সা, গ র্ম প র্ম গ ম ধ, ধ নি ধ প র্ম প, গ ম রে সা।
৩। রে সা নি সা গ র্ম প ধ, গ ম নি ধ, র্ম প গ ম রে নি সা।
৪। গ ম নি ধ, ধ নি ধ প র্ম, প নি, ধ নি প ধ, র্ম প গ ম রে সা।
৫। সা ম গ র্ম প ধ প, প নি ধ সাঁনি, প নি ধ, গ ম নি ধ, গ ম রে সা।
৬। প র্ম গ ম ধ, প নি ধ সাঁ, রেঁ সাঁ, সাঁ নি ধ নি, ধ নি ধ র্ম প, গ ম ধ।
৭। র্ম প গ ম ধ, প নি ধ সাঁ, সাঁ গঁ মঁ রেঁ সাঁ, সাঁ ধ নি ধপ র্মপ।
৮। সাঁ নি সাঁ গঁ, নি সাঁ রেঁ, নি সাঁ গঁ, মঁ রেঁ নি ধ নি প, র্ম প নি ধ সাঁ।
৯। প ধ, প নি ধ, গ ম নি ধ, র্ম প নি ধ, নি ধ প র্ম, গ ম ধ প নি ধ সাঁ।
১০। সাঁ গঁ মঁ পঁ, গঁ মঁ রেঁ সাঁ, নি সাঁ ধ নি ধ প, র্ম প গ ম নি ধ সাঁ।

সরগম—

১। ° | সানিনি সারেরে সাগর্ম প | গমনি ধ পর্মর্ম পধধ | পনিধ সাঁ ধ-নি -ধ- |
| ধ-নি -ধ- ধ-নি -ধ- |

২। ° | সাগ র্মপ গম নিধ | গঁমঁরেঁসাঁ নিধসাঁ ধনিধপ মরেসা | সাগ গর্ম র্মপ পনি |
| ধনি সাঁধ নিসাঁ ধনি |

বোলতান—

১। ° | পর্ম গম নিধ পধ | গম নিধ পনি ধসাঁ | ধনি পধ র্মপ গম |
| শ্যাঽ ঽঽ মঽ ঽঽ | ক্যাঽ ঽয় সেঽ ঽঽ | কাঽ ঽঽ ঽঽ টাঽ |
| ধপ নিধ সাঁনি সাঁ |
| ঽঽ ঽঽ উঁঽ ঽ |

২। ° | মগ গম রে সা | পর্ম র্মপ গম রেসা | নিধ ধনি পনি ধসাঁ |
| ক্যাঽ ঽয় সে ঽ | কাঽ ঽঽ টাঽ উঁঽ | ক্যায় সেঽ কাঽ টাউঁ |
| পনি ধসাঁ পনি ধসাঁ |
| কাঽ টাউঁ কাঽ টাউঁ |

তান—

১। ° | সানি সারে সানি সাগ | র্মপ গম নিধ সাঁ |

২। ° | ধনি ধপ র্মপ গম | নিধ পনি ধসাঁ নিসাঁ |

৩। | পর্ম পধ গম ধ | পনি ধপ নিধ র্সা | ধনি ধপ গম রেসা |

৪। | সাগ র্মপ গম রেসা | গম নিধ পনি ধর্সা |
| নির্সা ধনি ধপ গম | ধ গম ধ গম |

৫। | র্সানি ধনি র্সানি র্সারে | র্সানি ধনি ধনি ধপ |
| র্মপ গম নিধ পর্ম | সাপ র্মপ গম রেসা |

৬। | সাম গর্ম পধ প | গম নিধ পধ প | পনি ধর্সা নির্সা রের্সা |
| গর্ম রের্সা ধনি ধপ | ধনি পধ র্মপ গম | সাগ র্মপ গর্ম প |

৭। | সাগ র্মপ গর্ম রের্সা | নির্সা ধনি ধপ মপ | গম নিধ র্সারে র্সা |
| র্সানি সাগ নির্সা রে | নির্সা গর্ম রেনি ধনি | ধপ র্মপ গম রেসা |
| র্মপ নিধ র্সা, র্মপ | নিধ র্সা, র্মপ নিধ |

দেবযানী

ঠাট—খাম্বাজ
জাতি—ঔড়ুব-ঔড়ব
বর্জিত স্বর—গ ও ম

[কোন রাগে পাশাপাশি দুটি স্বর বর্জিত হয় না এই যুক্তিতে যাঁরা 'দেবযানী'-কে রাগের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন তাঁদের স্মরণ করাই 'কেদার' রাগের আরোহণে রেখাব ও গান্ধার বর্জিত স্বর]

বাদী—প
সমবাদী—রে
সমপ্রকৃতির রাগ—গারা, খাম্বাজ, মিঞাঁমল্লার, কামোদ প্রভৃতি।
রস—শৃঙ্গার।
উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ।
আরোহ—সা রে প, নি ধ, রে প, নি ধ নি সাঁ
অবরোহ—সাঁ নি ধ প রে সা
পকড়—সা রে প, নি ধ প, রে সা নি় সা
আলাপ—সা রে প, নি ধ, রে প, রেসা, নি়ধ় নি় সা, রে প,

নবনন্দন (মধ্যলয়)

দেখো সখিরি আয়ে কৃষ্ণ কহ্নাই
'দেবযাণী' রাগ মেঁ বাশুরী বজাই।
বেণুকি ধ্বনি শুনি সভি বৃজনারী
লাগ নাচত করি পুকারী॥

| সারে প নি ধ | প - প প | প রে নি প | নি ধ নি সাঁ | সাঁসাঁ নিধ পরে সা |
| দেS S খো S | সু S খি রী | আ S য়ে S | কৃ ষ্ S ক | হ্নাS SS SS ই |
× ২ ৩ ৪ ৫

| রে - সা সা | নি়সা রে নি় ধ় | রে নি ধ প | নিধ পনি ধনি সাঁরেঁ |
| দে ব্ যা নী | রাS S গ মেঁ | বাঁ S শু রী | বS SS SS SS |

| সাঁসাঁ নিধ পরে সা ||
| জাS SS SS ই ||

| প প প - | রেঁ - - রেঁ | সাঁনি ধ প প | রেঁ - - রেঁ | নিসাঁ রেঁ সাঁনি সাঁ |
| বে ণু কি S | ধ্ব S S নী | শুS নি স ভি | বৃ S S জ | নাS S SS রী |

| নি সাঁ ধ নি | রেঁ - রেঁ রেঁ | সাঁনি ধ প - | রেঁ - - রেঁ | নিসাঁ রেঁ সাঁনি সাঁ ||
| লা S S গ | না S চ চ | কS S S S | রি S S পু | কাS S SS রী ||

বিস্তার—

১। নি়সা, নিসারে, প, রে, নি় ধ় নি় সা।
২। সা নি় ধ় প়, নি় ধ় নি় সা, রে সা, প রে সা।
৩। রে প রে, নি় সা প রে, নি় সা রে, সা নি় সা।
৪। নি় সা রে প, নি ধ প, রে নি ধ প, রে প, সা রে, নি় ধ় নি় সা।
৫। সা, প রে, ধ প, নি ধ প়, রে ধ প নি ধপ, রে সা।
৬। রে প ধপ নি ধ নি প, নি ধ প রে নি় সা।
৭। প, রে প, সা প, নি ধপ, নি ধ নি র্সা।
৮। প ধ প র্রে, নি ধ নি র্রে নি র্সা।
৯। রে প রে় নি ধ, প নি ধ নি র্সা, র্রে র্সা, র্রে নি ধ নি র্সা।
১০। র্রে র্সা নি ধ প র্রে, নি র্সা র্রে, প নি ধ প র্সা।

সরগম—

১। | সাসাসা পপপ রেরেরে পপপ | সারে পসা রেপ সারে | নিধ নির্সা পনি ধপ |
৩

২। | প-প রে-রে সারেপ র্সা | নি-নি ধ-প নিধনি র্সা | নিধপ রে সা-রে প |
২

| সা-রে প সা-রে প |

বোলতান—

১। | নি়সা রেপ নিধ নির্সা | নির্সা ধনি র্রে - |
| কৃঽ স্ঽ ণঽ কঽ | হ্নাঽ ঽঽ ই ঽ |
৪

২। | রেপ ধপ নিধ প | র্সানি ধপ রেপ রেপ | র্সাপ ধপ নিধ নির্সা |
| আঽ ঽঽ ঽঽ য়ে | কৃঽ স্ঽ ণঽ কঽ | হ্নাঽ ঽঽ ঽঽ ঽই |
৩

তান—

১। | সারে পপ নিধ নির্সা | নির্সা ধনি নিধ প | রেনি ধপ র্রেরে সা |
৩

২। | রেপ রেরে সারে সারে | নি়সা রেপ র্সানি ধপ | র্রের্সা নির্সা নিধ প |
৩

৩। | র্সানি র্সা নিধ প | র্রের্সা র্রে নিধ প | র্সানি ধপ নিধ নির্সা |
৩

৪। | নি়সা নি়সা ধ়নি় রে | রেপ রেপ সারে প | পধ পধ পনি ধ |
×

| নিধ নির্সা ধনি র্রে | র্সার্সা নিধ পপ রেসা |

৫। | নিধ পপ নি়সা রেসা | নিধ নির্সা নি়সা রেসা | র্রেনি সার্রে নি়সা রেসা |
×

| পপপ নিধনি র্সা, পপপ | নিধনি র্সা, পপপ নিধনি |

অরুণ রঞ্জনী

ঠাট—পূর্বাঙ্গ তোড়ী এবং উত্তরাঙ্গ ভৈরবী
জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব
বর্জিত স্বর—আরোহে রে ও নি এবং অবরোহে র্ম
বাদী—প [উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ]
সমবাদী—সা
সময়—প্রাতঃ কাল
প্রকৃতি—চঞ্চল
রস—শৃঙ্গার
সমপ্রকৃতির রাগ-বিলাসখানি তোড়ী, ভূপালী তোড়ী।
আরোহ—সা গ প র্ম প ধ র্সা
অবরোহ—র্সা নি ধ প গ রে সা
পকড়—প, সা গ প র্ম প, গ রে সা
আলাপ—সা, ধ্‌ সা, গ রে সা, গ প র্ম প, ধ প, গ রে সা।

বি. দ্র—এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত রাগ যা, ইতোমধ্যে বহুশিল্পীর কণ্ঠেই রেকর্ডধৃত ও বহুশ্রুত, এমত রাগও বিশ্ববিদ্যালয়-এর মত প্রতিষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পী-অধ্যাপক কর্তৃক স্বরচিত সুরে শেখানো হয়। যার স্বররূপ এই প্রকার—

স গ গ গ, ম প প ধ প ম, মসা গ র স নি্‌ ধ্‌, ধ নি্‌ সা, গ ম নি ধ......

ত্রিতাল (মধ্যলয়)

পুকারে বাঁশুরী রাধারমণ
শুনত দুখ লাগি মোর মন।
পঁয়জনীয়া মোরি বাজে ঝননন
ক্যায়সে যাঁউ ম্যায় পিয়া মিলন॥

	০	৩
প	গ প র্ম প	সা গ প ধ
পু	কা ঽ রে বাঁ	শু ঽ রী রা

র্সা - - -	নিধ পগ রেসা প	গ ধ পগ রেনি্‌ সা	পধ নিধ পর্ম প
ধা ঽ ঽ ঽ	রঽ মঽ ণঽ শু	নঽ ঽঽ তঽ দু	খঽ ঽঽ লাঽ গি

র্সা - - র্সা	নিধ পগ রেসা
মো ঽ ঽ র	মঽ ঽঽ নঽ

প গ ধ প	র্সা - র্সা র্সা
পঁ য় জ নী	য়া ঽ মো রি

| রেঁ - - সা | নিরেঁ সাঁনি ধ প | ধ গ - রেঁ | সাঁ - নিধ প |
| বা ঽ ঽ জে | ঝঽ নঽ ন ন | ক্যা ঽ য় সে | যাঁ ঽ উঽ ম্যায় |

| সা - - - | নিধ পগ রেসা "প" |
| পি ঽ য়া ঽ | মিঽ লঽ নঽ "পূ" |

বিস্তার—

১। সা, নি ধ সা, গ রে সা, সা গ প র্ম প, গ রে নি ধ সা।
২। প, র্ম প, গ প, প ধ র্ম প, প গ প র্ম প, গ রে সা।
৩। প র্ম প গ রে সা, প ধ প, গ প র্ম প, ধ র্ম প।
৪। প, র্ম প, গ প ধ প, ধ নি ধ র্ম প, গ রে সা।
৫। প ধ র্ম প ধ সাঁ, গ প র্ম প ধ, নি ধ প সাঁ।
৬। রে সা, গ রে সা, নি ধ রে সা গ, সা গ প ধ নি ধ প।
৭। গ প ধ র্ম প নি ধ প, রেঁ সাঁ ধ প, গ প র্ম প ধ সাঁ, গঁ রেঁ সাঁ।
৮। প সাঁ, ধ সাঁ প, ধ র্ম প নি ধ প, প গ, সা গ রে সা।
৯। সাঁ গঁ প, সাঁ গঁ, ধ সাঁ, নি ধ প র্ম প, ধ গ প ধ সাঁ।
১০। নি ধ রেঁ সাঁ গঁ রেঁ সাঁ, ধ নি ধ প র্ম প, গ প র্ম প ধ সাঁ।

সরগম—

১। ৩ | সাগপ র্ম-প সাগ রেসা | পধসা ধ-সা পনি ধপ | ধপর্মপ ধপর্মপ সা পূ |

২। ০ | গপ র্মপ সা-গ -প- | গধ পধ র্ম-প - ধ - | পসা ধসা রেঁসা নিধ | নিধ পগ রেসা পূ |

বোলতান—

১। প | ০ ধগঁ রেঁসা নিধ নিধ | পধ সাঁনি রেঁসা নিধ | পর্মপধ পগ রেসা | সাগ পসা গপ প |
পূ | কাঽ ঽঽ রেঽ ঽঽ | বাঁঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | শুঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | রীঽ ঽঽ ঽঽ পূ |

২। প | গঁ - রেঁসা নিধ | সাঁ - নিধ পগ | ধ - পগ রেসা | গপ র্মপ ধসা প |
পূ | কা ঽ রেঽ ঽঽ | বাঁ ঽ ঽঽ ঽঽ | শু ঽ ঽঽ ঽঽ | রীঽ ঽঽ ঽঽ পূ |

তান—

১। × | পর্ম পপ সাধ সাসা | ধপ গরে সা পূ |

২। × | নিধ সানি ধসা নিধ | পগ রেসা গপ পূ |

৩। | নিধ্ প্সা গপ র্মপ | ধসা গর্রে সানি ধপ | র্মপ গরে সা পু |

৪। | গরে সানি পগ রেসা | পর্ম পপ ধপ র্মপ | নিধ পগ সানি ধপ | র্মপ গরে সা পু |

৫। | গপ পগ পপ র্মপ | র্মপ পর্ম ধধ পনি | পনি ধপ সাসা নিধ | পপ গগ রেসা পু |

৬। | সাধ্ সাসা গসা গগ | পগ পপ ধপ ধধ | সানি ধসা নিধ রেসা |
| গরে সানি ধপ র্মপ | সাসা নিনি ধধ পপ | র্মপ সাগ প পু |

৭। | সাগ গসা গরে সা | সারে সানি পধ সা | পনি ধপ র্মপ র্মপ | পসা নিধ পধ পধ |
| পরে সানি ধসা ধসা | পগ রেসা নিধ পধ | সা, নিধ পধ সা, | নিধ পধ সা পু |

রূপ মঞ্জরী

ঠাট—বিলাবল
জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ
বর্জিত স্বর—আরোহে গ ও ধ
বাদী—প
সমবাদী—সা
গতি—অবরোহণে বক্রগতি সম্পন্ন।
প্রকৃতি—চঞ্চল
রস—শৃঙ্গার
সময়—প্রাতঃকাল
উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ
আরোহ—সা রে ম প নি র্সা।
অবরোহ—র্সা নি ধ প, গ ম রে গ, সা রে ন়ি সা।
পকড়—সা, রেমপ, নিধপ, গ ম রে প।

সম প্রকৃতির রাগ—দেশ (আরোহে), বিলাবল (অবরোহে), পটমঞ্জরী (বিলাবল ঠাট)

আলাপ—সা, ন়ি সা, রে ম প, রে গ, সারে, ন়ি সা, সান়ি ধ়প়, প় ন়ি সা, গম রে গ, সা রে ম প।

একতাল (মধ্যলয়)

না ছুঁও না ছুঁও শ্যাম মোরী
একত বৃজকে গোপ নারী
তা পর ভরত ম্যায় গাগরী।
নিরখ হসত বন বিহারী
কা করু অব, কহুঁ করজোরী
না ছুঁও না ছুঁও শ্যাম মোরী॥

সা রে	ম প	নি র্সা	র্সানি ধপ	গম রেগ	সারে ন়িসা
না ছুঁ	ও না	ছুঁ ও	শ্যাং SS	মS মোS	SS রী
×	০	২	০	৩	৪

প গ	ম রে	গ সা	রে ম	প নি	- র্সা
এ ক	ত বৃ	জ কে	গো S	প না	S রী

র্সা র্রে	র্রে র্ম	র্গ র্গ	র্সা র্রে	নি র্সা	নিধ প
তা প	র ভ	র ত	ম্যা য়	গা গ	SS রী

সাঁনি ধ	প মপ	নি সাঁ	সাঁ সাঁ	প সাঁ	- সাঁ
নিꣻ র	খ হুꣻ	স ত	ব ন	বি হা	ꣻ রী

গর্ম রেঁগ	সাঁরেঁ নিসাঁ	পনি সাঁরেঁ	সাঁনি ধ	প সাঁনি	ধ প
কাꣻ ꣻꣻ	কাꣻ রুঁꣻ	অꣻ বꣻ	রুꣻ হুঁ	ক রꣻ	জো রী

সা রে	ম প	নি সাঁ	সাঁনি ধপ	গম রেগ	সারে ন্সা	
না ছুঁ	ও না	ছুঁ ও	শ্যাꣻ ꣻꣻ	মꣻ মোꣻ	ꣻꣻ রী	

বিস্তার—

১। সা, সা রে নি সা, নি ধ্ প্, প্ নি সা।
২। সা রে ম প, গ ম রে গ সা রে নি সা।
৩। রে ম প, গ ম, রে ম প, প রে ম সা রে নি সা।
৪। প, গ ম, রে ম প, ধ প, রে ম গ ম সা রে ম প।
৫। গ ম রে গ রে ম প, প নি ধ প, রে ম প, গ ম রে গ সা রে নি সা।
৬। প নি সাঁ, নি ধ প সাঁ, রে ম প, গ ম, রে ম প নি সাঁ।
৭। রে ম প সাঁ, নি ধ প, প নি সাঁ রেঁ, নি সাঁ।
৮। প নি ধ প, রে ম প সাঁ, নি ধ নি, ধ প, প নি সাঁ।
৯। সাঁ রেঁ নি সাঁ, প নি সাঁ, সাঁ রেঁ মঁ গঁ মঁ, সাঁ রেঁ, প নি সাঁ।
১০। নি সাঁ নি ধ প নি সাঁ, গঁ মঁ রেঁ গঁ সাঁ রেঁ, প নি সাঁ।

সরগম—

১। | রেম্ পরে | মপ্ সাঁ | নিনি ধপ্ | নিধ্ প | সারে ন্সা | রেম প |
×

২। | গম রেগ | সারে ন্সা | রে -ম | - প | রে -ম | - প |
×

বোলতান—

১। | সাঁসাঁ নিধ | পনি সাঁরেঁ | সাঁনি ধপ | রেগ ন্সা |
| নাꣻ ꣻꣻ | ছুঁꣻ ওꣻ | শ্যাꣻ মꣻ | মোꣻ রীꣻ |
২

২। | গম রেগ | সারে ন্সা | পপ রেম | পনি সাঁ |
| নাꣻ ꣻꣻ | ছুঁꣻ ওꣻ | নাꣻ ꣻꣻ | ছুঁꣻ ও |

তান—

১। | রেম পপ | সারে মপ | পনি সাঁসাঁ | পানি সাঁরেঁ | সাঁনি ধপ | নিনি সাঁ |
×

২। | গম রেগ | সারে ন্সা | প্নি সা | রেম রেম | প রেম | রেম প |
×

৩। | পনি সারে | সানি ধপ | নিধ পনি | ধপ রেম | পনি সা | পনি সা |
×

৪। | গম রেগ | সারে নিসা | পনি সারে | পনি সারে | সানি ধপ | রেম পপ |
×

| নিনি ধপ | মপ রেম | সারে মপ | নিনি সা | সারে মপ | নিনি সা |

৫। | পনি পনি | ধধ সারে | সারে নিনি | রেগ সারে | নিসা রেম | পনি সা |
×

| গম রেগ | সারে নিসা | ধপ গম | রেগ সারে | নিসা রেম | পনি সা |

শঙ্করী

ঠাট—বিলাবল
জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব
বর্জিত স্বর—রে ও ম
আরোহে গান্ধার মধ্যমের সাথে আন্দোলিত হয় এবং রেখাব গুপ্ত।
বাদী—গ
সমবাদী—নি
রস—বীর
গতি—সরল
প্রকৃতি—গম্ভীর
পূর্বাঙ্গবাদী রাগ
সমপ্রকৃতির রাগ—শঙ্করা, বেহাগড়া প্রভৃতি।
আরোহ—সা গ, প নি, ধ র্সা।
অবরোহ—র্সা নি প, গ প নি ধ প, গ প গ সা।
পকড়—র্সা, নি প, নি ধ প, গ প গ সা।
আলাপ—সা, গ প গ, সা, নি প, গ প নি ধপ, গ প গ সা।

ত্রিতাল (মধ্যলয়)

জননী জগদম্বা ভবানী।
মহামায় যোগিনী শিবাণী
প্রণত কৃপা করনি, সুখ করনি, দুখ হরণি॥

| - র্সা - র্সা |
| ঽ জ ঽ ন |
৩

| নি - গ প | নি ধ র্সা নি | পানি ধপ গ সা |
| নী ঽ জ গ | দ ম্ বা ভ | বাঽ ঽঽ নি ঽ |
× ২ ০

| গ - প র্সাধ | - র্সা নি প |
| ম ঽ হা মাঽ | ঽ য় যো ঽ |

| গ প - নি | ধ - প - | র্সা র্সা র্গ র্গ | র্গ র্গ র্সা র্সা |
| গি নী ঽ শি | বা ঽ নী ঽ | প্র ণ ত কৃ | পা ক র নি |

| নি নি গ প | নি ধ র্সা নি | পানি ধপ গ সা |
| সু খ ক র | নি দু খ হ | রঽ ঽঽ ণি ঽ |

বিস্তার—

১। সা গ, প় গ, নি় ধ় প়, প় নি়, ধ় সা।
২। সা, প় সা, গᵐ গᵐ সা, গ প, নি প, গ প নি ধ প।
৩। প গ, সা, ধ় সা, নি় প় সা, সা প গ নি ধ প, গᵐ গᵐ সা।
৫। প গ প, গ নি প নি ধ, প নি, ধ সাঁ।
৬। গ প নি ধ সাঁ, প গ ধ প নি ধ প, প নি সাঁ।
৭। সা গ প, নি প, প নি ধ সাঁ, নি প সাঁ, গঁ সাঁ, প নি ধ সাঁ।
৮। প, গᵐ গᵐ সা, নি প, গᵐ গᵐ সা, নি ধ, গᵐ গᵐ সা, গ প নি ধ সাঁ।
৯। সা গ প নি, নি ধ সাঁ, প নি ধ সাঁ, নি গঁ সাঁ, পঁ গᵐ গᵐ সাঁ, প নি প নি ধ সাঁ।
১০। প সাঁ, গঁ সাঁ, নি সাঁ, প নি সাঁ গঁ পঁ, গঁ নি সাঁ প নি ধ প সাঁ।

সরগম—

১। | সাঁনিপ সাঁ নিপ গপ | গনিধ পনিধ সাঁ-সাঁ গঁসাঁ | সাগ গপ নিধ পনি |
৩
| পনিধপ গপগসা গপগসা গপগসা |

২। | পনিধপ পপ নিসাঁসাঁনি পপ | পগগপ গসা গ গ |
৩ জ গ

বোলতান—

১। | সাঁনি পপ গপ নিধ | গপ নিপ নিধ সাঁ |
| দS SমৃS বাS ভS | বাS SS SS নি |
২

২। | সাগ পনি সাঁনি পপ | গপ নিধ পনি ধপ | সাঁনি পপ গপ গসা |
| জS SS নS নীS | জS গS দমৃ বাS | ভS SS বাS নিS |
৩
| সাসা গপ নিধ সাঁ |
| ভS SS বাS নি |

তান—

১। | সাসা গগ পনি ধপ | সাঁনি পপ গপ গসা |
২

২। | সাগ পনি সাঁনি পগ | পসাঁ নিপ গপ গসা |
২

৩। | সাসা গগ পপ গসা | গপ নিধ পনি সাঁ | সাঁনি পপ গপ গসা |
×

৪। | পপ গপ সাগ সাগ | পনি ধপ গপ গপ | নিনি পনি গপ নিধ | সাঁ গপ নিধ সাঁ |
৩

নজরুল সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ

৫। | সাগ সাসা গপ গগ | পনি পপ সাঁনি সাঁসাঁ | পনি ধপ নিপ সাঁনি | পপ গগ সাগ প |
৩

৬। | সাঁনি সাঁনি পপ গপ | নিধ পনি পপ গসা | পপ গপ গগ গসা |
২

| সাঁনি পপ গপ গসা | গগ পপ নিনি সাঁসাঁ | পনি ধপ গপ গসা |

৭। | সাসা গগ সাসা পপ | সাসা নিনি ধধ সাঁ | গপ নিধ পনি ধসাঁ |
৩

| গঁগঁ সাঁসাঁ নিনি পপ | গগ সাগ পপ গপ | নিনি পনি সাঁসাঁ নিসাঁ |

| গঁসাঁ নিপ গপ নিধ | প গপ নিধ প |

রুদ্র ভৈরব

ঠাট—ভৈরব।
জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।
বর্জ্জিত স্বর—গ, প।
বাদী—ধ
সমবাদী—রে
উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ
প্রকৃতি—গম্ভীর
সময়—প্রাতঃকাল
রস—বীর
আরোহ—সা রে, ম ধ, নি র্সা
অবরোহ—র্সা, নি ধ, ম রে, সা
বি. দ্র.—আলাউদ্দীন খাঁ সৃষ্ট 'প্রভাকেলী' রাগের অনুরূপ
পকড়—ধ ম, ম ধ নি ধ, ম রে, সা।
মালকোষ ও ভৈরব-এর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

ধ্রুপদ—সুরফাঁকতাল

মহাযোগী শিব শঙ্কর, ডমরুকর গঙ্গাধর ভোলানাথ ত্রিশুলধারী।
ভূতনাথ গিরিজাপতি, দীননাথ কৃপাল অতি অনাদি অনন্ত ত্রিপুরারী॥

|| সা সা | র্সা র্সা | নি ধ | ধ - | ম ম |
|| ম হা | যো গী | শি ব | শ ঙ্ | ক র |
× ২ ০ ৩ ৪

| ধ ম | ধ ম | ম রে | - ম | রে সা |
| ড ম | রু ক | র গ | ঙ্ গা | ধ র |

| সা রে | ম ম | ধ নি | র্সা ধ | নি র্সা ||
| ভো লা | না থ | ত্রি শু | ল ধা | ঽ রী ||

|| ধ ম | ধ নি | নি র্সা | ধ নি | র্সা র্সা |
|| ভূ ত | না থ | গি রি | জা প | ঽ তি |

| র্রে র্রে | র্ম র্রে | র্রে র্সা | ধ নি | র্সা র্সা |
| দী ণ | না থ | কৃ পা | ল অ | ঽ তি |

| সা রে | ম ম | ধ নি | র্সা ধ | নি র্সা ||
| অ না | দি অ | নন্ ত | ত্রি পু | রা রী ||

ধ্রুপদ-সঙ্গীতের আলাপ লিখিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি স্বর-সজ্জা দিলাম—

১। সা, রে, রে সা, নি ধ, ম ধ সা নি রে সা।

২। সা রে সা, ম রে সা, ম ধ, রে ম ধ, ম রে সা।

৩। রে রে সা, ধ ধ ম, সাঁ ধ নি ধ ম, রে ম ধ, নি সাঁ ধ ম, ম রে সা।

৪। সাঁ, সাঁ নি ধ ম, ধ ম রে, ম রে ধ ম নি ধ, ম ধ নি ধ রেঁ সাঁ।

৫। ধ সাঁ নি সাঁ, ধ রেঁ সাঁ, মঁ রেঁ সাঁ, নি রেঁ নি ধ, ম ধ সাঁ।

অরুণ ভৈরব

ঠাট—ভৈরব।

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ (কারও মতে ষাড়ব-ঔড়ব জাতির রাগ। প্রকৃত পক্ষে আরোহে রেখাব এবং অবরোহে গান্ধার ও ধৈবত স্বর বর্জিত না হয়ে বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গতি-বক্র।

বাদী—ম

সমবাদী—সা

পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

সময়—দিবা প্রথম প্রহর (কেউ বলেন দিবা প্রথম ভাগে উত্তরাঙ্গবাদী রাগ গেয়। কিন্তু লালিত, যোগীয়া রাগ স্মরণ করলেই পরিস্কার হবে যে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মাদি সকল ভ্রান্তি মুক্ত নয়। ওস্তাদ গন ইচ্ছামতো যা বলেছেন আমরা অবৈজ্ঞানিক সুলভ মানসিকতায় তাই মেনে চলি। আবার কাউকে ভুল প্রমাণ করতে ঐ নিয়মেরই প্রাচীর তুলি)

রস—বীর

প্রকৃতি—গম্ভীর

উভয় ধৈবত ব্যবহৃত হয়।

সমপ্রকৃতির রাগ—আহীর ভৈরব, গুণকেলী ইত্যাদি

আরোহ— ধ্ নি সা রে সা গ ম, ধ প, নি ধ র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ নি প ম ধ প ম গ ম রে সা।

পকড়—ধ্ নি সা রে সা, সা গ ম প, ধ প।

সাদ্রা-ঝাঁপতাল

তু আদ, তু মদ, তু অন্ত যোগী শিব
বৃষ বাহণ দেবী শোভন, দেব-দানব-নর সেবঁ।
ভস্ম অঙ্গ জটামে গঙ্গ চন্দ্র ললাট শোভিত
নাগ ধর ত্রিশুল ধর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শরণাগত॥

|| ধ - | ম - ম | রে - | ধ্ নি সা |
|| তু ঽ | আ ঽ দ | তু ঽ | ম ঽ দ |
× ২ ০ ৩

| গ ম | ধ প ম | নি ধ | র্সা - র্সা |
| তু ঽ | অ ন্ ত | যো গী | শি ঽ ব |

| রে নি | সা ধ ধ | নি প | ধ ম ম |
| বৃ ষ | বা হ ন | দে বী | শো ভ ন |

| রে রে | রেঁ রেঁ রেঁ | রেঁমঁ গঁরেঁ | সাঁ - সাঁ |
| দে ব | দা ন ব | নS র | সে S ব |

|| সাঁ - | নি ধ নি | প ম | ধ প ম |
|| ভ S | ম অ ঙ্গ | জ টা | মে গ ঙ্গ |

| ধ নি | সাঁ - রেঁ | সাঁ গঁ | গঁ মঁ মঁ |
| চ ন্ | দ্র S ল | লা ট | শো ভি ত |

| মঁ - | রেঁ রেঁ সা | নি প | ধ ম ম |
| না ৎ | গ ধ র | ত্রি শু | ল ধ র |

| রে রে | রেঁ রেঁ রেঁ | রেঁমঁ গঁরেঁ | সাঁ সাঁ সাঁ ||
| বি স্ব | ব্র হ্মা ণ্ড | শ র | ণা গ ত ||

কয়েকটি স্বরসজ্জা—

১। সা, রে সা, ধ্ নি সা রে, রে নি সা, গ ম, রে, ধ্ নি সা।
২। সা, ধ্ নি, ধ্ সা, ধ্ রে সা, গ ম ধ প, ম গ ম রে সা।
৩। সা গ ম, সা রে, সা গ ম প, গ ম প ধ, ম গ ম রে সা।
৪। ধ নি সাঁ রেঁ, রেঁ নি সাঁ ধ নি প ম ধ, গ ম ধ প, ম রে সা।
৫। ধ নি সাঁ গঁ, মঁ রেঁ, ধ নি সাঁ, নি ধ নি প, প ম রে, ধ্ নি সা।

শিবানী ভৈরবী

ঠাট—আশাবরী
জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব
বর্জিত স্বর—আরোহে ম ও নি এবং অবরোহ রে।
বাদী—সা
সমবাদী—প
রস—করুণ
সময়—দিবা প্রথম প্রহর।
উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ।
সম প্রকৃতির রাগ—শিব রঞ্জনী, আশাবরী।
আরোহ—সা রে গ প, ধ সাঁ। (রাগ-'লীলাবতী' অনুরূপ)
অবরোহ—সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ, নি ধ প, ম গ সা। (রাগ-'গোপীবসন্ত'-এর আবির্ভাব)
পকড়—সা রে গ প, নি ধ প।
আলাপ—সা, সা রে গ ধ় সা, রে গ সা রে প, নি ধ প, প নি ধ গ প, ম গ সা।

ত্রিতাল—মধ্যলয়

ক্যায়সে কাটাউঁ রাতিয়া সখিরি
চন্দ্রা কি কুঞ্জমে গ্যয়ে বনওয়ারি।
ন মানে ন মানে জিয়া শুনহো সহেলি
প্যাসে যোবন তড়পত হ্যায় রী॥

সাঁ রেঁ গঁ রেঁ	সাঁ - নি ধ	পনি ধপ ম গ	সা রে গ প
ক্যা য় সে কা	টা ঽ উ রা	তিঽ ঽঽ য়া স	খি ঽ রি ঽ
০	৩	×	২
সা রে গ প	প ধ ধ সাঁ	নিসাঁরেঁ নিসাঁ নিধ নিধ	নিধ নিধ প-
চ ন্ দ্রা কি	কু ন্ জ মে	গ্যাঽঽ য়েঽ ব ন	ওয়া ঽ রি ঽ
প প ধ ধ	সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ	সাঁ মঁ গঁ সাঁ	ধ - সাঁ -
ন মা নে ন	মা নে জি য়া	শু ন হো স	হে ঽ লি ঽ
প রেঁ - গঁ	রেঁ গঁ রেঁ সাঁ	নিসাঁরেঁ নিসাঁ নিধ নিধ	নিধ নিধ প -
প্যা ঽ ঽ সে	যো ঽ ব ন	তঽঽ ড়ঽ প ত	হ্যা য় রী ঽ

বিস্তার—

১। ধ় সা, সাগ, সা রে গ প, নি় ধ় প ধ় সা।
২। সা রে গ প, ধ় রে, সা গ, ম গ সা রে গ, প ম গ সা।

৩। সা গ ম গ প, ণিধ ণিধ প, ধ ম প, প গ, ম গ সা।
৪। গ, ম গ প, গ ধ প, নি ধ প, প সাঁ নি ধ প।
৫। প ম গ সা ধ সা, প নি ধ প, ধ প ম, নি ধ প ধ সাঁ।
৬। প ধ সাঁ, প ধ রেঁ, সাঁ রেঁ গঁ রেঁ নি ধ সাঁ।
৭। প রেঁ গঁ রেঁ, সাঁ গঁ মঁ, মঁ গঁ সাঁ, নি সাঁ রেঁ নি ধ প।
৮। সা রে গ প ম ধ প, নি ধ নি ধ প, ধ ম, গ ধ প ধ সাঁ।
৯। ধ ধ সাঁ, প নি ধ প, ম গ প ম ধ প নি ধ প, প ধ গঁ রেঁ সাঁ।
১০। সাঁ গঁ রেঁ নি ধ প, প গঁ রেঁ সাঁ, মঁ গঁ সাঁ, নি ধ প, ম ধ প ধ সাঁ

সরগম—

১। | গঁ রেঁসাঁ নিধ প | নি ধপ মগ সা | গ সানি ধপ সা | সাগ পধ গপ সাঁ |
০

২। | মগসা মগসা প-ধ সা | পমগ পমগ সা-গ প | সাঁনিধ সাঁনিধ প-ধ সাঁ |
×

| সাঁরেঁগঁ রেঁসাঁনি ধপম গসা- | গ-প প-ধ সাঁ গ-প | প-ধ সাঁ গ-প প-ধ |

বোলতান—

১। | প গপ ধপ ধ | পধ সাঁধ সাঁরেঁ গঁরেঁ | সাঁনি ধপ ম গ | সা রে গ প |
| ক্যা ऽऽ ऽয় সে | ऽऽ ऽऽ কাऽ ऽऽ | টাऽ ऽऽ উ স | খি ऽ রি ऽ |
০

২। | গগ সাপ মগ সা | পপ গধ পম গসা | নিনি ধসাঁ নিধ পম |
| ক্যাऽ ऽऽ ৎয় সে | কাऽ ऽऽ টাऽ উऽ | রাऽ ऽऽ তিऽ ऽऽ |
০

| গসা ধসা গপ ধসাঁ |
| য়াऽ সऽ খিऽ রিऽ |

তান—

১। | সাগ গপ পধ ধসাঁ | রেঁগঁ রেঁসাঁ নিধ প |
×

২। | মগ সাগ পধ সাঁনি | ধপ মগ সাগ প |
×

৩। | গপ ধসাঁ রেঁগঁ রেঁসাঁ | নিধ পম গসা মগ | পম ধপ নিধ সাঁ |
৩

৪। | সাগ পসা গপ গপ | গপ ধগ পধ পধ | নিধ সাঁনি রেঁসাঁ গঁরেঁ | সাঁনি ধপ মগ সা |
০

৫। | সাম গসা পম গসা | ধপ মগ সাঁনি ধপ | মগ সাসা নিধ পধ | সাঁ পধ সাঁ পধ |
০

৬। | গগ গসা ধসা মম | মগ সাগ পপ পম | গপ ধধ ধপ গপ |
×

| নিনি নিধ পধ সাঁসাঁ | সাঁনি ধসাঁ রেঁগঁ রেঁসাঁ | নিধ পম গপ ধসাঁ |

৭। | সাগ সা গপ ম | গধ প পনি ধ | ধসাঁ নি পরেঁ সাঁ | গরেঁ সাঁমঁ গরেঁ সাঁনি |
| ধপ নিধ পম গসা | সাসা গগ পপ ধধ | নিধ পধ সাঁ নিধ | পধ সাঁ নিধ পধ সাঁ |

যোগিনী

ঠাট—তোড়ী
জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
বাদী—প
সমবাদী—সা
উত্তরাঙ্গবাদী রাগ
সময়—দিবা প্রথম প্রহর
রস—করুণ

পূর্বাঙ্গে তোড়ী ও উত্তরাঙ্গে আশাবরীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

অবরোহণে ভৈরবের সাথে কিছুটা পুরবীর আভাস এসেও মিলিয়ে যায়।

আরোহে—উভয় মধ্যম এবং অবরোহে উভয় গান্ধার, মধ্যম ব্যবহৃত হয়। উভয় নিখাদ আরোহ নি ও অবরোহে নি এরূপ ব্যবহৃত হয়। আরোহে পঞ্চম-ধৈবত ও নিখাদ বিপরীত গতিতে প্রয়োগ এই রাগের বৈশিষ্ট্য। বাগেশ্রী রাগে 'সা নি ধ, ম পধ, মগ'—এরূপ প্রয়োগ এই রাগের সদৃশ চলন।

আরোহ—সা রে গ র্ম ধ প, ম প নি ধ প র্সা
অবরোহ—র্সানি ধ প, প র্ম গ, ম, ম গ রে সা।
পকড়—ধ্ প্ সা, সা রে গ র্ম ধ প, র্ম গ, ম গ রে সা।
আলাপ—সা রে, নি্ সা, ধ্ নি্ ধ্ প্ সা, রে গ র্মগ, র্ম ধ প, প র্মগ, ম গ রে সা।

ত্রিতাল-মধ্যলয়

ত্রিলোককে ঠাকুর শ্রী সীতা-পতি
সিংহাসন পর বৈঠে, সাথ নহি সত্তি।
লছমন-ভরত-শত্রুঘণ সাথ
বীর হনুমত শোভে জোড় হাথ
সব কছুঁ ছোড়কর বনমেঁ সত্তি॥

র্সানি ধপ র্মধ প	নিধ নিধ প র্সা	র্সা/নি ধ প	ম গ রে সা
ত্রিS লোS কS কে	ঠাS কুS র শ্রী	সী S তা প	তি S S S
০			

সা রে গ ধ	প প র্ম গ	র্সা নির্সানি ধ প	র্সা নির্সানি ধ প
সিং হা স ন	প র বৈ ঠে	সা SSS থ ন	হি SSS স তি

প - র্মগ র্ম	ধ ধ প প	ম প ধনি ধপ	র্সা - র্সা -
ল ছ্ মS ন	ভ র ত শ	S ত্রু Sঘ্ নS	সা S থ S

সাঁ নি রেঁ সাঁ	- রেঁ মঁ গঁ	রেঁ রেঁ সাঁ সাঁ	নিসাঁ নি ধ প
বী S র হ	S নু ম ত	শো ভে জো ড়	হাS S S থ
সা রে গ ধ	প প মঁ গ	সাঁ নিসাঁনি ধ প	সাঁ নিসানি ধ প
স ব ক ছুঁ	ছো ড় ক র	ব SSS S ন	মেঁ SSS স তি

বিস্তার—

১। সা, সা নি ধ নি ধ প, ম ধ প, ম প সা।
২। সা রে গ মঁ, রে গ, মঁগ, ম গ, নি সা রে গ, ম গ রে সা।
৩। মঁ গ, প মঁ গ, ধ প, মঁ ধ প, ম গ রে সা।
৪। সা রে গ মঁ গ ম গ, রে মঁ গ প মঁ ধ প, ম নি ধ প, প ধ নি ধ প।
৫। মঁ ধ প, মঁ প, গ মঁ ধ নি ধ প, ম প নি ধ প সাঁ।
৬। ধ প গ মঁ প, নি ধ সাঁ, নি ধ নি ধ প, ম গ রে সা।
৭। সা রে গ গ সা রে নি সা, গ রে গ মঁ ধ প, রে গ মঁ ধ নি ধ প, প নি ধপ মপ
৮। ধ প মঁ গ, মঁ ধ প সাঁ, সাঁ নি সাঁ নি ধ প, প সাঁ নি রেঁ সাঁ।
৯। সাঁ রেঁ গঁ, মঁ গঁ রেঁ সাঁ, নি প সাঁ, মঁগ প মঁ ধ প নি ধ সাঁ।
১০। গ মঁ ধ প, ম প নি ধ প, সাঁ, নি সাঁ নি ধ প, নি সাঁ নি ধ প, সাঁ রেঁ গঁ, প মঁ গ
মঁ গ রেঁ সাঁ।

সরগম—

১। | মগ রেসা সারেগ মগ | সাঁনি ধপ পধধি সাঁনি | সাঁরেঁগঁ মঁগরে সাঁনিধ প |
০
| নিসাঁনি ধ নিধ পধপ সাঁ

২। | সারে পপপ রেগ ধধধ | সারেগ মঁধপ নিধনি ধপ | সা-নি -ধ- প-মঁ -গ- |
০
| মগরে সামগ রেসাম গরেসা

বোলতান—

১। | সারে রেগ গমঁ মঁধ | পনি ধপ মপ সা |
× সীS SS তাS SS পS SS তিS S

২। | মঁগ রেঁসা সাঁনি ধপ | মপ নিসা নিধ প |
× সীS SS তাS SS পS SS তিS S

তান—

১। | পমঁ ধপ সাঁনি রেঁসা | নিধ পমঁ সারে গ |
×

২। | গমঁ ধপ নিধ সাঁনি | ধপ মঁগ মগ রেসা |
×

৩। | মধ প সারে গ | পনি ধ সারে গ | র্সানি র্সা সারে গ |
×

৪। | সারে গগ রেগ মম | গম ধপ মপ নিধ | পধ র্সানি র্রের্সা মগ |
০

| র্রের্সা নিধ পম ধপ |

৫। | সারে রেগ গম মধ | পনি ধপ র্সানি ধপ | র্রের্সা নিধ পম ধপ | র্সা পম ধপ র্সা |
০

৬। | সানি সারে গ পম | পধ নি র্সানি র্সার্রে | মগ র্রের্সা নিধ পধ |
×

| নিধ পম পধ নিধ | পম গ মগ রেসা | গম ধনি ধপ র্সা |

৭। | মগ রেসা রেগ ধপ | মগ মধ পনি ধপ | মপ নিধ র্সানি র্রের্সা | র্রের্গ মগ র্রের্সা নির্সা |
০

| নির্সা ধনি পধ মপ | গম রেগ সারে গম | ধপ নিধ প ধপ | নিধ প নিধ প |

আশা ভৈরবী

ঠাট—ভৈরবী

জাতি—সম্পূর্ণ-ঔড়ব

বর্জিত স্বর—অবরোহে নি ও গ (মাঝে মাঝে গুপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়)

বাদী—প

সমবাদী—সা

উত্তরাঙ্গবাদী রাগ

সময়—দিবা প্রথম প্রহর

প্রকৃতি—গম্ভীর

রস—করুণ

সমপ্রকৃতির রাগ—শুদ্ধ শাওন্ত, আশাবরী (রে যুক্ত), যোগিয়া, বৈরাগী, গুণকেলী (ভৈরবী ঠাট)।

আরোহ—সা রে গ সা রে ম, প ধ নি প ধ র্সা

অবরোহ—র্সা ধ প, ম রে সা

পকড়—সা রে গ সা রে ম, প ম রে সা

আলাপ—সা, ধ সা, সা রে, সা রে গ, সা রে ম, রে গ রে সা, প, ম প ধ নি ধ প, প ধ ম প, ম রে সা।

তেওরা—মধ্যলয়

দেবী দুর্গে দোষ হরনি
অসুর সংহারিনী, রক্তবীজ মারনী, বাহন পশুরাজ।
দুষ্ট বিদারনি, দারিদ্র দাহনী,
সুখ প্রদায়িনী, বিপদ হরনি, প্রালনি সুর রাজ॥

সারে গ সা	ম রে	সা -	সা রে ম	ম -	ম ম
দেS S বী	দু র্	গে S	দো S ষ	হ S	র নি
×					

পধ নি প	র্সা ধ	প প	প ধ ধ	র্সা র্সা	র্সা র্সা
অS সু র	সং হা	রি ণী	র ক্ত বী	জ মা	র ণী

র্সা (নি)ধ (নি)ধ	প প	প প
বা হ ন	প শু	রা জ

ধ প ম	রে -	সা সা	সারে গ সারে	প ম	প প
দু ষ্ট বি	দা S	র নি	দাS রি দ্রS	দা S	হ নী

| র্রে র্রে র্রে | র্সা নি | র্রে র্সা | র্ম র্ম র্ম | র্রে র্রে | র্সা র্সা |
| সু খ প্র | দা ঽ | য়ি নী | বি প দ | হ ঽ | র নি |

| র্সা নিধ নিধ | প প | প প |
| পা ল নি | সু র | রা জ |

বিস্তার—

১। র্সা, রে গ, রে, সা রে গ, ম রে, সা রে, ধ সা।
২। সা রে ম, ম প, ধ প, ম রে নিধ, প ধ নি, প সা।
৩। সা রে, ম রে, প ম, ধ প, সারে গ, রে ম, সা ম রে সা।
৪। সা ম রে গ সা, রে ম প, প ধ নি ধ প, ম ধ, প ম রে, সা।
৫। প ম প ধ নি, ম প ধ, নি ধ প, নি ম প, রে ধ প ম রে সা।
৬। ম রে সা, প ম রে সা, ধ প ম রে সা, নি ধ প, ধ নি, পধ, ম প, সা রে ম প।
৭। নি ধ নিধ নিধ প, ম প, প ধ র্সা, র্সা নি র্রে র্সা।
৮। প ধ নি, প ধ ম, ধ প ম রে, ধ প নি ধ সা।
৯। প ধ নি, প ধ র্সা, রে র্সা, ধ র্সা র্রে র্গ, র্সা র্রে ধ প র্সা।
১০। র্সা র্রে র্ম, র্রে র্গ, র্সা র্রে, র্সা র্ম র্রে সা, প ধ র্সা।

সরগম—

১। | ধধ সাসা রেরে | সাসা গগ | রেরে মম | রেরে সা-রে -ম- | সা-রে -ম- |
| সা-রে -ম- |

২। | ধপ মরে সা | ধসা সাসা | রেসা সাসা | নিধ পম রেসা | ধসা সাসা |
| রেসা সাসা | র্সাধ পম পধ | র্সাপধ | র্সা পধ |

বোলতান—

১। | সারে র্মর্ম রেসা | সারে সাধ | পধ সা | পধ নিনি ধপ | ধসা ধপ | মরে সা |
| দেঽ ঽঽ ঽঽ | বীঽ ঽঽ | দুঽর্গে | দেঽ ঽঽ ঽঽ | বীঽ ঽঽ | দুঽ র্গে |

২। | মরে রেসা সাধ | ধনি ধপ | মরে সা |
| দেঽ বীঽ দুঽ | র্গেঽ ঽঽ | ঽঽ ঽ |

তান—

১। | সারে গসা রেম | পধ নিপ | মপ ধসা |
x

২। | পধ নিনি পধ | সাধ রেঁসা | মঁরেঁ সাঁ |
x

৩। | সাঁরেঁ গগ সাঁরেঁ | মঁমঁ রেঁসাঁ | পধ সাঁ | ধনি ধপ মরে | সারে গগ | রেগ রেসা |
x

৪। | সারে গসা ধসা | পধ নিপ | মপ ধনি | পধ সাঁরেঁ গরেঁ | সাঁমঁ রেঁসাঁ | ধনি ধপ |
x

৫। | ধনি ধপ মরে | সারে গরে | সারে ম | ধনি ধপ মরে | মপ ধনি | পধ সাঁ |
x

| সাঁসাঁ ধপ নিনি | ধপ মরে | মপ ধনি | ধসাঁ মপ ধনি | ধসাঁ মপ | ধনি ধসাঁ |

শিব সরস্বতী

ঠাট—ভৈরবী
জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব
বর্জিত স্বর—রে
বাদী—ম
সমবাদী—সা
পূর্বাঙ্গ বাদী রাগ
সময়—মধ্যরাত্রি
রস—ভক্তি
আরোহে উভয় গান্ধার ব্যবহৃত হয়।
সমপ্রকৃতির রাগ—নন্দকোষ, মালকোষ প্রভৃতি।
আরোহ—ধ নি সা গ ম, ধ প, গ ম ধ নি র্সা।
অবরোহ—র্সা নি ধ ম, ধ প ম গ ম সা।
পকড়—গ ম সা, ধ নি সা, গ ম ধ প।
বি.দ্র.—নজরুল সৃষ্টরাগের প্রথম রাগ। "পাঠশালা" পত্রিকায় প্রকাশিত
আলাপ—সা, নি সা, ধ নি সা, গ ম সা, নি সা গ ম, গ ম ধ প, ম গ ম সা।

ত্রিতাল-মধ্যলয়

জয় দেবী সরস্বতী বীণাপাণি
জয় জয় জ্ঞান-বিদ্যা প্রদায়িনী।
কমলাসন পর আদি বাণী
সংগীত জ্ঞন মুঝে দো জননী।

সাম গম ধ নি	সা গ - গ	ম - ধ প	গ - ম -
জS য়S দে বী	স র S স্ব	তী S বী ণা	পা S ণি S
০	৩	×	২
সা গ ম প	গ ম ধ নি	র্সা - নিধ নিধ	পম গ ম -
জ য় জ য়	জ্ঞা S ন বি	দ্যা S প্রS দাS	য়িS S নি S
ধ প গ ম	ধ ধ নি নি	র্সা - ধ নি	র্সা - - -
ক ম লা S	স ন প র	আ S দি বা	ণী S S S
র্সা র্গ র্গ র্ম	র্গর্ম র্গর্ম র্সা র্সা	র্সা - নিধ নিধ	পম গ ম -
স ঙ্ গী ত	জ্ঞাS নS মু ঝে	দো S জS নS	নীS S S S

বিস্তার—

১। সা গ ম, গ ম সা, ধ প, ম ধ নি সা, মা গ ম সা।
২। সা গ সা, গ ম ধ প, গ ম প, প ম গ, ম সা।

৩। ধ নি সা, নি ধ নি সা গ ম, সা নি গ সা ম, গ ম গ ম সা।
৪। গ ম ধ প, গ ম প, ধ ম গ ম, গ ম সা।
৫। সা ম গ ম সা, নি গ সা ম গ ম, ধ ম, সা গ ম।
৬। সা গ ম প, নি ধ নি ধ ম, নি ধ প ম, ম গ ম গ ম সা।
৭। গ ম ধ নি, ধ নি ধ প ম, ধ ম, ম গ ম, সা গ ম।
৮। ধ প, গ ম নি ধ, ধ নি সাঁ, ম ধ, গ ম ধ নি সাঁ।
৯। ধ নি সাঁ, গঁ মঁ সাঁ, সাঁ নি ধ নি সাঁ গঁ মঁ, মঁ গঁ মঁ সাঁ।
১০। গ ম ধ নি সাঁ, ধ নি সাঁ গঁ মঁ, মঁ গঁ মঁ সাঁ, নি ধ ম ধ নি সাঁ।

সরগম—

১। | সাগগ মমম গমম সা | ধনিসা গমধ পমগ মসা- | নি-সা ম নি-সা ম |

২। | সাঁনিধম গমধনি সাঁগমঁ- গঁমঁসাঁ- | নিসাঁসাঁ ধনিনি ধ-প মধপ |

| মগম স মগম সা | ধনি সাধ নিসা ধনি |

বোলতান—

১। | ধনি ধসা ধধ নিসা | সাগ গম গম সা | গম ধপ ধনি ধপ | গম ধনি ধনি সাঁ |
| জS SS য়S SS | দেS SS বীS S | সS SS রS SS | স্বS SS তীS S |
o

২। | গম সাম গম প | মধ নিধ নিধ প | নিসাঁ গঁমঁ গঁমঁ সাঁনি | ধম গম গম সা |
| জS SS SS য় | জS SS SS য় | সS SS রS SS | স্বS SS তীS S |

তান—

১। | সাগ মধ নিসাঁ নিধ | পম গম গম সা |
×

২। | ধনি সাঁগঁ মঁমঁ গম | ধনি সাঁসাঁ গম ধপ |
×

৩। | নিসা গম গম গম | ধনি ধনি গম ধপ | নিধ সাঁনি ধম প |
৩

৪। | গগ মম গম সা | গগ মধ পনি ধ | নিনি সাঁগঁ মঁগঁ মঁসাঁ | নিসাঁ ধনি মধ সাঁ |
o

৫। | গগ মম গগ মম | ধধ নিনি পপ নিনি | সাঁনি ধপ মধ নিধ | মগ মসা নিসা গম |
o

৬। | সাসা গগ সাঁসাঁ গঁগঁ | মঁগঁ মঁসাঁ মগ মসা | সাম মসা মধ ধম |
×

| ধনি নিধ নিসাঁ সাঁনি | ধম ধপ গম ধনি | সাঁ গম ধনি সাঁ |

৭। | মগ গম সাগ মধ | নিধ মপ মধ নিসাঁ | ধনি সাঁগঁ মঁগঁ মঁসাঁ | নিধ মধ পম ধনি |
o

| সাঁনি ধম ধপ গম | ধনি মধ নিসাঁ ধনি | সাঁগ মঁ ধনি সাঁগ | মঁ ধনি সাঁগ মঁ |

উদাসী ভৈরব

ঠাট—মধ্যম সুর ধরলে ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। ষড়জ সুর ধরলে কোনও ঠাট বিচারে আসেনা।

জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব

বর্জিত স্বর—প ও ধ

বাদী—ম

সমবাদী—সা

পূর্বাঙ্গ বাদী স্বর হলেও তিন সপ্তকেই বিস্তার যাতায়াত করে।

কোমল ধৈবত তীব্র মধ্যমের সাথে কণ স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয়। যার জন্য 'ললিতে'র আভাষ ফুটে ওঠে। দ্রুত তানে কোমল ধৈবত মাঝে মাঝে ব্যবহার দোষণীয় নয়।

সময়—সুর বিচারে শেষ রাত্রি মনে হয়।

রস—করুণ।

সমপ্রকৃতির রাগ—কালিঙ্গড়া-ভৈরব

উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

আরোহ—সা, রে, গ, ম র্ম ম, র্ম নি র্সা রে র্সা।

অবরোহ—রে র্সা নি র্ম ম, গ ম রে সা।

পকড়—সা রে গ ম, র্ম নি র্ম র্ম ম।

আলাপ—সা রে গ ম, রে নি সা, রে সানি, র্ম নি রে সা, গ ম র্ম র্ম ম।

ত্রিতাল—মধ্যলয়

পীর, চলো মদিনা
যাঁহা বিরজত হাসান-হুসেন ঔর ফতেমা।
তাওহিদ বাণী খুদকি কালাম
যাঁহা বাজত অবিরাম॥

মর্ম নিসা রেসা নির্ম	র্ম র্ম ম ম	রে - র্সা -	গ ম রে নি
পীS SS রS SS	চ লো S ম	দি S না S	যাঁ হা বি র
×	২	০	৩

রে - সা -	ম র্ম নি রে	র্সা নি র্ম নি	রে রে র্সা -
জ S ত S	হা সা ন হু	সে ন ঔ র	ফ তে মা S

রে নি র্সা রে	র্ম - র্ম -	রে নি র্সা র্ম
তা ও হি দ	বা S নী S	খু দা কী কা

ম র্ম নি -	ম র্ম নি রে	র্সা নি র্ম নি	রে - র্সা -
লা S ম S	যাঁ হা বা জ	ত S অ বি	রা S ম S

৪। | সানি মনি রেগ মনি | মম গম মনি সানি | রেঁসা গমঁ রেঁসা নিসা |
×

| মনি মম গম রেসা |

৫। | মগ মগ মরে সা | নিম নিম মগ ম | সানি রেঁসা মনি সাঁ | মনি সাঁ মনি সাঁ |
×

৬। | নিরে মম গম রেসা | গম নিনি মনি মম | নিসা নিরেঁ সারেঁ সানি |
০

| নিরে মমঁ গমঁ রেঁসা | নিসা মনি মম নিসা | মনি মম মনি মম |

৭। | সানি সাসা মগ মম | মম গম মনি মম | গম মনি সানি মম |
×

| মনি সারেঁ সানি মম |

| মনি সারেঁ গমঁ রেঁসা | নিম মম গম রেসা | গম মম সাঁ গম | মম সাঁ গম মম |

বিস্তার—

১। সা রে, গ রে গ, রে গ র্ম গ, রে নি র্ম ম, র্ম নি রে, গ ম রে সা।
২। গ ম, র্ম ম গ, রে গ র্ম ম, র্ম নি র্ম র্ম ম, রে সা নি, রে সা।
৩। সা নি রে গ, র্ম ম র্ম গ র্ম ম গ, নি র্ম র্ম ম, নি গ রে ম রে সা।
৪। ম র্ম র্ম র্ম ম, নি র্ম ম, রে নি র্ম ম, গ ম রে সা।
৫। ম গ র্ম ম নি র্ম ম সা, নি র্ম রে সা, ম র্ম নি রে সা।
৬। গ রে গ, র্ম গ র্ম, নি র্ম নি র্ম ম, ম র্ম নি সা, নি রে সা।
৭। নি সা রে র্ম, গ র্ম রে সা, রে নি র্ম ম।
৮। র্ম নি সা রে র্ম, র্ম রে সা, রে নি সা।
৯। রে নি সা, র্ম নি র্ম র্ম ম, র্ম নি র্ম নি রে সা।
১০। নি সা রে, গ র্ম রে সা, রে সা নি, সা রে সা।

সরগম—

১। | সারে র্মর্ম নিরে গগ | র্ম নি রেরে গম র্মম | র্মর্ম রেরে মম সাসা |
৩
| গগ নিনি র্মনি র্মম | র্মনি র্মম র্মনি র্মম |

২। | রেনি সারে র্মর্ম গর্ম | রেসা নির্ম মর্ম নির্ম | গম রেসা মর্ম মগ |
| র্মসা নিরে সা র্মসা | নিরে সা র্মসা নিরে |

বোলতান—

১। | নিরে সানি র্মম গম |
| মS SS দিS নাS |
৩

২। | সারে গম র্মম গম | র্মনি র্মম র্মনি সারে | নিসা র্মনি মর্ম গম |
| চS SS লোS SS | মS SS দিS SS | নাS SS SS SS |
২

তান—

১। | র্মনি নির্ম সানি রেসা | র্মনি র্মম গম রেসা |
০

২। | নিসা রেসা নির্ম মর্ম | গম রেনি সারে গম |
০

৩। | গম রেসা গম র্মম | র্মনি নির্ম সানি রেসা | গর্ম রেসা নিসা নিরে সা |
২

রমলা

ঠাট—ভৈরবী

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ

বর্জিত স্বর—আরোহে 'রে'

তীব্র নিখাদ ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোমল নিখাদ ও তীব্রমধ্যম দুর্বলভাবে লাগানো হয়।

বাদী—প

সমবাদী—সা

পূর্বাঙ্গবাদী রাগ

সময়—দিবা অন্তিমভাগ ও রাত্রির শুরু।

সন্ধিপ্রকাশক রাগ।

সমপ্রকৃতির রাগ—ভৈরবী, ভূপাল বা ভূপালী তোড়ী, ধনেশ্রী (ভৈরবী ঠাট)

আরোহ—নি সা, গ ম প, ধ নি সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ প, ম গ রে সা।

পকড়—সা নি সা গ, গ ম প, সা গ রে, ম গ রে সা।

ত্রিতাল—মধ্যলয়

মজনু সে ক্যায়সে মিলন হোয়েরি
লায়লি সদা পুকারি।
বোলত মজনু আও লায়লি
লা-এলা জ্যোতি দেখোরি॥

আলাপ—সা নি সা গ, সা, গ ম প, প, ম গ, প ম গ সানি, নিসা, সাগরে, মগ রে সা।

সা রে সা নি	- সাগ গ ম	প ম গ রে	সা - - -
ম জ নু সে	ঽ ক্যায় সে মি	ল ন হো য়ে	রি ঽ ঽ ঽ
২	০	৩	×

| প ধ নি ধ | সাঁ - - সাঁ | সাঁনি ধপ ধনি ধপ | পর্ম গর্ম গধ প |
| লা য় লি স | দা ঽ ঽ পু | কাঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | রিঽ ঽঽ ঽঽ ঽ |

পম গরে সা সা	- গ ম প	প ধ প ধ	নি - সাঁ সাঁ
বোঽ ঽঽ ল ত	ঽ ম জ নু	আ ঽ ও ঽ	লা ঽ য় লী
২	০	৩	×

| গঁ - রেঁ রেঁ | সাঁ - নি নি | সাঁনি ধপ ধনি ধপ | পর্ম গর্ম গধ প |
| লা ঽ এ লা | জ্যো ঽ তি দে | খোঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | রিঽ ঽঽ ঽঽ ঽ |

বিস্তার—

১। সা, নি় সা, গ রে স, নি় সা, গম, সাগম, প ম গরেসা।
২। নি় সা, ধ় নি় সা, গ ম প, ম প গ, সা গ রে সা।
৩। ম গ রে সা, গ ম প, নি ধ প, গ ম ধ প, গ ম, মগ রে সা।
৪। সা গ ম প, গ ম প ধ, ধ নি সা নি ধ প, গ ম, প গ, ম গ রে সা।
৫। প, ম প গ ম, গ প, নি ধ প, প ধ নি সা নি ধ প, পধ নি সা।
৬। ম প, নি ধ প, ম প, গ প ম গ, ম গ রে সা।
৭। সা, গ ম প নি, ম প ধ নি, ধ নি র্সা, নি র্সা, রে র্সা।
৮। প ধ নি, প ধ র্সা, নি র্সা গ রে র্সা।
৯। প র্ম গ, গ র্ম প, ম গ রে সা, গ ম প ধ, ম প র্সা ম প নি ধ, র্গ র্রে র্সা।
১০। নি র্সা র্গ র্রে র্সা, র্ম র্গ র্রে র্সা, নি ধ নি ধ প।

সরগম—

১। | সাগ রেসা মগ রেসা | র্সার্গ র্রের্সা র্মর্গ র্রের্সা | নি-র্সা -নি- ধ-নি -ধ- |
২ ০ ৩

| নি নি় র্সা সা | র্রে র নির্সা গর্রে | র্সা
× ২ ০

২। | সাসা সাম মম গরে | সাগ মপ মগ রেসা | পর্ম গপ ধনি ধপ |
২ ০ ৩

| নির্সার্সা ধনিনি পধনি সা | পধনি র্সা পধনি র্সা |
×

বোলতান—

১। | সাগ রেসা নি়সা গম | পম গরে সাগ মপ | ধপ মগ মপ ধনি |
| ক্যাऽ ऽऽ ऽऽ ऽয় | সেऽ ऽऽ ऽऽ ऽऽ | মিऽ ऽऽ ऽऽ ऽऽ |
০ ৩ ×

| র্সার্গ র্রের্সা নির্সা র্গর্রে | সা
| লऽ ऽऽ নऽ ऽऽ | ऽ
০ ০

২। | সাসা রেরে নিসা গরে | সাগ মপ ধপ র্মগ | র্মপ ধনি র্সাগ র্রের্সা |
| ক্যাऽ ऽয় সেऽ ऽऽ | মিऽ ऽऽ লऽ নऽ | হোऽ য়েऽ রিऽ ऽऽ |
০ ৩ ×

তান—

১। | সাগ মপ ধনি র্সার্গ | র্রের্সা নিধ পম গ |
৩

২। | ধপ নিধ র্সানি র্রের্সা | নিধ পম গরে সা |
৩

৩। | সাগ রেসা মগ মপ | পধ মপ ধনি ধপ | ধনি সাগ মগ রেসা |
০

৪। | গরে সাম গপ মধ | পম গম পধ নিধ | নিসা গরে সানি ধপ | মধ পম গরে সা |
২

৫। | পধ নিনি পধ মপ | ধনি সাসা নিসা ধনি | সাগ রেসা মগ রেসা |
২

| নিধ পম গরে সা |

৬। | সাগ রেসা মগ রেসা | পম গরে সা পধ | নিপ ধনি সাগ রেসা |
৩

| নিরে সানি ধপ মধ | পম গম প পম | গম প গম প |

৭। | রেগ রেসা রেরে নিসা | গম গরে সাগ মপ | পপ মগ মম গরে |
২

| সাগ মপ গম পধ | মপ গম ধনি নিপ | মপ নিসা গরে সা |

| - নিসা গরে সা | - নিসা গরে সা |

গীতা বসু (মিত্র) আমায় জানিয়েছেন যে তিনি 'নবরাগ' পর্যায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে রমলা রাগশ্রিত 'ফিরিয়া যদি সে আসে' গানটি গেয়েছিলেন। বেতার জগতেও বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য মেলে। গীতাদেবী রাগের চলন আমায় এভাবে দেখিয়েছেন—সা, সা নি সা গ, সা, গ ম প, প—মগ, প ম গ সানি, নি সা, সা গ রে—, ম গ রে সা।

গান পর্যালোচনা করে দেখলাম মিশ্র ভৈরবীর রূপ আসে। গীতাদেবী গীত সুরের স্বরলিপি করে দিলাম। ভবিষ্যতে কেউ এ বিষয়ে আলোকপাত করলে ভালো হয়।

গানটির মধ্যে 'রমলা রাগের কোমল রেখাবে...' কথাটিও বর্তমান।

সম্পূর্ণ: গানের স্বরলিপি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকায় সংক্ষিপ্ত স্বরলিপি দিলাম। (আকারান্ত)

{ সা ঋা | সঋ সন্া -া সা | জ্ঞা -া -া মপা |
ফি রি | য়া০ ০০ ০ য | দি ০ ০ সেআ |

|| মজ্ঞা মপমা জ্ঞা -া | পপা মমা জ্ঞজ্ঞা সা | ন্া -া -া ন্া | সা -া সা জ্ঞা |
|| সে ০ ০ ০ | আ০ মা০ র০ খোঁ | জে ০ ০ ঝ | রা ০ গো লা |

| ধা -া -া মমা | জ্ঞজ্ঞা ধসা} পা দা | পমা -া জপমা জ্ঞা | মা -া জমা পদপা |
| বে ০ ০ ০০ | ০০ ০০ আ নি | য়া ০ ০ স | মা ০ ধি পা |

| মা -া জপমা -া | পপা মমা জ্ঞজ্ঞ সা | ন্া -া -া ন্া | সা -া -া সজ্ঞা |
| শে ০ ০ ০ | আ০ মা০ র০ বি | দা ০ য় বা | নী ০ ০ শোনা |

| ঋ -া -া মমা | জ্ঞজ্ঞা ঋসা সা ঋ | সঋ সন্া -া সা | জ্ঞা -া -া মপা ||
| বে ০ ০ ০ | ০০ ০০ "ফি রি | য়া০ ০০ ০ য | দি ০ ০ সেআ" ||

{পা দা | না -া -া পদা | না -া -া না |
ব লি | ও ০ ০ তা০ | রে ০ ০ এ |

|| না -া র্সা র্ঋা | র্সা -া -া র্সা | না -া -া র্সজ্ঞা | র্ঋা র্জ্ঞা -া -া |
|| খা ০ নে এ | সে ০ ০ ডা | কে ০ ০ যেন | মো ০ ০ র্ |

| নর্সা -া র্না দা | দা -া } দপা দা | পদা -া দপা পা | মা -া -া জ্ঞপা |
| না০ ম্ ধ রে | সে ০ ০০ র | বা ০ব০ য | বে ০ ০ কাঁদি |

| মা -া -া -া | পপা মমা জ্ঞজ্ঞা সা | ন্া -া -া ন্া | সা -া -া সজ্ঞা |
| বে ০ ০ ০ | র০ ম০ লা০ সু | রে ০ র্ কো | ম ০ ল্ রেখা |

| ঋা -া -া মমা | জ্ঞজ্ঞা ঋসা সা ঋ | সঋ সন্া -া সা | জ্ঞা -া -া মপা ||
| বে ০ ০ ০০ | ০০ ০০ "ফি পি | য়া০ ০০ ০ য | দি ০ ০ সেআ" ||

{ন্া | সা -া সা ন্সা | জ্ঞা -া -া পা ||
তৃ | ষি ০ ত ম | রু ০ র্ ধু ||

| মা -া মা জ্ঞা ঋ | সা -া -া পা | পদা দণা পা দা | র্সা -া -া পা |
| স ০ র গ | গ ০ ন্ যে | ম০ ০০ নি হে | রে ০ ০ মে |

| দণাঃ দণাঃ দা | পা -া -া }প | পাঃ ক্ষজ্ঞাঃ জ্ঞক্ষা | জ্ঞক্ষা -া -া পা |
| ঘে০ র০ স্ব | প ০ ন তে | ম নি০ দা০ | রু০ ০ ন্ তি |

| পাঃ দঃ র্সণা দা | পা -া -া পা | জ্ঞা -া ক্ষজ্ঞা ক্ষা | জ্ঞা -া ক্ষা জ্ঞা |
| য়া ০ সা০ ল | যে ০ ০ কা | টি ০ ল০ আ | মা ০ র্ বি |

| জ্ঞা ঋ ঋজ্ঞা ঋ | সা -া
| ফ ০ ল০ জী | ব ন্

পরিশেষে গ্রন্থটি রূপদান করায় যে পূর্বসূরীদের কাছে আমি ঋণী তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ ইদ্‌রিস্ আলি (বাংলাদেশ) এবং ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের নাম স্মরণ না করলে অন্যায় হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'সাহিত্য পত্রিকা' সাইত্রিশ বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৪০০ তে ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর 'নবরাগ-মালিকা' প্রথম পর্যায়ের ছয়টি রাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নজরুল ইন্সটিটিউট (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীতের সুর' গ্রন্থে ইদ্‌রিস্ আলি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদিও ইদ্‌রিস্ আলির সঙ্গে দু'এক স্থানে আমার মতভেদ ঘটেছে, তবু স্বীকার করতেই হয় যে তাঁদের প্রদর্শিত পথই আমার অনুপ্রেরণা।

'নজরুল-সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ', শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ২০০০ প্রকাশিত, শ্রী ব্রহ্মমোহন ঠাকুর ও শ্রী সুধীন দাশকে উৎসর্গীকৃত।

'নজরুল-সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ', নজরুল রচনাবলীতে সংকলনের অনুমতি প্রদান করায় আমরা শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। —সম্পাদনা-পরিষদ, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ই

ঈ

উ

এ

ঐ

ও

উ

ক

খ

গ

ঘ

ম